শ্রীপাদ নিত্যানন্দ লীলা কথা

প্রদীপ আচার্য

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ লীলাকথা

প্রদীপ আচার্য

শ্রীহরি প্রকাশন
পুরাতন কালীবাড়ী লেন
কৃষ্ণনগর, আগরতলা,
পশ্চিম ত্রিপুরা।

প্রথম প্রকাশ
১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯৫
২রা মাঘ, ১৪০১

প্রকাশক
শ্রীকৃষ্ণ আচার্য
শ্রীহরি প্রকাশন
পুরাতন কালীবাড়ী লেন,
কৃষ্ণনগর, আগরতলা

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীপ্রণব সূত্রধর

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :—
জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস
জগন্নাথ বাড়ী রোড,
আগরতলা।

মুদ্রণে :—
সুনীতি প্রিন্টার্স
ভট্টপুকুর, আগরতলা।

Sree Paad Nityananda
Lila Katha
Written by Pradip
Acharjee
Price —Rs. 100·00 only

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

● পথের প্রদীপ
● গোমতীর স্বপ্ন
● দুই অধ্যায়
● জীবন যে রকম
● হোয়াইট্ লিকার
● অসবর্ণ
● সমসের গাজী (ঐতিহাসিক)
● ত্রিপুরেশ্বরী ও ধন্যমাণিক্য (ঐতিহাসিক)
● অমরমাণিক্য (ঐ)
● অমৃতলোকের সন্ধানে
● ফুলকুমারী (কাব্যগ্রন্থ)
● শ্রীকৃষ্ণ বিরহ গাথা (কাব্যগ্রন্থ)
● জগৎ নারায়ণের পাঁচালী (কাব্যগ্রন্থ)
★ ভুবনেশ্বরী মন্দির (গল্পগ্রন্থ)

মাধুকরী—একশত টাকা মাত্র

বিশেষ ছাড়-৫০·০০

উৎসর্গ

ডঃ সীতানাথ দে

ও

ডঃ রথীন্দ্রনাথ দাশ শাস্ত্রী

শ্রদ্ধাভাজনেষু

ভূমিকা

৮ই অগ্রহায়ণ। ১৪০০ বাংলা, দশমী তিথি, মঙ্গলবার। মধ্যরাত। স্বপ্ন দেখলাম আমি এক নির্জন মাঠে একটি সজ্জিত খাটে শুয়ে আছি। কিছু দূরে খাটের চারিধারে অচেনা মানুষের ভীড়।

আকাশ মার্গ হতে কুড়ি বাইশ ফুট লম্বা চার পাঁচজন লোক আমার খাটের কাছে এসে নামলো। তাদের পরনে আঁট-সাঁট পোষাক। আমার দেহ থেকে অনুরূপ একটা দেহ বের হলো। তারা সে দেহকে নিয়ে আকাশ মার্গে ছুটে চললো। কিছুক্ষণ পর এক সুন্দর উদ্যানে এসে তারা আমাকে নামালো। সেখানেও বহু লোক আনন্দ করছেন। সকলেই কুড়ি বাইশ ফুট লম্বা। একজন বৃদ্ধ। পরনে সাদা ধুতি। গায়ে ও কাঁধে সাদা চাঁদর জড়ানো। মোটা ভ্রূ, দাঁড়ি সবই কাশ ফুলের মতো। বাঁ হাতে বিশাল কাকাতুয়া জাতীয় একটি পাখী। ওরা আমাকে বৃদ্ধের কাছে নিয়ে যাবার মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মনে হলো আমার ঘরটা চন্দন ধূপের গন্ধে তখনো ভরপুর। ঘড়িতে দেখলাম রাত সাড়ে বারোটা।

আবার ঘুমোলাম। আবার একই স্বপ্ন। তৃতিয় বারও একই স্বপ্ন দেখলাম। তৃতিয় বার ওরা আমায় অতি বৃদ্ধ লোকটির কাছে নিয়ে গেলো। তিনি আমায় দেখলেন, তারপর ঐ লোকদের বললেন — আরে ওনি তো আমাদের সেই প্রথম জীবনের শাণ্ডিল্য ঋষি, দ্বিতীয় জীবনের বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। ঠাকুর আপনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের লীলা কথা লিখুন। এই আমার অনুরোধ।

জিজ্ঞেস করলাম আপনি কে ? তিনি উত্তর দিলেন— আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি অদ্বৈত আচার্য।

ঘুম ভেঙ্গে গেলো। শ্রীপাদের লীলা কথা লিখতে গিয়ে দেখলাম — চৈতন্য ভাগবতে শ্রীপাদের কৈশোরের নাম, পিতা মাতার নাম,, সন্ন্যাস নেবার বয়স এবং কুড়ি বছরে যে সব তীর্থ স্থান ঘুরেছেন শুধু সেই তীর্থ স্থানের নামই মাত্র দেওয়া রয়েছে। নদীয়ায় আসার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর লীলার কোন কথাই লেখা নেই।

গৌর লীলাতেও শ্রীপাদের লীলা সম্পর্কে খুব কমই লেখা হয়েছে। সংসার জীবনের এবং স্ত্রী ও পুত্রের নাম ব্যাতিত বিশেষ কোন কথাই জানা যায় না।

শ্রী অদ্বৈত্য আচার্যের আদেশ শীরোধার্য করে প্রতিদিন গৌর নিতাইকে আহ্বান জানিয়ে লিখতে বসেছি। তারা যা লিখিয়েছেন তাই লিখেছি।

অতীতে শ্রীমতি রাধারাণীর অহৈতুকী কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণ বিরহ গাথা লেখা সম্ভব হয়েছিলো। এবারও শ্রীপাদের লীলা শ্রীপাদ ও গৌর সুন্দরের কৃপাতেই লেখা সম্ভব হয়েছে।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রথম লীলা “নিতাই এলো নদীয়ায় এবং দ্বিতীয় লীলা কথা— “রূপ থেকে অরূপে” ত্রিপুরার প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা জাগরণে প্রতিদিন প্রকাশের সুযোগ দিয়ে জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপরিতোষ বিশ্বাস আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

বৈষ্ণবগণ এবং সুধী পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে শ্রীপাদের লীলা কথা সমাদৃত হলেই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

বিনীত লেখক

লেখক পরিচিতি

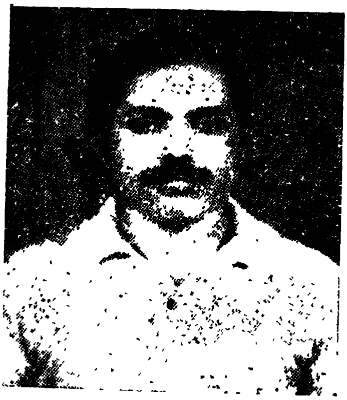

ডাঃ প্রদীপ আচার্য্য একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, হস্তরেখাবিদ, জ্যোতিষ শাস্ত্রী এবং চিকিৎসক। এম, ডি, এইচ (রেজিঃ)।

তিনি ১৯৪৯ খৃঃ ১৪ই জানুয়ারী বাংলাদেশের গোঁসাইপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ৺বগলানন্দ আচার্য! মা ৺প্রিয়বালা দেবী। ১৯৫১ খৃঃ থেকে ত্রিপুরার বাসিন্দা। পিতাও ছিলেন একজন সুগায়ক এবং কবি।

তিনি ন'দশ বছর বয়স থেকেই লেখার কাজে হাত দেন। এরই আগে তার চৌদ্দটি গ্রন্থ কলিকাতা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া দুশোর বেশী ছোট গল্প, [illegible]রটি একাঙ্ক নাটক, প্রায় তিনশো প্রবন্ধ ও ফিচার, দেড়শোর মতো কবিতা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৩৭৭ বাংলার আশ্বিন মাসে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে আগরতলার প্রিয় প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস "পত্রের প্রদীপ" সম্ভবত এটিই ত্রিপুরায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা উপন্যাস। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২৬ মূল্য মাত্র ৪ টাকা।

লেখকের পঞ্চদশ গ্রন্থ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ লীলা কথা প্রকাশ করতে পেরে প্রকাশনী গর্ববোধ করছে। ঠিক মতো প্রুফ দেখতে না পারায় মুদ্রণ প্রমাদ ঘটতে পারে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থী। সুধী পাঠক/পাঠিকাগণের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হলে পরিশ্রম সার্থক মনে হবে। বিনীত--প্রকাশক।

লেখকের বংশ পরিচয়

আদি নিবাস রাঢ় ভূমি মৈথিলী পরগণা। চন্দ্র শেখর অধিকারী নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। তার পুত্র দিলীপ অধিকারীও নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন তার পুত্র সত্যকাম অধিকারী নদীয়াপুর, সরাইল পরগণায় বসতি স্থাপন করেন। সত্যকাম অধিকারীর দুই পুত্র। জয়নন্দ ও শ্রীনন্দ। জয় নন্দ গোঁসাইপুর ও শ্রীনন্দ সুকর্ণ ঘাটে বসতি স্থাপম করেন। জয় নন্দের পুত্র শিব প্রসাদ, তার পুত্র-জগন্নাথ, জগন্নাথের পুত্র রমানাথ। এবং রমানাথের তিন পুত্র ইন্দ্র চন্দ্র গগন চন্দ্র, ও নবীন চন্দ্র। গগনচন্দ্রের সাত পুত্র। মহানন্দ, নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ, অখিলানন্দ, জগতানন্দ, সর্বানন্দ ও বগলানন্দ। নবীন চন্দ্রের এক পুত্র যামিনী।

জয় নন্দ থেকে বগলা নন্দ পর্যন্ত সকলেই গোঁসাই পুর বসতি স্থাপন করেন। ভারত ভাগ হবার পর ১৯৫১ খৃঃ বগলা নন্দ গোঁসাই পুর ছেড়ে আগরতলা মধুবন, আমতলীতে বসতি স্থাপন করেন। তারা গোস্বামী বংশ। কয়েক ঘর গোস্বামী এক পাড়ায় বসবাস করতেন বলে পাড়ায় নাম হয়ে যায় গোঁসাইপুর যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামের খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি চালাঘরের বারান্দায় বসে আছেন হারাই পণ্ডিত অর্থাৎ হারাধন আচার্য আর স্ত্রী পদ্মাবতী।

তিন বৎসর হলো হারাধনের ঘরে পদ্মাবতী বধূ হিসেবে। কিন্তু, এখনো কোন সন্তান হারাধনকে উপহার দিতে না পারার বেদনা মাঝে মাঝেই তাকে উদাসী করে তুলে। এই পাড়ায় তার পরে আরো চারটি মেয়ে বধূ হয়ে এসেছে সবাই। মা হয়ে গর্বের হাসি হাসছে।

হারাধনের বাবাও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। জমিদারের কাছ থেকে বিদ্যানিধি উপাধীও পেয়েছিলেন কিন্তু, হারাধন বাবার মতো বিদ্যে পান নি।

তবুও অন্যমনস্ক ছেলেকে বাবা ন্যায় শাস্ত্রের উপর অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন, তাই বাবার মৃত্যুর পর বাড়ীর টোল ভেঙ্গে গেলেও মাঝে মাঝে দু-একজন ছাত্র আসে ন্যায় শাস্ত্র সম্পর্ক কিছু জানতে। আসার পথে পণ্ডিতের অভাবের সংসারের কথা ভেবে চাল, ডাল তরকারী নিয়ে আসে আর তাতে করেই হারাধনের দু-জনের সংসার কোনক্রমে চলে যায়।

স্ত্রী পদ্মাবতী সন্তানের জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করলেও হারাধনের মনে কোন দুঃখ নেই। তিনি শুধু ভাবেন ভগবান যেন তার অভাবের সংসারে নতুন কাউকে পাঠানোর আগে অন্তত নতুন অতিথির মুখে দু-বেলা যেন সেদ্ধ ভাত জুটে তার ব্যবস্থা করে তবে পাঠান। গৃহদেবতা জগন্নাথের কাছে মনে মনে এই প্রার্থনাই জানায় হারাধন।

একদিন বারান্দায় বসে স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মৃদু হাসতে হাসতে পদ্মাবতী বললেন—তোমার সংসারে নতুন অতিথি আসছে।

স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে যেন চমকে উঠে হারাধন। স্ত্রী পদ্মাবতী কিন্তু মনে মনে খুব খুশী। তিন বৎসর পর সে মা হতে

চলেছে তাই আনন্দিত হবারই কথা। হারাধন দু-জনের খাবারই যোগার করতে পারছে না, তিনজনের খাবার কোথা থেকে যোগার করবেন ? তাই হারাধন শঙ্কিত।

পদ্মবতী স্বামীর মনের ভাব বুঝতে পারলেন বললেন—ভাবনার কী আছে, তার খাবার তিনিই যোগার করে দেবেন। তুমিতো তোমার দাদুর কাছ থেকে কিছু গোনা বাছা শিখেছিলে, এই গোনা বাছার কাজটা শুরু করলেওতো কিছু আয় হতে পারে ? তাছাড়া জমিদার খুব ভালো লোক। তুমি জমিদারের কাছে গেলেও ঘর তোলার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য পেতে পারো।

স্ত্রীর কথা মন দিয়ে শুনলেন হারাধন। তারপর বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ পদ্মাবতী। যার খাবার সেই যোগার করে। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার সেই রাজকন্যার গল্পটা মনে আছে ?

—আমি গল্প টল্প কিছু জানিনা। যদি বলো তাহলে শুনতে পারি।

—ভগবান যে সকলের ব্যবস্থাই করে দেন এই গল্পটা শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে। শোন—এক রাজার তিন মেয়ে ছিলো। রাজা প্রত্যেক মেয়েকে ভালবাসতেন বটে কিন্তু, ছোট মেয়েকেই বেশী ভালো বাসতেন। একদিন মহারাজের সভা পণ্ডিত গল্প বলার সময় বললেন মহারাজ, আপনি আমাদের রক্ষক এবং পালন কর্তা হলেও এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাগ্যে চালিত হয়। আপনি কিংবা আমরা পরিবারের কর্তাগণ নিমিত্ত মাত্র। একথায় মহারাজের মনে ক্ষোভ দেখা দিলো। তিনি রাজসভায় কিছু বললেন না বটে কিন্তু অবসর সময়ে মেয়েদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মা, তোমরা কার ভাগ্যে খাও ?

বড় দুই রাজকন্যা উত্তর করলো মহারাজ আমরা আপনার ভাগ্যে খাই। কিন্তু, ছোট মেয়ে ঠিক পণ্ডিতের কথার মতোই

বললো - মহারাজ আমি আমার ভাগ্যে খাই।

মহারাজ আদরের ছোট মেয়ের মুখে এ হেন কথা শুনে রেখে আগুন হয়ে গেলেন। রাজ পণ্ডিতের উপরের রাগও গিয়ে পড়লো ছোট মেয়ের উপর। তিনি ছোট মেয়েকে বললেন — ঠিক আছে তুমি যদি তোমার ভাগ্যে খাও তা হলে তোমায় বনবাস দিয়ে আসছি। দেখি তোমার ভাগ্যে তুমি কেমন করে খাও।

মহারাজ ছোট মেয়েকে গভীর বনে বনবাস দিয়ে আসলেন। সেখানে বনদেবীর কৃপায় রাজকন্যা বেঁচে গেলেন। ময়ূরেরা এসে খেলা করত সেখানে। আর তাদের ফেলে যাওয়া পালক দিয়ে রাজকন্যা ময়ূরের পাখা তৈরী করতো। এই পাখা বাজারে বিক্রী করে রাজকন্যার প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে এনে দিতো বনের পাশে বসবাসকারী এক বৃদ্ধা। তারপর একদিন এক রাজকুমার শিকার করতে সেই বনে এলো। রাজকন্যার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে তাকে বিয়ে করে নিজ রাজ্যে নিয়ে গেলো। আর সেই মহারাজ শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধে শত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে দু-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে এলেন। এসে উঠলেন ছোট মেয়ের রাজবাড়ীর অতিথিশালায়। ছোট মেয়ে একদিন তার বাবা ও বোনদের দেখে চিনতে পেরে খুব আদর করে নিজ প্রাসাদে নিয়ে এলেন। মহারাজ তার ছোট মেয়ের কথাই যে সত্য একথা বুঝতে পেরে মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইলেন। পরে মেয়ে জামাই এর সাহায্যে আবার শত্রুদের কবল থেকে নিজ রাজ্য উদ্ধার করলেন।

গল্প শুনে মৃদু হেসে পদ্মাবতী বললেন— তাহলে তোমারওতো চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমিও জগন্নাথের কাছে সবকিছু সমর্পণ করে দাও। জগন্নাথ যা করার তাই করে দেবেন।

মাঘ মাস শুক্লা এয়োদশী তিথি ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ। বৃহস্পতিবার

মধ্যরাতে পদ্মাবতী খড়ের চাউনির ছোট ঘরটিতে প্রায় চার বছর পর শিশুর কান্না শোনা গেল। হারাধন বাইরে দাঁড়িয়ে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুরু করেছিলো- হে জগন্নাথ, গরীব মানুষ আমি। আমার ঘরে মেয়ে সন্তানকে পাঠিও না।

প্রার্থনা শেষে আবার নিজের মনেই হাসে হারাধন। ভগবানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যে কত ঠুনকো প্রতি পদক্ষেপেই তা অনুমান করা যায়।

হারাধনের ছোট দুচালা খরের চাউনি ঘরে থাকেন কষ্ঠি পাথরের তৈরী জগন্নাথ। গত বছর বৃষ্টির জলে জগন্নাথকেও ভিজতে হয়েছে। এবার হারাধন ঠিক করে রেখেছে নিজে গ্রামের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খর ভিক্ষে করে এনে জগন্নাথের কুড়েঘর খানি নিজেই ছাউনির ব্যবস্থা করবেন।

হারাধন একাকী বারান্দায়। রাতের খাওয়ার পরই একাকী বসেছিলেন। সন্ধ্যার পরই পদ্মাকে গরম ভাত খাইয়ে দিয়ে ধাই পদ্মাকে নিয়ে আতুর ঘরে প্রবেশ করেছে। একাকী বসে তাই হারাধন কিছুক্ষণ পর পর তামাক টানছিলেন আর জগন্নাথকে ডাকছিলেন।

শিশুর কান্না আতুর ঘর থেকে ভেসে আসার আগেই হারাধন লক্ষ্য করেছিলেন জগন্নাথ মন্দির থেকে একটা আলোক বিন্দু যেন বেরিয়ে আতুর ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে মিশে গেছে।

শিশুর কান্না শুনে হারাধন বারান্দা থেকে ধাইকে জিজ্ঞেস করলেন শ্যামলীর মা কে এলগো ?

শ্যামলীর মা আতুর ঘর থেকে বললেন ঠাকুর কর্তা, জগন্নাথের দয়ায় জগন্নাথই তোমার ঘরে এসেছে গো। আমি গত পঞ্চাশ বছর ধরে ধাই এর কাজ করছি কিন্তু এমনটি আর দেখিনি গো। তোমার ছেলে আসার আগে এই আতুর ঘরে যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। আমার চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। আমি চোখ বুজলাম। চোখ খুলতেই দেখি দাদু ভাই। মাকে বেশী কষ্ট না দিয়েই পৃথিবীর কোলে এসে শুয়ে আছে।

পাশের বাড়ীগুলো থেকে মহিলাদের ডেকে নিয়ে এস গো, উলুধ্বনি দিতে হবে যে।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি। গ্রামের পরিবেশ। চারিদিকে ধানের ফাঁকা জমি। ঠাণ্ডা বাতাস। মাঘ মাসের শীত বেশ জাকিয়ে বসেছে। হারাধনের ডাকে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা কয়েকজন মহিলা স্বামীদের বিরক্তি সত্ত্বেও ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তারা পদ্মাবতীকে খুব ভালোবাসে পদ্মাবতীর বাচ্ছা হবে শুনে তাদের আনন্দের কমতি ছিলো না তাই মধ্যরাতেই ছেলেকে দেখতে মধ্যরাতের কুয়াশা ও শীত ভেদ করে হারাধনের বাড়ীর দিকে ছুটি এলো

উলুধ্বনি দিয়ে অনেকেই শীতের রাতে স্নান করার কথা ভুলে গিয়ে শিশুকে দেখতে আতুর ঘরে ঢুকে পড়ল। পদ্মাবতী কাঁথায় মোড়া শিশুর মুখখানি ফাঁক করে পরশীদের দেখালেন। সবাই অবাক হয়ে এক বাক্যে বলতে লাগলো — পদ্মাবতী তোমার ঘরে তো চাঁদের হাট বসেছে গো। এ পাড়ায় কেন, এ তল্লাটে এমন সোনার চাঁদ আছে কিনা সন্দেহ। তুমি বাপু কালকেই একটা তাবিজ্র ছেলের গলায় বেঁধে দাও যাতে কোন কিছুর নজর না লাগে।

ধাই আতুর ঘর থেকে হারাধনকে ডেকে বললো — ও পণ্ডিতের ছেলে, ঘর থেকে একটু মধু বের করে দাও তো!

হারাধন ঘর থেকে পূজোর সময় পাওয়া মধুর পাত্রটা বের করে দিলেন। ধাই বললো — বাপু এবার কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও নয়তো শরীর খারাপ করবে। তোমার জগন্নাথের কৃপায় আর কোন ভয় নেই।

হারাধন বিছানায় এসে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিলেন। ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে তামাক সেবা করে কাঁধে চাঁদরটা ফেলে জমিদারের বাড়ীর দিকে চললেন। জমিদার বাড়ী থেকে কিছু সাহায্য না পেলে শিশুর মুখে একটু দুধ দেওয়াও সম্ভব

হবে না।

একচক্রা গ্রামের জমিদার বসন্ত চৌধুরী খুব ভাল লোক ছিলেন। হারাধন পণ্ডিতের বাবা রামাই পণ্ডিতকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। মাঝে মাঝে রামাই পণ্ডিত বসন্ত চৌধুরীকে ভাগবতের কথা শোনাতেন

বসন্ত চৌধুরী পণ্ডিতের দারিদ্রতা দেখে মনে মনে ঠিক করেছিলেন কিছু জমি পণ্ডিতকে নিস্কর রূপে দান করবেন। কিন্তু হঠাৎই একদিন জানতে পারলেন রামাই পণ্ডিত পরলোক গমন করেছেন।

হারাধন পণ্ডিত নন। পিতার কাছ থেকে শেখা সামান্য বিদ্যা মাঝে মাঝে আগত শিক্ষার্থীদিগকে দান করার চেষ্টা করতেন। জমিদার বাবু বাড়ীও পিতার শ্রাদ্ধের পর আর যাওয়া হয়নি।

হারাধন পণ্ডিত যখন জমিদার বাড়ী পৌঁছলেন তখন জমিদার মশায় কাছারীতে প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনছিলেন। হারাধন পণ্ডিতকে দেখে বললেন— পণ্ডিত মশায়, নমস্কার, বসুন। আমার পরম সৌভাগ্য আজ আপনি আমার বাড়ী এলেন। আজ খুব ভোরে নবাবের কাছ থেকে দূত এসেছে। আমার ছেলে বিকাশকে নবাব হোসেন শাহ এক হাজারী মনসবদারের পদে নিয়োগ করেছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে কিছু উপহার দেবো।

— জমিদার মশায়, কাল রাতে আমার একটি ছেলে হয়েছে। সে জন্যই আপনার কাছে এসেছিলাম কিছু সাহায্য চাওয়ার জন্য। জগন্নাথের দয়ায় আমার কিছূই চাইতে হলো না। জগন্নাথ আপনার মুখ দিয়েই আমার কথাটি প্রকাশ করলেন

— আপনার ছেলে খুব ভাগ্যবান। আমি কালরাতেই আপনার কথা ভাবছিলাম। আপনাকে পঁচিশ বিঘা ধানের

জমি নিস্কর রূপে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দানপত্র আপনার বাড়ীতে পৌঁছে যাবে। আপনাকে একটা মোহর দিচ্ছি আপনার ছেলের হাতে দেবেন আর সরকার মশায় আপনার এক মাসের খোরাকীর টাকা খাজাঞ্চির কাছ থেকে দিয়ে দেবেন।

-- জগন্নাথের অশেষ কৃপা। আপনার বীর পুত্র দেশের এবং গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করুক জগন্নাথের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

খুশী মনে জমিদারের বাড়ী থেকে বের হন হারাধন। বাড়ী এসে দেখেন রান্না ঘরের পেছনে বাছুর সমেত একটা গাই বাঁধা রয়েছে। ভাবেন বোধ হয় পাশের বাড়ীর কারো হবে।

ঘরের বারান্দায় উঠতেই চোখে পড়লো জয়ন্ত বারান্দায় একটা ছোট্ট পিড়ির উপর বসে আছে। জয়ন্ত এসে প্রনাম করে বললো -- পণ্ডিত মশায়, আপনার ছেলে হয়েছে শুনে বাবা গাইটা পাঠিয়ে দিলেন। আপনার ছেলে দুধ খাবে। আমি চলি, ভগবানের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা জানাবেন।

একচক্রা গ্রামের পণ্ডিত যদুমোহন এসে হাজির হলেন। হারাধন জয়ন্তর দিয়ে যাওয়া গাভীটিকে ঘাসের জমিতে বেঁধে দিচ্ছিলেন। যদুমোহন ডেকে বললেন — ও হারাধন, তোমার বাড়ীতে তো কাল রাতে আনন্দের আসর বসেছিল শুনলাম। পাড়ার অনেকেই বলেছে তোমার বাড়ীতে যখন উলুধ্বনি দেওয়া হচ্ছিল তখন নাকি আকাশে মেঘ গর্জন হচ্ছিল দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও নাকি পড়েছে। আমার মনে হলো মেঘ গর্জন নয়, মৌরেশ্বরের মন্দিরের কাছেই যেন সিংহ গর্জন করছিল। তারপর যখন শুনলাম তোমার ছেলে হয়েছে তখনই তোমার বাড়ী ছুটে এলাম। তোমার ছেলে খুব ভাগ্যবান হবে গো হারাধন।

যদুদা, বারান্দায় একটু বসুন। আমি এলাম বলে। একটু তামাক খেয়ে যাবেন।

— আর একদিন এসে খাবো   গাইটা কবে কিনলে হে !

— আজ্ঞে কিনিনি, এই মাত্র প্রকাশ ঘোষের ছেলে জয়ন্ত গাভীটা দিয়ে গেলো। গরীব ব্রাহ্মণের ছেলেকে দুধ খাওয়ার জন্য প্রকাশ গাভীটা দান করেছে। সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকুক প্রকাশরা।

ভালই হলো, তোমার ছেলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার সৌভাগ্যকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। খুব ভালো।

হারাধন গরুটা ঘাসের জমিতে বেঁধে দিয়ে বারান্দায় পিড়িতে বসতে বসতে বললেন — আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন যদু দা। খুব ভোরে জমিদার বাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম ছেলের জন্য কিছু সাহায্য চাইতে। আমার কিছু বলার আগেই জমিদার বাবু বললেন — আমাকে পঁচিশ বিঘা ধানের জমি উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়, এক মাসের ভরন পোষণের খরচাও দক্ষিণা হিসেবে দেওয়ার কথা বলেছেন। প্রভুজগন্নাথ আমায় চিন্তামুক্ত করলেন।

— আমি চলি ভাই। আর একদিন এসে ছেলেকে দেখে যাবো। তোমার ভাগ্য খুলেছে। খুব খুশী হয়েছি।

ষষ্ঠী ছেলের নামাকরণ করতে হবে। বট গাছের পাতায় খাগের কলম দিয়ে পাড়ার মহিলাগণ যার যার পছন্দ মতো নাম লিখে জমা দিলেন ধাই শ্যামলীর মা বট পাতার স্তুপ দেখে হাসতে হাসতে বললেন প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতেই এক প্রহর সময় লেগে যাবে। তোমরা বরং প্রদীপ থেকে যার যার প্রদীপটা জ্বালিয়ে বট পাতার উপর রাখো। যার প্রদীপ সবচেয়ে বেশী সময় ধরে জ্বলবে সেই নামই রাখা হবে।

মাটির প্রদীপে তৈল দিয়ে সলতায় আগুন দিয়ে যার যার লেখা বট পাতার নামের উপর প্রদীপ বসিয়ে সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। জমিদার বসন্ত চৌধুরী ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে

কাপড় চোপড় ছাড়াও বিভিন্ন মিষ্টি দ্রব্যও পাঠিয়ে দিলেন। পাড়ার মহিলাগণও যার যার বাড়ী থেকে কেউ কলাই ভাজা, কেউ মটর ভাজা, কেউ ছিমের বিচি ভাজা, কেউ মুড়ি, কেউ চিড়া নিয়ে এসেছিল। সবগুলো একত্রিত হবার পর দেখা গেলো এক উৎসবের আয়োজন হয়ে গেছে।

পদ্মাবতী ছেলেকে কোলে করে আতুর ঘরে বসে আছেন। ধাই ছয় দিনের শিশুকে মায়ের কোলে আঙ্গুল চুষতে দেখে বিস্মিত হলেন। মায়ের কোলে শুয়ে শিশু আঙ্গুল চুষছে মাঝে মাঝে জ্বলন্ত শতাধিক প্রদীপের দিকে তাকিয়ে যেন মৃদু মৃদু হাসছে।

একে একে প্রদীপ গুলো নিভে যেতে লাগল। পরে পদ্মাবতীর জ্বালানো প্রদীপ এবং প্রতিবেশী মহিলাদের মধ্যে দুজনের প্রদীপ সমান ভাবে জ্বলতে থাকলো। তিনটি প্রদীপ একই সঙ্গে নিভে গেলো। প্রদীপ তিনটির নীচের বট পাতা তুলে পড়ে দেখা গেলো পদ্মাবতীর ছেলের নাম রেখে ছিলেন কুবের। কারণ- ছেলে জন্মানোর পর থেকেই অলৌকিক ভাবে শুধু যে হারাধনের ঘর পূর্ণ হচ্ছে তাই নয়।, প্রতিবেশীর অনেকের ভাগ্য খুলে গেছে। অপর দুটো নাম হলো বলরাম আর অনন্ত

সাধারণত শিশুরা ভূমিষ্ট হবার সময় যত বড় হয় কুবের তার চেয়ে বেশ বড় হয়েছে। ব্রতের দিন যখন কুবেরকে পদ্মাবতী সূর্যদর্শন করাচ্ছিলেন তখন একচক্রা গ্রামের সকলেই সবিস্ময়ে শুনলেন গ্রামের জাগ্রত দেবতা মোড়শ্বরের মন্দিরে যেন প্রকাণ্ড সিংহ তিনবার প্রচণ্ড জোরে গর্জন করে উঠলো।

জমিদার বসন্ত চৌধুরী কুবেরের ব্রত উপলক্ষ্যে খাবার দাবারের ব্যবস্থা করলেন। জমিদারের মোহরাঙ্কিত তামার পাত্রে লেখা দানপত্র হারাধনের হাতে তুলে দিলেন।

জমিদার বসন্ত চৌধুরী জর্নাদন আচার্যকে বললেন ঠাকুর মশায়, হারাধন ঠাকুরের ছেলে জন্ম গ্রহণের সময় থেকে একের পর একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। অন্যান্য বছর আমার জমিদারীর যা আয় হয় এবার তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে। গত তিন চার বছর ধরে যে সব প্রজা খাজনা জমা দেয়নি তারাও এবার স্বেচ্ছায় কাছারীতে গিয়ে খাজনা জমা দিয়ে এসেছে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন জমিদার মশায়। হারাধনের ছেলে যে দিন জন্মালো সে দিন রাতেও আমি মৌড়েশ্বরের মন্দিরে সিংহের গর্জন শুনেছিলাম। আজো কিছুক্ষণ আগে তিনবার সিংহের গর্জন শোনা গেলো। তাই নবজাতকের জন্মকুণ্ডলী বিচার করতে বসেছে। দেখি জাতক কোন অলৌকিক শক্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে কিনা। কিংবা কোন মহাপুরুষ এই গ্রামে জন্ম নিলেন কিনা।

—তাই দেখুন পণ্ডিত মশায়। মনে হয় আমাদের গ্রামে কোন মহাপুরুষ রূপেই কুবেরের জন্ম হয়েছে আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার ছেলের ব্রতের সময়ও আমি নিজে থেকে এত কিছু করার আগ্রহ অনুভব. করিনি। অথচ হারাধন ঠাকুরের ছেলে আমাকে এক রকম জোর করেই এখানে নিয়ে এলো সাত-আটদিন আগের কথা। রাতের তৃতীয় প্রহর পার হয়েছে আমি গভীর নিদ্রার মগ্ন। এমন সময় স্বপ্নে দেখলাম ছোট্ট একটি শিশু মৌড়েশ্বরের মন্দির থেকে বের হয়ে সোজা আমার বিচার সভায় গিয়ে হাজির হলো আমি অবাক হয়ে যখন শিশুটির রূপ লাবন্য দেখছিলাম তখনই শিশুটি হাসতে হাসতে বললো—আমায় চিনতে পারছো না? আমি যে হারাধম পণ্ডিতের ছেলে গো! তুমি বাপু তোমার সকল প্রজাকে ঘটা করে খাওয়াও তোমার মঙ্গল হবে। ঘুম ভেঙ্গে গেলো, ভাবতে লাগলাম। পরে বুঝতে পারলাম হারাধন ঠাকুরের ছেলের তো ব্রতের সময়

এগিয়ে এলো, ওর সূর্য দর্শন উপলক্ষেই পাড়ার প্রজাদের খাওয়াবো বলে ঠিক্ করলাম।

জনার্দন আচার্য একটি পোড়া কয়লা নিয়ে বারান্দার মাটিতে কি সব লিখে গণনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পাড়ার মানুষ হারাধন পণ্ডিতের বাড়ী এসে জড়ো হয়েছে। হারাধন পণ্ডিতের উঠানটি খুবই ছোট। শীতের দিন বলে মাঠে ফসল নেই। তাই জমিদার বাবুর বাড়ী থেকে চারটে বড় বড তাবু খালি জমিতে খাটানো হয়েছে। পাড়ার মানুষ যারা আসছে তারা তাদের সাধ্য মতো জিনিষ নব জাতকের জন্য নিয়ে আসছেন।

জনার্দন ঠাকুর এক দণ্ড সময় পর্যন্ত বিচার করে জমিদার বসন্ত চৌধুরীকে বললেন-- জমিদার মশায়, এই শিশু একদিন পাড়ায় মুখ উজ্জ্বল করবে। শিশুর জীবনে সন্ন্যাস নেবারও সম্ভাবনা আছে। কয়েকটি গ্রহই তুঙ্গী রয়েছে। ধর্মস্থানে তিনটি শুভ গ্রহের অবস্থান রয়েছে।

পাড়ার যত গোয়ালা ছিলো সবাই ঘরের দুধ নিয়ে এসেছে। জমিদার বাবুর নির্দেশে রান্নার ঠাকুরগণ ভোরেই হাঁড়ি চড়িয়েছিলেন। দুপুর হতে না হতেই রান্না শেষ হয়ে গেছে। বহু বৎসর পর গ্রামের মানুষ তৃপ্তি ভরে উপাদেয় খাদ্য খাওয়ার সুযোগ পেয়ে আকণ্ঠ আহার করে শিশুকে আশীর্বাদ করে বাড়ী ফিরে গেলেন।

এক মাসের শিশু কুবেরকে কোলে করতে পাড়ার মহিলাদের মধ্যে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সকলেই প্রথম এই শিশুকে কোলে নিতে চায়। ধাই শ্যামলীর মা অনুচ্চস্বরে পদ্মাবতীকে বললো ঠাকুর দিদি, ছেলের বা হাতের কনে আঙ্গুলটা একটু কামড়ে দাও। মহিলারা যেভাবে ওকে কোলে নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে শিশুর উপর ওদের দৃষ্টি লাগতে পারে।

শ্যামলীর মার কথা মতো পদ্মাবতী ছেলের বা হাতের কনে

আঙুলে মৃদুভাবে একটু কামড়ে দিলেন। শিশু কেঁদে উঠলো।

পাড়ার কানুর মা শিশুকে কোলে নিয়ে দোলাতে লাগলেন। কানুর মার কোলে গিয়েই শিশু চুপ করে গেলো। কানুর মার কাছ থেকে শিশু কোল বদল হতে লাগলো। তারপর অনেকের কোল ঘোরে কুবের আবার পদ্মাবতীর কোলে ফিরে এলে পদ্মাবতী ছেলেকে কোলে নিয়ে সস্নেহে চুম্বন করলেন।

অগ্রহায়ণ মাস থেকেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গঙ্গাসাগরে পৌষ সংক্রান্তি মেলায় যোগদানের জন্য সাধুদের আনা গোনা শুরু হয়। দল বেঁধে সাধুরা আসেন। স্নান সেরে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে আবার যার যার আশ্রমে ফিরে যান। দুপুর হতেই সাত জন সাধু সেদিন একচক্রা গ্রামে এসে পৌঁছেছেন হারু পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রচুর লোক সমাগম দেখে মহন্ত গোবিন্দানন্দ ঠাকুর সঙ্গীদের বললেন সাধু ভাই সব, চলুন ঐ বাড়ী ঘুরে আসি। আজ নারায়ণ আমাদের ভিক্ষার ব্যবস্থা ঐ বাড়ীতে করে রেখেছেন।

জমিদার বসন্ত চৌধুরী নিজেও ব্রাহ্মণ। অচেনা সাধুদের আগমনে বসন্ত চৌধুরও খুব খুশী হলেন। সেবকদের ডেকে সাধুদের বসার জায়গা করে দিতে বললেন। সাধুরা নিজেদের আসন বিছিয়ে বারান্দায় জমিদারের পাশেই বসলেন

হারু পণ্ডিত এসে সাধুদের প্রনাম জানিয়ে হাত পা ধোয়ার জল এনে দিলেন। খাবার তৈরী হয়েছে। এক দিকে ব্রাহ্মণ ও অন্য দিকে অন্য সব মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধুদেরও ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন হারু পণ্ডিত। মহন্ত গোবিন্দানন্দ ঠাকুর বললেন বাবা কাল স্বপ্নে দেখছিলুম এক মহাপুরুষ উৎসবের আয়োজন করেছেন। তিনি ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন আর অনেক মানুষ প্রসাদ পাচ্ছেন। আপনার বাড়ীর আশ পাশের চেহারা দেখে মনে হয় এমনি এক

পরিবেশে আমরা প্রসাদ পেয়েছিলাম। মাঠের মাঝে তাবু লোকজন, বাড়ীর দক্ষিণ কোনে কলাগাছের সারি। সবাই মিলে যাচ্ছে। কিন্তু শ্যাম বর্ণ দীর্ঘদেহী যে সন্ন্যাসী দেখা পেয়েছিলাম একমাত্র তিনিই নেই।

পদ্মাবতী ছেলেকে কাপড়ে ঢেকে কোলে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে বারান্দায় এসে সাধুদের সামনে মাটিতে রেখে বললেন সাধু বাবা; আপনারা দয়া করে যখন এই শিশুর ব্রত উপলক্ষ্যে পদধুলি দিয়েছেন তখন আশীর্ব্বাদ করে যান যেন সে দীর্ঘ জীবন লাভ করে।

মহন্ত গোবিন্দজী কিছুক্ষণ শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন —মা, এই শিশু শুধু যে দীর্ঘায়ু হবে তাই নয়। এর আকর্ষণে একদিন বহুলোক পাগল হয়ে ছুটে আসবে।

জমিদারের কাছ থেকে নিস্কর জমি পাওয়ায় ফলে হারাধনের আর অন্ন কষ্ট রইলো না। জমিদার নিজেই মুনিমের মাধ্যমে দুজন কৃষকের তত্ত্বাবধানে জমিগুলো চাষ করার ব্যবস্থা করেদিলেন। জমির মালিক হারাধন পণ্ডিতই থাকবেন। চাষীরা চাষ করে যে ফসল পাবেন তার অর্ধেক ফসল হারাধন পণ্ডিতকে দিয়ে দেবে।

শ্যামলীর মা হারাধনের বাড়ীতেই রয়ে গেছে কুবের যেন শ্যামলীর মাকে অক্টোপাসের মতোই ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে স্নেহের বাঁধনে আবদ্ধ করে ফেলেছে।

কুবেরের যখন তিন বছর তখন পদ্মাবতীর কোল আলো করে আর একটি ছেলে এলো। হারাধন এই ছেলের নাম রাখলেন — জগন্নাথ।

পাড়ার লোকদের কেউ কেউ কুবেরকে আবার রাম বলেও ডাকতো। হারাধন হেসে বলতো আমার জগন্নাথকে লক্ষণ বলে ডাকলে ঠিক হতো। জগন্নাথ কুবেরের একেবারে বিপরীত হয়েছে। কুবেরের গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। আর জগন্নাথের

গায়ের রং টুকটুকে ফর্সা।

জমিদার বসন্ত চৌধুরী মারা গেছেন ক'মাস হলো। কুবেরের ব্রতদিন উপলক্ষ্য করে সারা একচক্রা নগরে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো জগন্নাথের ব্রত উপলক্ষে তেমনটি হয় নি। তবুও হারাধন পাড়ার সকলকে ব্রত উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সকলে এসে হারাধনের বাড়ীতে পেটভরে খেয়ে নবজাতক জগন্নাথকে আশীর্বাদও করে গেছেন। তবুও তেমন আনন্দ হয় নি।

পাঁচ বছর বয়স হলো কুবেরের। জনার্দন আচার্যকে খবর পাঠিয়ে আনা হয়েছে। একটা শুভ দিন দেখে কুবেরের হাতে খড়ি ব্যবস্থা করতে।

জনার্দন আচার্য গণনা করে দেখলেন মাঘ মাসে কুবেরের চার বছর পূর্ণ হয়ে পাঁচ বছর শুরু হয়েছে। মাঘ মাসের শুক্ল-পক্ষের শ্রীপঞ্চমী তিথিতেই কুবেরের হাতে খড়ির ব্যবস্থা করা ভালো।

পদ্মাবতী হারাধনকে বললেন — হাতে খড়ির দিন সরস্বতী পুজোরও আয়োজন করতে। পুরোহিত পদে জনার্দন আচার্যকেই নিয়োগ করা হউক।

পাড়ার অন্য ছেলেরা যারা পাঁচ বছরে পড়েছে তাদের তুলনায় কুবেরের গড়ন অনেক বেড়ে গেছে। দেখলে মনে হবে সাত আট বছরের ছেলে।

পাঁচ বছরে পা দেবার আগে থেকেই কুবের মাঝে মাঝে গোয়াল ঘরে গিয়ে গাই লালীর দুধের বাঁটে মুখ দিয়ে বাছুরের মতো টানতে থাকতো গাভী লালীও নিজ বাচ্চার মতোই আদর করে কুবেরকে দুধ দেয়। বাঁটে যখন মুখ দিয়ে টানতে থাকে তখন লালী শুধু চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকেনা মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে কুবেরের পিঠ চেটে দেয়।

একদিন ভোর বেলা শ্যামলীর মা জগন্নাথকে নিয়ে কুল গাছের তলায় পাকা কুল কুড়াতে ব্যস্ত। এমন সময় কুবের গোয়াল ঘরে ঢুকলো। পদ্মাবতী ঘাটে যাচ্ছিলেন কুলতলার পাশ দিয়ে। শ্যামলীর মা বললো— মা ঠাকরোণ, কুবেরকে দেখলাম গোয়াল ঘরে ঢুকেছে। লালী যেই রাগী নাগাল পেলে গুতো মেরে কুবেরকে মেরে ফেলবে।

—ছেলেটা মাঝে মাঝেই দেখি গোয়াল ঘরে ঢুকে। না করলেও শুনে না। একটা বিপদ ঘটতে কতোক্ষণ বলো দেখি? যাই ওকে গোয়াল ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসি।

শব্দ করে গেলে ছেলে যদি ভয় পেয়ে গরুর সামনে চলে যায় তাহলে বিপদ হতে পারে এই মনে করে পদ্মাবতী চুপি চুপি গোয়াল ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে চুপি দিয়ে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তিনি অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে বেড়ার ফাঁক দিয়েই তাকিয়ে রইলেন স্থানুর মতো।

শ্যামলীর মা কুলতলা থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো— কিগো মা ঠাকুরোণ, কী চেয়ে দেখছো? ছেলেটাকে আগে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসো।

পদ্মাবতী বেড়া থেকে মুখ সরিয়ে শ্যামলীর মারদিকে তাকিয়ে ইশারা করে চুপি চুপি আসতে বললেন। শ্যামলীর মা বুঝলো নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটছে তাই চুপি চুপি এসে সেও বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলো কুবের আপন মনে লালীর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খাচ্ছে।

লালী পশু। কিন্তু, লালীর বাটে মুখ লাগিয়ে কুবের যখন দুধ খেতে শুরু করলো তখন তার পশুত্বের অবসান হয়ে মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। আর মা'র যে কোন জাত নেই, শ্রেণী নেই লালী যেন কুবেরকে নিজ দুধ খাইয়ে দিতে গিয়ে এ কথাই মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করলো।

জগন্নাথ পদ্মাবতীর কোলে আসার পূর্বে পর্যন্ত কুবের পদ্মাবতীর বুকের দুধ খেয়েছে। পদ্মাবতী শুনেছে মা গর্ভবতী হবার পাচ-ছ'মাস পর বুকে আর দুধ থাকে না। সন্তান ভূমিষ্ট হবার পরই আবার বুকে দুধ দেখা দেয়। কিন্তু, পদ্মাবতী আবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে জগন্নাথের জন্মের একদিন আগেও তার বুকে প্রচুর দুধ ছিলো এবং তৃপ্তি ভরেই কুবের মা'র বুকের দুধ খেয়েছে।

জগন্নাথ আসার পর কুবেরকে আর দুধ খেতে দেয়নি পদ্মাবতী। দুধ খেতে গেলেই বলেছেন কুবের, তোমার ছোট ভাইটা আমার দুধে পায়খানা করে দিয়েছে। কখনো দুধে হয়তো বাটা হলুদ মেখে কুবেরকে দেখিয়ে বলেছেন কুবের, দেখ, দেখ, তোমার ছোট ভাইটা কত দুষ্টু দুধে পায়খানা করে দিয়েছে। তুমি দুধ খাবে? কুবের কিছুক্ষণ মায়ের দিকে তাকিয়ে তার পর বলেছে — দুধ ছোট ভাই খাবে।

দু-তিন দিন এমন করার পর কুবের আর মার কাছে দুধ খেতে আসেনি। দুধ খাবার পিপাসা হলে মা'র কাছে এসেও আবার ছোট ভাইকে দেখে ফিরে গেছে

গোয়াল ঘরের বেড়ায় ফাক দিয়ে লালীর বাট থেকে কুবেরকে দুধ খেতে দেখে পদ্মাবতীর মনেও যে মাতৃ ভাবের উদয় হয়েছে তার ফলে তার বুকের দুধ ফোয়ারার মতো বের হয়ে কখন যে তার বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে তা খেয়ালই করেনি পদ্মাবতী।

শ্যামলীর মা পদ্মাবতীর বুকের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো মাতৃভাবে ভয়পুর পদ্মাবতীর বুকের কাপড় দুধে ভেসে যাচ্ছে। শ্যামলীর মা ফিস্ ফিস্ করে বললো মা ঠাকৃরোণ, জগন্নাথকে কোলে করে একটু দুধ দাও। তোমার বুকে দুধ এসেছে।

শ্যামলীর মার কথায় পদ্মাবতীর হুঁস হলে বুঝতে পারলো বুকের দুধ গড়িয়ে শুধু তার বুকের কাপড়ই ভিজিয়ে দেয়নি, শরীরের কিছু কিছু অংশও ভিজে গেছে।

পদ্মাবতী মনে মনে লজ্জিত হলেও পুত্র স্নেহে ভরপুর মাতৃ হৃদয় কুবেরকেই কোলে করে কিছুক্ষণ দুধ খাওয়াতে ইচ্ছে করেছিলো। কিন্তু মুখে বললেন জগন্নাথ ছেলেটা এত দুষ্টু হয়েছে সে আজ কাল বুকের দুধ খেতেই চায়না। সামান্য সময় দুধ খেয়েই কোল থেকে নেমে পড়ে। কুবের যখন দুধ খেতো তখন ওকে বকাবকি করেও দুধ থেকে ওর মুখ সরাতে পারতাম না।

পদ্মাবতী এবং শ্যামলীর মাকে গোয়াল ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে কৌতহলী হয়ে হারাধন এগিয়ে গেলেন।

হারাধন গরুর কাছে পৌঁছানোর আগেই কুবের গরু ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। তার মুখ বেয়ে দুধ পড়ছিল। মা, ধাইমা এবং সামনে বাবাকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

হারাধন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে স্ত্রীকে বললো — ছেলেটা ভারী দুষ্ট হয়েছে। কখন লালী শিং দিয়ে মেঝে বসে ঠিক নেই। তুমি ছেলেটাকে একটু সাবধানে রেখো।

জনার্দন আচার্য্যের সংস্কৃতের টোলে ভর্তি হয়েছে কুবের। মুঘল বংশের পতনের শুরু হওয়ায় চারিদিকেই সামন্ত রাজগণ স্বাধীন হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ছোট খাটো জমিদারগণ পর্যন্ত খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এমতবস্থায় গৌরেও মুঘলদের প্রাধান্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

গৌরের সুলতান হোসেন শাহ অবশ্য মুঘল শাসকদের তুলনায় অনেকটা উদার প্রকৃতির। তবুও তার অধীনস্থ অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সামরিক ব্যক্তি হিন্দুদের উপর নানা

ভাবেই উৎপীড়ন চালাতে ব্যস্ত রয়েছে।

এতকাল ফার্সী, আরবী ভাষা শিক্ষার যে ধুম পড়েছিলো তা কিছুটা রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই স্তিমিত হয়ে এসেছে। কাশী, বারানশীর মতো বাংলায়ও সংস্কৃত চর্চা আবার নতুন ভাবে শুরু হয়েছে। একচক্রা গ্রামে আচার্য জনার্দনের টোল ছাড়াও অপূর্ব বাচস্পাতির টোলে অনেক ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করছে।

পণ্ডিত যদুমোহনের বয়স হওয়ায় টোল বন্ধ করে দিয়েছেন। দু-একজন উৎসাহী ছাত্র এখনো দূর-দূরান্ত থেকে যদুমোহনের কাছে আসে ন্যায় শাস্ত্রের টীকা জানার জন্য।

জনার্দন আচার্যের টোলের একুশ জন ছাত্র আছে। কুবেরকে সব ছেলেই ভালোবাসে। সকলেই কুবেরের সঙ্গে বসতে চায়। কুবের এই একুশজন ছাত্রের মধ্যে বয়সে সকলের ছোট হলেও শরীরের গঠনে এবং শক্তিতে তাদের সকলেরই উপরে। কুবেরের চেয়ে বয়সে দু-তিন বছরের বড় ছেলেদেরও শক্তিতে কুবের অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারে।

জনার্দন আচার্য নিজেই কুবেরের জন্ম পত্রিকা রচনা করেছেন। তিনি দেখেছেন এই শিশুর ধর্ম স্থানে অনেক শুভ গ্রহের শুভ অবস্থান রয়েছে।' শুধু তাই নয় ধর্ম স্থানে কুবেরের জীব যোগ স্থাপিত হয়েছে। এর ফলেই জনার্দন আচার্য কুবেরকে অন্য ছাত্রদের তুলনায় মনের অজান্তেই একটু বেশী স্নেহ করেন।

টোল সকাল এক প্রহর বেলায় বসে। দ্বিতীয় প্রহর শেষ হলে ছুটি হয় অনেক ছাত্রই বাড়ী থেকে এজন্য খাবার নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে জনার্দন আচার্যের বাড়ীতে গোপালের কাছে যে ভোগ নিবেদন করা হয় তা থেকে প্রসাদ সকল ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিশেষত দ্বাদশীর দিন জনার্দন পণ্ডিত শিশুদের পারণ করিয়ে তারপর নিজে পারণা করেন।

পাড়ার লোকে বলে জনার্দন আচার্যের বাড়ীর গোপাল

নাকি খুব জাগ্রত। কয়েক পুরুষ ধরেই জনার্দন আচার্যের পরিবার গোপালের সেবা করে আসছেন। এই গোপালের সঙ্গে জনার্দন আচার্যের পরিবারেরও একাত্ম সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তাই জনার্দন ঠাকুর গোপালকে পাথরের তৈরী একটি মূর্তি বলেই মনে করেন না। গোপালকে রক্ত মাংসের শিশুর মতোই মনে করেন।

জনার্দন ঠাকুর ছাত্রদের ব্যাকরণের একটা অংশ মুখস্থ করতে বলে নিজে গোপালের সেবায় রত হয়েছেন। কুবের কিছুক্ষণ পরেই পাঠ ছেড়ে উঠে জনার্দন ঠাকুরের গোপাল মন্দিরে চলে গেছে।

জনার্দন ঠাকুর গোপালের সামনে ভোগ নিবেদন করে চোখ বুজে গোপালের ধ্যান করছিলেন এমন সময় কুবের চুপি চুপি গোপালের মন্দিরে ঢুকে থালায় দেওয়া ভোগ থেকে বড় একটি কলা নিয়ে এলো।

কলা নিয়ে মন্দির থেকে বের হয়ে পড়ুয়াদের সামনে না গিয়ে সোজা মন্দিরের পেছনে গিয়ে কলাটা খেয়ে পরনের কাপড়ে হাত মুছে হাসতে হাসতে পড়ার ঘরে এসে হাজির হলো।

পড়ুয়াদের দু একজন কুবেরকে মন্দিরের ভেতরে যেতে দেখেছে। পণ্ডিত মশায় দেখে থাকলে বেত দিয়ে খুব মারবেন এ কথা ভেবে মনে মনে দুঃখিত হয়েছে তারা

কুবেরকে একটা কিছু হাতে করে মন্দিরের পেছনে চলে যেতে দেখে দু-একজন পড়ুয়া মনে মনে দুঃখিত হয়েছে। তারা ভেবেছে পণ্ডিত মশায় নিশ্চয়ই কুবেরকে কোন খাবার খেতে দিয়েছেন। হয়তো বা বলে দিয়েছেন পড়ুয়াদের না দেখিয়ে খেয়ে যাবার জন্য। পড়ুয়ারা এও জানে মাঝে মাঝে পণ্ডিতের স্ত্রী [illegible] কুবেরকে ওনাদের ঘরে নিয়ে যায় এবং কিছু খাইয়ে দেয়।

জনার্দন আচার্য চোখ বুজে গোপালের ধ্যান করতে করতে দেখলেন গোপালের পাশে যেন আর এক শিশুর আবির্ভাব ঘটেছে। গোপাল থেকে বছর খানিকের বড় হবে। দেখতে খুব সুন্দর, গায়ের রং ফর্সা শরীর মোটা সোটা।

জনার্দন আচার্যের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি বুঝতে পারলেন ঐ শিশু আর কেউ নয়, স্বয়ং বলরাম। তারপর দেখতে পেলেন ঐ শিশু যেন ধীরে ধীরে আরো বড় হয়ে ক্রমে তার প্রিয় ছাত্র কিশোর কুবেরের রূপ পরিগ্রহ করে একটা কলা ভোগের থালা থেকে হাতে তুলে নিয়ে ঠাকুর ঘর থেকে বের হয়ে গেছে আর কুবেরের বের হবার সঙ্গেই মনের মাঝ থেকে গোপালের মূর্তিও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জনার্দন ঠাকুরের ধ্যান ভেঙ্গে গেলো। তিনি ভোগের থালার দিকে তাকিয়ে দেখলেন সত্যি সত্যি ভোগের বড় কলাটা নেই। আনন্দে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকলো। চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগলো।

আনন্দ এবং উত্তেজনার ভাবটা প্রশমিত হলে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে সোজা টোলে চলে এলেন। এসে দেখেন পড়ুয়ারা সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। কুবেরও পড়ছে। কিন্তু, তার পড়ায় যেন খুব একটা মনোযোগ নেই। পণ্ডিতকে দেখে যেন সে নিজেকে সংকুচিত করে রেখেছে। উচ্চারণ ঠিক মতো হচ্ছে না।

অন্যান্য ছাত্রদের বেলায় জনার্দন পণ্ডিত এই অপরাধ ক্ষমা করতেন না। প্রচণ্ড ধমক দিতেন। কিন্তু, কুবেরের বেলায় ধমক দিতে গিয়েও বহুবার তার জিভে আড়ষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। কুবেরকে তিনি মিষ্টি কথায় জিজ্ঞেস করলেন বাবা, আজ তোমার সংস্কৃত উচ্চারণে এমন ভুল হচ্ছে কেন? পড়ায় তোমার মনযোগ নেই?

কুবের বললো ঠিকই ধরেছেন পণ্ডিত মশায়। আমার কেন

যেন পড়তে গিয়ে সব তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আজ আর পড়তে একদম ইচ্ছে করছে না।

—খিদে পেয়েছে? না শরীর ভালো নেই।

—খিদেও পায়নি, শরীরও ভালো আছে। আজ পড়তে ইচ্ছে করছে না

—ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করো পুজোর প্রসাদ এনে তোমাদের সবাইকে দিচ্ছি।

—পণ্ডিত মশায় চলে গেলে অন্য ছাত্ররা কুবেরকে জিজ্ঞেস করলো কুবের, তুই মন্দিরের পেছনে লুকিয়ে কি খেয়েছিস রে?

পণ্ডিত মশায় তোকে কি দিয়ে ছিলেন?

এবার কুবের রাগত স্বরে বলে-এত কথার দরকার কিরে? তোদের সবাইকেইতো প্রসাদ দেবেন। চুপ কর।

পড়ুয়াদের সকলের সঙ্গেই কুবেরের ভাব খুব ভালো। কুবের না থাকলে তাদের খেলা জমে না। কুবের তাদের দল নেতা। কুবের পাছে রাগ করে আজ আর খেলতে না আসে এই ভয়ে ছেলেরা সকলেই চুপ করে রইলো। শুধু ইন্দ্র নামে একটা ছেলে বিবাদের সুরে বললো—পণ্ডিত মশায় আর পণ্ডিতানী দুজনেই তাকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসে।

ভোঁদা নামে একটি ছেলে আছে, দেখতে খুব মোটা-সোটা। হাঁটতে গেলেও অনেক সময় পড়ে যায়। বয়সে এবং আকৃতিতে সকল পড়ুয়াদেরই বড়। বুদ্ধি তার একেবারেই নেই। সে জন্যই সকলে তাকে ভোঁদা বলে ডাকে। এই ভোঁদা বললো—ইন্দ্র, কুবেরের ব্রতের কথা তোর মনে নেই। তখন তোর হয়তো এক বছর বয়স হবে। কিন্তু আমার দিব্যি মনে আছে। গ্রামের জমিদার কুবেরের ব্রত উপলক্ষ্যে স্বয়ং তাদের বাড়ী এসে সারাদিন কাটিয়ে গেছেন। আর পাড়ার সবাইকে এত কিছু খাইয়েছেন যে সে খাবারের কথা মনে আসলে আমার জিভে এখনো জল আসে।

মনা নামে একটি ছেলে কুবেরের কানে কানে বললো—কুবের আমাদের জামরুল বাগানে মৌমাছিরা বাসা বেঁধেছে। মধুও হয়েছে। যদি বলিস, সবাই মিলে আজ মৌচাক ভেঙ্গে মধু খাওয়া যাবে।

মধু কুবেরের খুব প্রিয়। তাদের গ্রামে ফুলের যেমন মেলা বসে তেমনি ফুলের গন্ধে পাগল হয়ে কিছুদিন পরপরই মৌমাছিরা গ্রামের এখানে সেখানে বাসা বাঁধে।

গ্রামের যুবক ও বয়স্করা যেখানে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছির চাক্ ভেঙ্গে যেখানে মধু সংগ্রহ করে সেখানে পাঁচ বছরের কুবের তরতর করে বড় বড় গাছে উঠে ধোঁয়া ছাড়াই মৌমাছির চাক ভেঙ্গে মধু নিয়ে আসে। মৌমাছিরা দল বেঁধে তার চার পাশে ঘুরঘুর করে, কিন্তু কামড়ায় না।

কুবের মনাকে কানে কানে বললো— সবাইকে বলিস না কিন্তু। আগে মৌচাকটা দেখে নিই মধু হয়েছে কিনা, তারপর না হয় সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া যাবে।

কুবের পাঠশালা থেকে বের হবা মাত্র জয়ন্ত এসে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলো —কুবের ভাই, কোথায় যাবি রে ?

কুবের মিথ্যে কথা কখনো বলে না, একথা জয়ন্ত জানে। তাই মনা কুবেরকে 'কি বলেছে তা জানার জন্যই কুবেরকে সে জিজ্ঞেস করলো।

কুবের জয়ন্তর কানে কানে বললো— মনাদের বাগানে মধু হয়েছে। মধু খেতে যাবো। কাউকে আর বলিস নে যেন। কিন্তু, এক কান থেকে এভাবে আর এক কান হয়ে একুশ জন পড়ুয়াই মৌচাক ভাঙার কথা জেনে নিলো।

কুবের কোনদিন পাঠশালা থেকে ফিরে তালপাতার পুঁথিটা টেবিলের উপর রেখেই ছুট দেয়। আবার কখনো পাঠশালা থেকে ফিরেই গরম ভাত খাবার আব্দার জানায়।

শ্যামলীর মা সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে ঘর-দোর ঝাঁটা

দিয়ে স্নান সেরে নেয়। তারপর রান্নার ঘরে ঢুকে আগে রান্না বসায়। কুবের দুধ মুড়ি খেতে ভালবাসে। তাই আগের দিনের দুধ রেখে দেয় কুবেরের জন্য। কখনো গুড় দিয়ে, কখনো বা খেজুরের গুড় দিয়ে, কখনো কলা দিয়ে সকালের খাওয়া সেরে তালপাতার পুঁথি, খড়ি মাটি আর একটা শ্লেট নিয়ে পণ্ডিতের বাড়ী পড়তে যায়। কিছুদিন শ্যামলীর মা কুবেরকে পণ্ডিত মশায়ের পাঠশালায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এখন কুবের একাই চলে যায় পণ্ডিত মশায়ের পাঠশালায়।

পদ্মাবতী ছেলের জন্য চিন্তা করলেও হারাধন ছেলের জন্য মোটেই চিন্তা করেন না। হারাধন পদ্মাবতীকে মাঝে মাঝে বলেন—তোমার এই ছেলেতো দু দিনের জন্য সংসারে এসে আমাদের মায়ার ফাঁদে ফেলে কাঁদিয়ে মারতে চায়। এই ছেলে সংসারে থেকে পণ্ডিতি করতে আসেনি। আমি জানি, যে কোন দিন সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। আর যদি তাকে আমরা বাধা দিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখি তাহলে ভগবান তাকে নিয়ে যাবেন। সে আমাদের সঙ্গে দু-দিনের অভিনয় করতে এসেছে। তার জন্য ভাবনা কেন?

পদ্মাবতীর মাতৃহৃদয় হারাধনের ঐসব কথায় একদম শান্ত হয় না। তাদের বাড়ী থেকে সামনে গেলেই পড়ে জোর দীঘি। জোড় দীঘির মাঝখানের প্রশস্ত পাড় দিয়েই মানুষের চলার পথ। জোড় দীঘির এই পথে রয়েছে সারি সারি বিশাল তাল গাছ। রাতের বেলায় এই পথ দিয়ে একা আসতে কেউ সাহস পায় না তালগাছগুলোতে নাকি প্রেতাত্মারা থাকেন। তাই পদ্মাবতীর ভয় হয় এই ছোট ছেলের কোন অনিষ্ট না ঘটে যায়।

কুবের পাঠশালা থেকে বাড়ী ফিরে মনাদের বাগানে মধু খাবার লোভে পুঁথিটা রেখেই দৌড় দিলো। পদ্মাবতী ছেলেকে পাঠশালা থেকে আসতে দেখেছেন। শ্যামলীর মাকে বলেছেন একটু গরম দুধ কুবেরকে দিতে। শ্যামলীর মা দুধ নিয়ে ঘরে

ঢুকে দেখে কুবের নেই। চলে গেছে।

কুবের কখন কোথায় কার বাড়ী যায় পদ্মাবতী কেন হারাধনও জানে না। কতদিন ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়ে নাজেহাল হয়ে হারাধনকে ফিরতে হয়েছে। তাই হারাধন ছেলেকে সারা পাড়া ঘুরে বের করে আনার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

ন্যায় শাস্ত্র পড়তে দু-এক জন ছাত্র এখনো দূর দূরান্তর থেকে হারাধনের কাছে ছুটে আসেন। হারাধনের বিদ্যে বিশেষ ছিলো না। কিন্তু, স্মৃতি শক্তি প্রখর থাকায় বাবা ছাত্রদের রোজ শিক্ষা দেবাও সময় যা বলতেন তাই খুব মন দিয়ে শুনতেন হারাধন। তাছাড়া মামার কাছ থেকে কিছু ঝার ফুক শিখে ছিলেন। তাই করেই জনগণের সেবা করে যাচ্ছেন। সংসারও এই ভাবেই চালাতেন।

জমিদার বাবু নিস্কর জমি দান করায় ঝার ফুক করে মানুষের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। হারাধনের ঝার ফুকে মানুষের নাকি উপকার হয়। এই খবরও অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ায় হারাধনের বাড়ীতে সারা দিনই বাইরের লোক দেখা যায়।

হারাধনের বাড়ী এসে কেউ খালি মুখে যেতে পারে না। যদি কুবের জানতে পারে কিংবা দেখতে পায় অন্তত একটা বাতাসাও মুখে না দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে তা হলে সেই লোকটির যেমন তখনকার মতো খাওয়া বন্ধ তেমনি দু-একটা জিনিষ ভাঙ্গচুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

হারাধনর ছেলের মনোভাব বুঝতে পেরে পদ্মাবতীকে বলে দিয়েছেন কোন ভিক্ষুক যেন এ বাড়ী থেকে ভিক্ষা না পেয়ে ফেরত না যায়। আর কোন আগন্তুককেও যেন এক গ্লাস খাবার জল এবং অন্তত একটা বাতাসা হলেও খেতে দেওয়া হয়।

কুবের পাঠশালা থেকে এসেই চলে যাওয়ায় পদ্মাবতী একা একা নিজের ভাগ্যকে বার বার দোষ দিচ্ছেলেন। স্বামীর মুখে ছেলের সন্ন্যাস নেবার কথা শুনে এমনিতেই পদ্মাবতীর মন সর্বদা বিষাদে ভরা থাকে। তারপর ছেলের চঞ্চলতার জন্য ছেলেকে ঠিক সময়ে মনের মতো করে না খাওয়াতে পারার জন্যও একাকী কান্না করেন।

হারাধন পড়ার ঘরে এক ছাত্রকে ন্যায় শাস্ত্র সম্বন্ধে পাঠ দিচ্ছিলেন। পদ্মাবতীর গলা শুনে পড়ার ঘর থেকে বললেন—তোমাকে তো বলে দিয়েছি কুবেরের মা, কুবেরের জন্যই তুমি যত বেশী ভাববে৷ ততই মনে বেশী আঘাত পাবে ঠাকুরের চরণে ছেলের ভার ছেড়ে দাও। ঠাকুর জগন্নাথ যা করেন তাই হবে। তুমি তোমার ছোট ছেলে জগন্নাথের প্রতি বরং বেশী যত্ন নাও। কুবেরের ঈশ্বরের অংশে জন্ম, ঈশ্বরই তাকে দেখা শুনার ভার নেবেন।

স্বামীর কথা শুনে পদ্মাবতী দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়ে রান্না ঘরে ফিরে এসে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ছেলের মঙ্গল কামনা করেন।

মনাদের বাড়ী যেতে হলে জোর পুকুরের রাস্তা ধরে সামান্য এগিয়ে ডানদিকের টিপির উপর মৌড়েশ্বরের যে মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরের পাশের সর্পিল মাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে হয়। জোর পুকুরের মাঝামাঝি এলেই আম গাছের ফাকে মৌড়শ্বর মন্দিরের গোলাপী রং এর ত্রিশুল বসানো চুড়া দেখা যায়।

মন্দিরটি আয়তনে খুব একটা বড় নয়। আট হাত লম্বা সাত হাত চওড়া, ষোল হাত উচু। মন্দিরের চারদিকে যাতে প্রদক্ষিণ করা যায় সে জন্য চার দিকেই চার হাত পাশ বারান্দা রয়েছে।

মন্দিরের পুরোহিত শীতল ঠাকুর মন্দির চত্বরেই একটা খরের ছাউনি চালা ঘরে থাকেন। বিয়ে থা করেন নি। বসন্ত চৌধুরীর বাবা এখানে মন্দির তৈরী করে মোড়েশ্বর বিগ্রহ স্থাপন করার পর থেকেই শীতল ঠাকুর এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে কাজ করছেন।

পুরোহিত যখন এই মন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিলো মাত্র পনের বছর। আর এখন তার বয়স এক্শো পার হয়ে গেছে। মন্দির ছেড়ে এক মহুর্তের জন্যও কোথাও বের হয় না। পাড়ার লোকের কাছে শীতল ঠাকুর এক বিস্ময়। ঠাকুরদা, বাবা, ছেলে এই তিন পুরুষ ধরে গ্রনের সকলে শীনল ঠাকুরকে প্রায় একই রকম দেখে আসছে। বয়স যে একশো পার হয়ে গেছে পাড়ার বাইরের লোক একথা কখনো বির্শ্বাস করে না।

শীতল ঠাকুরের শুধু মাথায় দু-একটা চুল পেকেছে। শরীরের গড়ন এখনো যেমন শক্তসমর্থ রয়েছে তেমনি চোখের দৃষ্টিও বিন্দুমাত্র কমেনি। পাড়ার বুড়োরা বলে শীতল ঠাকুর নিশ্চয়ই মোড়েশ্বরের কৃপা লাভ করে জরা ও ব্যাধিকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে আর তার ফলেই শীতল ঠাকুরের যৌবন একশো বছর পরও অস্তমিত হয়নি।

হারাধনের বিয়ের পর সন্তান আসছেনা দেখে স্ত্রী পদ্মাবতী মোড়েশ্বরের কাছে সন্তান কামনা করে একদিন ধর্ণা দিয়েছিলেন:

শীতল ঠাকুর দেখেছেন যখন পদ্মাবতী মন্দিরের সামনে ঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাবার আশায় ধর্ণা দিয়ে শুয়েছিলো যখন সূর্য্য প্রায় যাই যাই করছিলো ঠিক তখনি বিদায়ী সূর্যের সোনালী রশ্মির একটা দ্যুতি যেন চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে মোড়েশ্বর মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। শীতল ঠাকুর

বুঝতে পারলেন পদ্মাবতীর প্রার্থনায় ঈশ্বর হয়তো সদয় হয়েছেন। ঠাকুর নিজেই অংশরূপে পদ্মাবতীর ঘর আলো করার জন্য এগিয়ে আসছেন।

শীতল ঠাকুর হাত জোর করে মৌড়েশ্বরের কাছে বললেন— হে প্রভু! তুমি কতো মহান! তুমি কতো দয়ালু, তুমি কতো প্রেমময়! সামান্য এক জীবের আহ্বানে সাড়া দিয়েও তুমি মনস্কামনা পূর্ণ করো।

ঐরাবত হাতী ভগবানের রূপ জানতো না। নাম জানতো না। তবুও সে যখন ভয়ংকর কুমীরের কবলে পড়ে কুমীরের বিশাল মুখ গহ্বরে পা দু-টুকরো হয়ে যাবার উপক্রম হলো তখন —শুধু রক্ষা করো, রক্ষা করো বলেই প্রার্থনা জানিয়েছিলো।

পরম কৃপালু ভগবান শ্রী হরি ঐরাবতের প্রার্থনায় সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই ভীষণ কুমীরের মস্তক ছেদন করে ঐরাবতকে রক্ষা করলেন। ঐরাবত সেই অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে সরোবর থেকে পদ্ম ফুল তুলে এনে অর্ঘ নিবেদন করলো।

ভক্ত ধ্রুব মনের দুঃখের কথা মার কাছে জানালে মা ধ্রুবকে সর্বদা নারায়ণের নাম স্মরণ করতে বলতেন। তিনি ধ্রুবকে বুঝিয়েছিলেন একমাত্র নারায়াণই ধ্রুবের সকল কামনা বাসনা পূরণ করে মনে শান্তি দিতে পারেন।

পাঁচ বছরের ধ্রুবের মনে মায়ের কথায় যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো সে বিশ্বাসের জোরেই পাঁচ বছরের শিশু একাকী জঙ্গলে চলে গিয়েছিলো নারায়ণের খোঁজে

মা বলে দিয়েছেন নারায়ণকে জঙ্গলে খোঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু নারায়ণ দেখতে কেমন, কী তার রূপ সে কথা বালক ধ্রুব জিজ্ঞেস করেনি। তাই বনে বন্য পশু যাদের দেখতে পেয়েছে তাদেরই গলা জড়িয়ে ধ্রুবে বলেছে— তুমি কি নারায়ণ?

ধ্রুবের মনে নারায়ণকে পাওয়ার যেমন আকুলতা ছিলো তেমনি ছিলো সরল বিশ্বাস। তার মনে জাগেনি হিংসা ও দ্বেষ। তাই এই বালকের স্পর্শে বনের হিংস্র পশুরা তার স্পর্শে অহিংস হয়ে উঠেছিলো।

পদ্মাবতীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো মৌড়েশ্বর ইচ্ছে করলেই তাকে একটি সু-সন্তান দান করতে পারেন। অচলাভক্তির জোরেই পদ্মাবতী মৌড়েশ্বরের মন্দিরে এসে ধর্ণা দিয়েছিলেন।

ভগবান ভক্তের সঙ্গে কত ভাবেই না লীলা করেন। পদ্মাবতী যিনি দ্বাপরে রোহিনী ছিলেন, ত্রেতা যুগে সুমিত্রা ছিলেন তিনিই কলিতে পদ্মাবতী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন ভগবানের অংশ রূপে যিনি ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে জীব উদ্ধারের ভার নেবেন তাকে গর্ভে ধারন করতে।

সত্য যুগের কৃচ্ছ সাধনার ফলেই ভগবান শ্রীহরি এক অংশে চারি অংশ হয়ে দশরথের ঔরসে, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কলিকালে অসুরেরা মায়া বলে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের মায়ার প্রভাবে মোহান্ধ জীব ঈশ্বরকে ভুলে, সত্যকে ভুলে, অহিংসাকে ভুলে মারামারি কাটাকাটিতে মত্ত রয়েছে।

ছলাকলায় কলির মতো দক্ষতা কোন যুগেই বোধ হয় দৈত্যরা দেখাতে পারেনি। কলিকালে ধর্মের দোহাই দিয়ে, ধর্মের নাম করে চলছে অধর্মের ব্যবসা।

সত্যযুগে বামন অবতারে বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু দানশীল সত্যনিষ্ঠ বলি রাজাকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করার মানসে স্বর্গের দৈত্যরাজ বলির সভায় গিয়ে হাজির হলে সভায় উপস্থিত শুক্রাচার্য বামনরূপী ভগবান বিষ্ণুকে চিনতে পারলেন।

দৈত্যরাজ বলিও ছিলেন পরম ভাগবত। তিনিও ভগবান বিষ্ণুকে চিনতে পারলেন। কিন্তু, ভগবান স্বয়ং বলিরাজের কাছে ভিক্ষা চাইতে আসতে পারেন এ কল্পনা বলেই বলির মনে হতে লাগলো।

ভগবান বামন যখন বলিরাজের কাছে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করলেন তখন শুক্রাচার্য বামনরূপী বিষ্ণুর চাতুরী বুঝতে পেরে বলিরাজের কমণ্ডলুর নালের ভেতর পোকার রূপ ধারণ করে লুকিয়ে রইলেন।

ত্রিপাদ ভূমির অর্থ বলিরাজ বুঝতে না পেরে বামনের প্রার্থনা অনুযায়ী আচমন করে দান করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু, কমণ্ডলুর নালে শুক্রাচার্য বসে থাকায় জল পড়ছেনা। বামন বলিরাজকে একটা কুশ দিয়ে বললেন— এই কুশের দ্বারা কমণ্ডলুর নালের মুখ পরিস্কার করে নিতে

ভগবান বিষ্ণুর মায়ায় মোহিত সর্বদর্শী অপরিসীম ক্ষমতাশালী এবং অতিশয় সদাচারী বলিরাজ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কুশ দিয়ে নালে খোঁচা দেওয়াতে পোকারূপী শুক্রাচার্যের একটি চক্ষু কানা হয়ে যায়। চক্ষু হারিয়ে ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য স্বমূর্তি ধারণ করে বামনরূপী ভগবান বিষ্ণুকে বললেন— হে বিষ্ণু তুমি সত্বগুণের আধার হয়েও ছলনার আশ্রয় নিয়ে বলিকে ঠকিয়ে ঘোর অন্যায় করেছো। তুমি যেমন স্বয়ং ভগবান হয়েও বলিকে ঠকিয়েছ ঠিক তেমনি তোমার নাম নিয়ে তোমার ভক্তদের কলিকালে ঠকানো হবে।

ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করে বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু এক পদে স্বর্গ, এক পদে মর্ত দখল করে তৃতীয় পদ কোথায় রাখবেন এই কথা জানালে দানশীল এবং ভক্ত বলি নিজের মাথায় শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম রাখতে প্রার্থনা জানালেন।

ভগবান বিষ্ণু, তৃতীয় পদ বলির মাথায় রেখে বললেন— ভক্তবর, তুমি স্বর্গ ছেড়ে পাতালে গমন করো। তুমি আমার ভক্ত, তাই তোমাকে আমি কখনো পরিত্যাগ করবো না। পাতালে অংশরূপে আমি তোমার রাজ্যে অবস্থান করবো।

কলিকালে মানুষের মনে বিশ্বাসের একান্ত অভাব। ভগবান আছে কি নেই আজ এই নিয়ে সর্বত্র সংশয় দেখা দিয়েছে। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে এখন হয় ইসলামের ধ্বজা উড়ছে নয়তো মানুষ ধর্ম কর্ম ছেড়ে একেবারেই অধার্মিক হয়ে পড়েছে।

গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায় কিছু স্বার্থান্বয়ী অমাত্যের কথায় বিশ্বস্ত কর্মচারী হুসেন শাহকে তহবিল তছরূপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে প্রকাশ্য রাজ দরবারে উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী হুসেন শাহের পিঠে চাবুক মেরে যে অপমান করে ছিলেন পরবর্ত্তী কালে সুবুদ্ধি রায়কে তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিলো।

যে সমস্ত কর্মচারী সুবুদ্ধি রায়কে হুসেন শাহের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন, কৌশলে হুসেন শাহকে চোর বানিয়ে ছিলেন তারাই আবার হুসেন শাহের বিশ্বস্ত হতে প্রাণপন প্রয়াস চালিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্ম ভারত সহ পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে প্রসার লাভ করেছিলো। সম্রাট অশোক যেভাবে বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন অন্য কোন ভারতীয় হিন্দু রাজা হিন্দুধর্মের জন্য তেমনটি করেননি।

দশম শতাব্দীতে ভারতে ইসলামের জয় যাত্রা শুরু হবার পর থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগেও তাদের বিজয় অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ভগবান শঙ্করাচার্য লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে না আনলে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা হাতে গোনা যেতো।

চাকুরী, খ্যাতি, প্রতিপত্তির লোভে গৌড়ের সর্বত্রই কাজীর মন জয় করতে এক শ্রেণীর হিন্দু প্রাণপণ প্রয়াস চালাচ্ছে

ধর্মকে রাজনীতির আবর্তে না আনলে হয়তো হিন্দু মুসল-

মানের মধ্যে লড়াই চলতো না। কিন্তু, এক শ্রেণীর প্রভাবশালী হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে ক্ষমতা ভোগ করতে বদ্ধপরিকর। তাই ভারতের কোথাও এখন আর শান্তি নেই। প্রায় প্রতিনিয়তই কোন না কোন অঞ্চলে হিন্দু কিংবা মুসলমানের রক্তে মাটি ভিজছে।

কোন মৌলভী কিংবা কোন ব্রাহ্মণ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে বুঝানোর জন্য এগিয়ে আসছে না। বলছে না যে, মানুষ অমৃতের সন্তান, ঈশ্বরের সন্তান, আল্লার সন্তান, ভগবানের সন্তান।

ধর্মের গৌরব নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ শক্তি প্রকাশে সচেষ্ট হয় বলেই সংঘর্ষ বাঁধে। সকল ধর্মগুরুই যদি সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করতেন যে, মন্দির, মসজিদ, মঠে ঈশ্বর বা আল্লা বিরাজ করেন না। মানুষের অন্তরেই ঈশ্বর কিংবা আল্লার আসন তাহলেই সাধারণ মানুষের মন থেকে ধর্ম বিদ্বেষ দূর হতো।

মানুষের হৃদয়ই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন বলে প্রত্যেক মানুষেরই উচিত এই হৃদয় সিংহাসন সর্বদা সুন্দর ও পবিত্র রাখা।

কল্কিকে কলিকালে রাজত্ব করার অধিকার ভগবান দিলেও ভগবানের যারা একনিষ্ঠ ভক্ত তাদের রক্ষা করতে এবং জীবকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতেই যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

সুদর্শন চক্রের আকৃতি নিয়ে যে সূর্য্যের সোনালী রশ্মি মৌড়েশ্বরের মন্দিরে এগিয়ে এসে শবাসনে শুয়ে থাকা পদ্মাবতীর পেটে মিলিয়ে গেলো তা যে আগামী দিনের ধার্মিক ও অধার্মিক উভয় মানুষের কল্যাণের বার্ত্তা নিয়ে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শীতল ঠাকুর মৌড়েশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় হে প্রভু,

যদি সত্যিই তোমার আবির্ভাব ঘটে থাকে, সত্যিই যদি তুমি ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হয়ে থাকো তাহলে এমন কোন প্রমাণ দেখাও যাতে আমার অবিশ্বাসী মন বিশ্বাসে ভরে উঠে।

শীতল ঠাকুরের কথা শেষ হতে না হতেই শীতল ঠাকুরের মনে হলো। মন্দিরটা যেন একবার দোলে উঠলো এবং মন্দিরের চূড়ায় যেন মেঘ গর্জনের মতো একবার গর্জন হলো।

গর্জনের শব্দে ভয় পেয়ে উঠে বসে পদ্মাবতী। তার সারা শরীরে প্রচণ্ড কাঁপুনি ধরেছে। মৃগী রোগীর মতোই শরীর কাঁপতে থাকায় বসেও বসে থাকতে পারলেন না পদ্মাবতী। আবার পড়ে গেলেন।

শীতল ঠাকুর বুঝতে পারলেন পদ্মাবতীর শরীরে যে শক্তির প্রবেশ ঘটেছে সে শক্তির প্রভাবে পদ্মাবতীর এই অবস্থা। তিনি পদ্মাবতীকে দুহাত ধরে তুলে নিজের ঘরে খাটের উপর শুইয়ে দিয়ে বললেন—মা, তোমার কোন ভয় নেই। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মধ্যে এক দিব্য শক্তির উদয় হয়েছে। এই শক্তি একদিন মানুষের শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে এবং অশুভ বুদ্ধির বিনাশ করতে সক্ষম হবে। তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর খুশী মনে ঘরে যেও তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই মোড়েশ্বর পূর্ণ করবেন।

পদ্মাবতী এখন দু সন্তানের জননী। কুবের যখন মন্দিরের পাশ দিয়ে গ্রামের ইন্দ্র, মনা, জয়ন্ত এদের সঙ্গে চলে তখন তাদের চলার পথে কোন কোন দিন চেয়ে থাকেন শীতল ঠাকুর।

শীতল ঠাকুর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেদিন মোড়েশ্বর মন্দিরে স্বয়ং আসবেন সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করবেন।

সূর্য দর্শনের পর পদ্মাবতী কুবেরকে মন্দিরে নিয়ে এসেছিলেন। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের শিশুটিকে দেখে দেখে আর সাধ

মিট্ ছিল না শীতল ঠাকুরের। যে মুখ দেখে ত্রেতা ও দ্বাপরে কোটি কোটি মানুষ পাগল হয়েছে সে মুখ দেখে তিনি মুগ্ধ হবেন না কেন ?

ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন দুর্বাদলশ্যাম। লক্ষণ ছিলেন গৌরবর্ণ। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন শ্যামবর্ণ, বলরাম ছিলেন গৌরবর্ণ।

ত্রেতা যুগে লক্ষণ দেখেছেন তার গৌররূপের প্রতি যত লোক আকৃষ্ট হয়েছে তার চেয়ে শতগুণ লোক বেশী আকৃষ্ট হয়েছে শ্রীরাম চন্দ্রের দুর্বাদল শ্যাম রূপে। লক্ষণ দেখেছেন রাবন ভগিণী সূর্পনখাই শুধু শ্রীরাম চন্দ্রের রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শ্রীরামকে পতি রূপে পাওয়ার জন্য কামনা করেন নি। বনে যত মুনি ঋষি এবং ঋষি পত্নিগণ ছিলেন সকলেই শ্রীরাম চন্দ্রকে পতি রূপে পাওয়ার বাসনা করেছিলেন।

শ্রীরাম চন্দ্রের রূপের প্রতি সকল জীবের অনির্বার আকর্ষণ দেখে লক্ষণের মনে বাসনা জাগতো হায়, এমন রূপ যদি আমার হতো !

দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম রূপে আকর্ষণে যখন সারা ব্রজভূমি আন্দোলিত তখনও গৌর বর্ণ বলরামের মনে হতো শ্যামরূপে যখন মানুষের এত আকর্ষণ তা হলে এই শ্যাম রূপ যদি আমার হতো !

ত্রেতা যুগে লক্ষণ শ্রীরাম চন্দ্রের যে সেবা করেছেন সেই সেবার ঋণ মুক্ত হতে ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র লক্ষণকে বলেছিলেন ভাই লক্ষণ, তুমি এই জনমে আমার যে সেবা করেছো তার ঋণ আমি যুগে যুগেও শোধ করতে পারবো না। তাই আগামী জনমে তুমি আমার অগ্রজরূপে জন্ম গ্রহণ করো। তোমার সেবা করে আমি ঋণের বোঝা কিছুটা লাঘব করবো।

শ্রীরাম চন্দ্রের ইচ্ছায় পর জনমে লক্ষণ বলরামরূপে জনম

গ্রহণ করেন। লক্ষণ ও বলরামের শ্যামরূপের প্রতি আকর্ষণ হেতু কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের এবং বলরামের ভাবকান্তি নিয়েই কুবের জন্মগ্রহণ করেন। কুবেরের জন্মে যে সারা একচক্রা নগরী আনন্দ মুখর হয়ে উঠবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে!

কুবের ভাই সকল সমবয়সীদের যেমন নয়নের মণি তেমনি পাড়া পড়শীদেরও নয়নের মণি। জ্ঞানের দ্বারা আবৃত হারাধন মায়া মুক্ত হতে চাইলেও যশোদার মতো মাতৃ ভাবে আপ্লুত পদ্মাবতী স্বামীর আদর্শকে প্রাণহীন জীবন বলে মনে করেন।

কুবের আপন মনে গুণ গুণ করে অনুচ্চস্বরে গান গাইতে গাইতে যখন জোর পুকুরের মাঝামাঝি রাস্তায় এসেছে তখন হঠাৎ দেখতে পেলো রাস্তার দুপাশে পুকুর পাড়ের শতাধিক তাল গাছ থেকে হনুমান দল বেঁধে নামতে শুরু করেছে।

এই অঞ্চলে হনুমান কেন বানরও নেই। কুবের শ্যামলীর মা'র কাছে রামায়ণের কাহিনী শুনেছে। রামায়ণে হনুমানের কথা লেখা আছে। শ্রীরাম চন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সুগ্রীব নিজ বড় ভাই বালীকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করানোর ঘটনা শুনে বালক কুবেরের মন শ্রীরামের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে। পরম বীর শ্রীরাম চন্দ্রের চরিত্রে এ যেন চাঁদের কলঙ্কের মতোই ছোট্ট একটি কলঙ্ক!

বালীর কপট হত্যার খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন পতিব্রতা তারা। বালী যখন এক পরাক্রমশালী দানবকে শাস্তি দিতে পাতালে দানবের পিছু পিছু প্রবেশ করেছিলেন তখন ভ্রাতৃ বৎসল ছোট ভাই সুগ্রীবকে সুড়ঙ্গের দ্বার রক্ষকরূপে নিযুক্ত করে যান।

সুগ্রীব দীর্ঘকাল ভ্রাতার জন্য এই সুড়ঙ্গের মুখে অনাহার ও অনিদ্রায় পাহাড়া দেবার পর একদিন দেখতে পেলো সুড়ঙ্গ পথে রক্তের ধারা উপরে উঠে আসছে।

সুগ্রীবের মনে হলো মহাশক্তিধর বালী নিশ্চয়ই দানবের হাতে নিহত হয়েছেন। এখন ঐ দৈত্য হয়তো তাকেও মেরে

ফেলতে পারে। এই আশংকা করে ভীত সুগ্রীব সুড়ঙ্গের মুখে বিশাল এক পাথর চাপা দিয়ে রাজ্যে ফিরে আসেন।

রাজ্যে ফিরে ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ জানানোর পর মন্ত্রীদের পরামর্শে সুগ্রীব রাজ সিংহাসনে আরোহন করেন এবং প্রথা অনুসারেই বালীর পত্নী সুন্দরী তারাকে রাণীর মর্যাদা দিয়ে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

কিছুকাল পর বালী অতি কষ্টে সুড়ঙ্গের পথ থেকে পাথর সরিয়ে রাজ্যে ফিরে এসে প্রিয় ভ্রাতা সুগ্রীবকে রাজ সিংহাসনে বসতে দেখে এবং তা'র'কে বিয়ে করার সংবাদে এতই ক্রুদ্ধ হয় যে সুগ্রীবকে হত্যা করতে ছুটে যায়।

সুগ্রীব ভুল স্বীকার করে দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় উদ্‌গ্রীব ছিলো। কিন্তু, সুগ্রীব যেমন নিজের ভুল স্বীকার করার সুযোগ পায়নি বালীও নিজ ভ্রাতাকে তার এহেন নীচ কাজ করার কৈফিয়তের সুযোগ দেয়নি। ফলে দুই ভাই এর মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় তার পরিণতিতেই বালীর মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুর প্রাক্ মুহুর্তে বালী নিজ পুত্র অঙ্গদকে বাঁচাতেই কাকা সুগ্রীবের অনুগত হয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অঙ্গদ পিতার নির্দেশ পালন করে সুগ্রীবের অনুগত হয়েই জীবন যাপন করেছে। কিন্তু, রামচন্দ্রের কাপুরুষতাকে ক্ষমা করতে পারেনি।

লঙ্কেশ্বর রাবনকে বধ করার পর শ্রীরামচন্দ্র সভায় সকল বানর সেনাপতিদেরই পুরস্কৃত করেছিলেন। সুগ্রীবকে বলেছিলেন — মিত্র, তুমি আমার যে উপকার করেছো তার প্রতিদান স্বরূপ আগামী জন্মে আমি যখন কৃষ্ণ অবতাররূপে জনম গ্রহণ করবো তখন তোমায় আমার মাথায় চূড়া বানাবো। হনুমানকে বললেন ভক্ত হনুমান, তুমি যে অসাধ্য সাধন করেছ এবং ভক্তির যে উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছো তার জন্য আগামী জনমে তোমায় আমার বাঁশী বানাবো।

বিভীষণকে বললেন, মিত্র তুমি আমার যে উপকার করেছ তার জন্য আগামী জনমে তোমাকে আমার অঙ্গের ভূষণ বানাবো।

তারপর অঙ্গদকে ডেকে বললেন, অঙ্গদ, আমি জানি তোমার মন থেকে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা এখনো দূর হয়নি তাই আগামী জনমে আমি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে জন্মালে তুমি ধর্ম ব্যাধ নামে জনম গ্রহণ করবে। তোমার তীরের আঘাতেই আমার মৃত্যু হবে।

দ্বাপর যুগে যদুবংশ ধ্বংসের পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন একদিন একাকী নির্জন বনে এক গাছের ডালে বসেছিলেন তখন পাতার ফাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পদ্মের পাপড়ীর মতো পা দুটোর পাতা দেখে পাখী মনে করে ধর্ম ব্যাধ যে তীর নিক্ষেপ করেন তাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করেন।

বালীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য পতিব্রতা তারা ছুটে এসে বললেন শ্রীরাম, শুনেছি তুমি নাকি নারায়ণের অবতার তুমি সত্ব গুণের আধার হয়েও অধার্মিকের ন্যায় কাজ করেছো। তোমায় আমি অভিশাপ দিচ্ছি, যদি আমি পতিব্রতা হয়ে থাকি তাহলে তুমি তোমার স্ত্রীকে পেয়েও আবার হারাবে। আমি যেমন স্বামীর শোকে কান্না করছি তুমিও স্ত্রীর বিরহে অন্তরে জ্বলে পুড়ে মরবে!

কুবের মাঝে মাঝেই রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা স্মরণ করে আনমনা হয়ে যায়। ভুলে যায় বর্তমানকে। মা, বাবা, পাড়া-পড়শী সকলেই ভাবে কুবেরের মতো বোকা ছেলে এই একচক্রানগরে আর দ্বিতীয়টি নেই।

কুবেরের মনে আছে রামায়ণের হনুমান কর্তৃক লংকা দহনের কথা। রাবন রাজা হনুমানকে বসার আসন না দেওয়ায় হনুমান নিজ ল্যাজকে বিশাল করে কুণ্ডলি পাকিয়ে রাজ সিংহাসনের মতো উঁচু করে রাবনের সম উচ্চতায় বসলে রাবন ক্রোধে

আত্মহারা হয়ে হনুমানের বিশাল ল্যাজে কাপড় বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিতে আদেশ করেন।

রাবনের অনুচরেরা হনুমানের ল্যাজে কাপড় বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিলে হনুমান এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী করে সমস্ত লংকাপুরী জ্বালিয়ে দেয়। তারপর ল্যাজের আগুন নেভাতে সমুদ্রে ল্যাজ ডুবিয়ে রাখাতেও যখন ল্যাজের আগুন নিভছেনা তখন শঙ্কিত হনুমান সীতা দেবীর কাছে এসে আগুন নেভানোর উপায় জিজ্ঞাসা করলে সীতা দেবী বললেন বাছা, তুমি তোমার ল্যাজটা মুখে পুড়ে দাও তাতেই ল্যাজের আগুন নিভে যাবে।

ল্যাজ মুখে পুরে দেওয়া'য় ল্যাজের আগুন নিভলো ঠিকই কিন্তু, হনুমানের মুখটা পুড়ে কালো হয়ে গেলো। জলে মুখের ছায়া দেখে বিষন্ন হনুমান সীতা দেবীকে বললো মা, এই পূড়া মুখ আমি কি করে দেখাবো ? আমার মৃত্যুই ভালো।

সীতা দেবী হনুমানকে শান্তনা দিয়ে বললেন বাছা হনুমান, তোমার সঙ্গীরা এবং দেশের বানরেরা সকলেই মুখ পোড়া হয়ে যাবে।

সীতা দেবীর কথায় সত্যিই সকলের মুখই কালো হয়ে গিয়ে ছিলো। ফলে কে হনুমান আর কে অঙ্গদ, শত্রুরা [illegible] সম্পর্কে ভাবনায় পড়তো।

বালক কুবের দেখলো চুদিক থেকে শ'খানেক হনুমান তাল গাছ থেকে নেমে কুবেরের দিকে এগিয়ে আসছে। কুবেরের মনে ভয়ের পরিবর্তে আনন্দই দেখা দিলো,। ভাবলো এর মধ্যে নিশ্চয়ই রাম ভক্ত হনুমানও রয়েছে। কিন্তু, হনুমানকে সে চিনবে কেমন করে ?

কুবের শ্যামলীর মার কাছে শুনেছে হনুমানদের রাম নাম শুনালে খুব খুশী হয়। তাই সে হাত জোর করে জোরে বলে উঠলো— জয় শ্রী রাম।

কুবেরের মুখে শ্রীরাম ধ্বনি শুনে সকল হনুমান হাত জোর করে কিচির মিচির করে কয়েক মুহূর্ত কি যেন বললো। হনুমানদের এই আচরনে কুবের বেশ আনন্দ পেলো।

কুবের বললো— ভাই সব, তোমাদের মধ্যে কে বীর ভক্ত হনুমান আমি তো জানিনা,। হনুমান যদি স্বয়ং আমার কাছে আসে তা হলে তার সঙ্গে একটু কোলা—কোলি করি।

কুবেরের কথা শুনে একটি বিশালকায় হনুমান কুবেরের দিকে এগিয়ে এলো। কুবের বুঝতে পারলো এই হচ্ছে বীর ভক্ত হনুমান। হনুমান এগিয়ে এলে কুবের দু-হাতে হনুমানকে জড়িয়ে ধরে বলতে শুরু করলো জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম।

হনুমানটি আকারে বালক কুবেরের চেয়েও অনেক বড় প্রায় একজন যুবকের আকৃতি। হনুমানের বুকে মাথা রেখে কুবের নিশ্চিন্তে হনুমানকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত বলতে থাকলো জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম,। আর হনুমানটিও বাবা যেমন স্নেহের বাঁধনে ছেলেকে আবদ্ধ করে রাখেন ঠিক সে ভাবেই তাকে আবদ্ধ করে রেখেছেন।

কয়েক মুহূর্ত হনুমানের সঙ্গে আলিঙ্গন করে কুবের বললো ভাই হনুমান, অঙ্গদ কোথায়? অঙ্গদ আমার শ্রী কৃষ্ণকে তীর বিদ্ধ করে শ্রীঅঙ্গে কতইনা ব্যাথা দিয়েছে। ভক্তের হাতের আঘাত শ্রী কৃষ্ণের প্রাণে তীরের আঘাতের চেয়েও বেশী ব্যাথা দিয়ে ছিলো। তাই শ্রী কৃষ্ণ মর্ত্ত লীলা সাঙ্গ করে চলে গেছেন। তিনি তো অর্জুনকে নিজ মুখে বলেছেন ভক্তের আহ্বানে তিনি বার বারই পৃথিবীতে আসবেন। তিনি সত্যিই আসবেন?

কুবেরের কথার উত্তরে হনুমান এক মুহূর্ত মিটি মিটি করে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। যার অর্থ হ্যাঁ। কুবের খুশী হলো।

কুবের হনুমানকে বললো — শ্যামলীর মার কাছে শুনেছি তুমি নাকি লাফ দিয়ে সমুদ্র পাড় হয়ে গিয়েছিলে। অনেকে

বলে এসব নাকি গল্প। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। তবুও তুমি যদি উত্তর দিকের পুকুরটা এক লাফে পাড় হয়ে আর এক লাফে আসতে পারো তা হলে হয়তো আমার বিশ্বাস আরও শক্ত হবে।

কুবেরের কথা শেষ হতে না হতেই হনুমান পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে লাফ দিলো। কুবেরে মনে মনে শ্রী রাম চন্দ্রের নাম স্মরণ করে বললো হে রাম, আমার বিশ্বাস যেন নষ্ট না হয়।

কুবেরের বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো এত বড় দীঘিটা হনুমান অনায়াসে পাড় হয়ে গেছে। আবার লাফ দিয়ে এ পাড়ে ফিরেও আসছে।

হনুমান ফিরে এলে কুবের তাকে জড়িয়ে ধরে বললো ভাই, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি রাগ করনি তো ?

হনুমান লক্ষণের মাথায় একবার চুমু খেলো। তারপর কুবেরের পা ছোয়ে নমস্কার করলো। কুবের হনুমানের হাত দুটো ধরে জিভ্ কেটে বললো হনুমান, তুমি কত বড় ভক্ত! তুমি আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অপরাধী করো না। মা বলেন নিজের গুণ না থাকলে অন্যের কাছ থেকে প্রণাম নিতে নেই।

কুবের বললো – হনুমান, তোমার সাগর পাড়ি দেওয়ায় ঘটনা তো দেখলাম। লব-কুশ দুজন বালক তোমাদের কেমন ভাবে পরাজিত করেছিলো তা দেখতে ইচেছ করছে। চলো আমরা দু-দলে ভাগ হয়ে কিছু ক্ষণ খেলা করি।

হনুমানের দল কুবেরের কথা শুনে দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। কুবের বললো তোমরা আমার কথা বুঝতে পারো, আম তোমাদের কথা বুঝতে পারিনা,। খেলা কেমন করে জমবে ?

হনুমানের দল মিটি মিটি হাসছে কুবেরের কথা শুনে। কুবের রাগ করে বললো বুঝেছি, তোমরা আমার মতো কথাও

বলতে পারো কিন্তু আমার সঙ্গে বলবেনা। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে অনেক পশু এবং জন্তুও মানুষের ভাষা বলতে পারতো। কিন্তু কলিযুগে মানুষ পশুর ভাষা বুঝেনা, পশু মানুষের ভাষা বুঝেনা।

হনুমান এবার দিব্যি মানুষের মতো স্বরে বললো তুমি ঠিকই বলছো কুবের ভাই। আজকাল মানুষের মন কুটিলতায় ভরে গেছে। মনে মানুষের অনিষ্ট চিন্তা করলে, পশুর অনিষ্ট চিন্তা করলে মানুষের সুন্দর ভাব নষ্ট হয়ে যায়। তোমার মন সুন্দর, ভাব সুন্দর, ভবিষ্যত সুন্দর তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। প্রত্যেকে জীবের ভেতরেই ভগবান রয়েছেন। যুগে যুগে ভগবান মানুষকে বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে তাই দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু, মানুষ ভগবানের লীলা স্মরণ করতে চায়না। কলির প্রভাবে মানুষ আজ নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করে না।

কুবের বললো—তোমরা কত দূর থেকে এসেছো, আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের বাড়ী চলো তোমাদের আজ ভোজন করাবো। আমাদের বাড়ী না খেয়ে আজ যেতে পারবে না।

হনুমান বললো ওরে বাবা! আমরা সবাই চুপি চুপি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তোমাদের বাড়ী গেলে আমাদের সঙ্গে মানুষের ঝগড়া বেঁধে যাবে।

বসন্ত কাল। বহু গাছ মেড়া হয়ে গেছে। কোন গাছের ডালে নূতন কিশলয় গজাতে শুরু করেছে। সজনে গাছ গুলোকে দেখলে মনে হয় মৃত গাছ পতনের জন্ত অপেক্ষামান। আম গাছ পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীতেই নেড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে চির সবুজের মেলা বসিয়ে রেখেছে।

কয়েক দিন আগেও বাড়ী বাড়ী ছেলেদের কুল তলায় ভীড় দেখা যেতো। কুলগাছ গুলোও যেন সজনে গাছের মতোই মৃত গাছের মেলা বসিয়েছে। বৃষ্টির ফোটা পড়লেই

সজনে ও কুলগাছে নূতন কিশলয় দেখা দেবে। ক্ষেতের নেড়া ধান গাছ গুলোর পাশে কচি কচি সবুজ ঘাস গজিয়েছে। গরুর পাল মুক্তির আনন্দে সারা মাঠ চড়ে বেড়াচ্ছে। দু-একটা বেল গাছে বেল পাকতে শুরু করেছে। কিছুদিন পরই শিব চতুর্দশী। শিব পূজোয় বেল অপরিহার্য সামগ্রী। বেলকে শুদ্ধ ভাষায় শ্রীফল বলে।

সত্যযুগের কথা। ভগবান বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে সুবর্ণ পালঙে বিশ্রাম করছেন আর লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের পদসেবা করছেন। সেবা করতে করতে লক্ষ্মীদেবী ভাবছেন তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাগ্যবতী কারণ অষ্ট প্রহরই তিনি ভগবান বিষ্ণুর সেবা করবার সুযোগ পাচ্ছেন। ভগবান বিষ্ণুও নিশ্চয়ই তাকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন।

ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীর অন্তরের কথার সূত্র ধরেই বললেন—লক্ষ্মী, আমায় যারা সেবা করে তাদের চেয়েও আমি ওদের অনেক বেশী ভালোবাসি যারা আমার প্রিয় ভক্তের সেবা করেন।

লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সেবকদের মধ্যে সকলের উপরে থাকতে চান। নারায়ণের সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকতে চান। তাতে যদি নারায়ণের কোন ভক্তের সেবা করতে হয় তাতেও তিনি রাজী। তাই নারায়ণকে জিজ্ঞেস করলেন— প্রভু, পৃথিবীতে তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? আমি তার পদসেবা করে তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন হতে চাই।

নারায়ণ লক্ষ্মীর কথা শুনে বললেন— ত্রিজগতে মহাদেবই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তুমি যদি তাকে সেবায় সন্তুষ্ট করতে পারো তাহলে সত্যি সত্যিই তুমি আমার প্রাণাধিকা হবে।

লক্ষ্মীদেবী তখন পুস্কর তীর্থে দেবাদিদেব শংকরের উপাসনা করতে শুরু করলেন। দেবাদিদেব শংকর লক্ষ্মীদেবীর তপস্যায়

বিস্মিত এবং মুগ্ধ হলেন। তিনি ভাবলেন হয়তো লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের মন জয় করতেই তার ভজনা করছেন। সত্যিকারের প্রাণের টান আছে কিনা তিনি তা পরীক্ষা করার জন্যই লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন না দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একবৎসর লক্ষ্মীদেবী মহাদেবের তপস্যা করার পর ভাবলেন তিনি নিশ্চয়ই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে, গভীর বিশ্বাস নিয়ে মহাদেবকে ডাকতে পারেন নি। না হলে যিনি আশুতোষ নামে জগতে পরিচিত তিনি এত নিষ্ঠুর হতে পারতেন না।

তিনি ভাবলেন নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো স্তন। আজ তিনি তার দুটো স্তন কেটে শিবের পূজোয় ভোগ নিবেদন করবেন।

লক্ষ্মীদেবী একটি স্তন কেটে ভোগের থালায় রেখে আর একটি স্তন কাটতে উদ্যত হতেই মহাদেব দেবীর হাত ধরে বললেন— দেবী, আমি আপনার সেবায় অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। আপনি মহাশক্তি হয়েও কেন আমার সাধনা করছেন বলুন। ভগবান বিষ্ণু যার পতি তার অপূরণীয় কিছূ আছে বলে আমার জানা নেই। আপনার এমন কি অভাব রয়েছে আমার কাছে দয়া করে প্রকাশ করুন।

লক্ষ্মীদেবী বললেন – ভক্তশ্রেষ্ঠ, আমার অভাব কিছুই নেই। আমি চাই নারায়ণ আমায় প্রাণাধিকা রূপেই ভালোবাসেন। সেবায় সুযোগ দিন। আপনি ত্রিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ভক্ত, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন যাতে নারায়ণ আমায় সর্বদাই ভালোবাসেন, কাছে রাখেন

মহাদেব বললেন-- দেবী, বিষ্ণু মায়ার আমরা কতটুকু বুঝি। দুর্বাশা ঋষির অভিশাপে আপনি স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করেছিলেন। সমুদ্র মন্থন করার প্রধান কারণও ছিলেন আপনি। আপনাকে ফিরে পেতে, অমৃত সংগ্রহ করতে ভগবান বিষ্ণু সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

চিরকাল আমি যোগ সাধনায় মগ্ন থাকি। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু যখন মোহিনী রূপ ধারণ করে দেবগণের মধ্যে অমৃত বিতরণ করছিলেন তখন মাত্র দৈত্যগণই মোহিত হয়নি আমিও মোহিত হয়ে কাম জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছিলাম। সুতরাং বিষ্ণু মায়া বুঝার সাধ্য আমারও নেই। তার মায়ায় মোহিত হয়ে পরমাশক্তি হয়েও আপনি আমার সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। যে মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত করতে পারে তার কি কখনো ভৃত্যকে ভজনা করার প্রয়োজন হয়? আপনি বৈকুণ্ঠে ফিরে যান। আমি ভগবান বিষ্ণুর প্রতি প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি যেন কখনো আপনাকে তার সেবা থেকে বঞ্চিত না করেন।

আপনার স্তনের পবিত্র স্পর্শ পেয়েছে ধরা দেবী। এই স্পর্শ কখনো বিফলে যেতে পারে না। ঐ দেখুন এই স্পর্শ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এক বৃক্ষের। তাতে ফলও ধরে রয়েছে। যার আকৃতি অনেকটা স্তনের মতো। এই ফল জগতে শ্রীফল বা বিল্বফল নামে পরিচিত হবে। এই গাছের পাতা ব্যাতীত কোন পূজাই সার্থক হবে না। ঐ ফল দিয়ে আজকের মতো ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে যারা আমার পূজো করবে আমার বরে তাদের মনবাসনা পূর্ণ হবে।

চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী। নবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিলো। হারাধনের বাড়ীতে প্রতি বছরই রাম নবমী তিথি পালিত হয়। বসন্ত চৌধুরী জীবিত না থাকলেও তার সুযোগ্য পুত্র জয়ন্ত পিতার মৃত্যুর পরও বাসন্তী পূজো চালু রেখেছে। বাসন্তী পূজোয় অষ্টমী দিন জমিদার বাড়ীতে পশুবলি দেওয়া হয় এবং গ্রামের সকলকে খিচুরি খাওয়ানো হয়।

দ্বাপর যুগের কথা। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রতিদিন কাঙ্গাল ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিদিন শত শত কাঙ্গাল দুপুরে ভোজন করছেন।

হনুমান শুনলেন শ্রীকৃষ্ণের কাঙ্গাল ভোজনের কথা। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্যই ব্রাহ্মণের ছদ্ম বেশে কাঙ্গাল ভোজনের স্থানে এসে হাজির হলেন

তখনো দুপুর হয়নি। ছদ্মবেশী হনুমান পাচকদের বললেন— ভাই, আমি কয়েক দিনের উপবাসী। আমাকে এক্ষুণি খাবার না দিলে হয়তো প্রাণ বের হয়ে যাবে। তোমাদের শ্রীকৃষ্ণের তা হলে খুব দুর্নাম হবে।

পাচকরা ভাবলেন— এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কতটুকই বা খাবে। তারা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভোজনে বসালেন।

ক্রমে সমস্ত রান্না করা খাবার দিলেন। পিছু ফিরতে না ফিরতেই ছদ্মবেশী হনুমান সব খেয়ে ফেলেন। তারপর বলতে থাকেন আরো খাবার আনো। তার বৃদ্ধের কথা শুনে পরিবেশন কারীগণ চাল ডাল এনে দিতে দিতে সমস্ত চাল ডালই শেষ হয়ে গেলো। উদ্যোক্তাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সব খবর জানালেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব জানতে পেরে লক্ষ্মী দেবীকে এর ব্যবস্থা করতে বললেন। লক্ষ্মীদেবী রান্না শালায় এসে প্রবেশ করা মাত্র আবার অন্ন ব্যাঞ্জন সহ রান্নার সব পাত্র ভর্তি হয়ে গেলো। পরিবেশনকারিগণ তিন প্রহর বেলা পর্য্যন্ত পরিবেশন করতে লাগলেন। কিন্তু, তাতেও বৃদ্ধের পেট ভরলো না। এদিকে হাজার হাজার কাঙ্গাল খাবারের জন্য অপেক্ষা করছেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে হনুমামকে দর্শন দিয়ে তৃপ্ত করলেন এবং হনুমানও অন্য সব কাঙ্গালদের কথা ভেবে ভোজন শেষ করলেন।

কুবের হনুমানকে জিজ্ঞেস করলো ভাই, দ্বাপর যুগের কাঙ্গাল ভোজনের মতো কাজ করানো যেন। হনুমান হাসলো।

কুবের বাড়ীতে ফিরে এলে পদ্মাবতী কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললেন কুবের, কতবার বললাম বাড়ী থেকে এখন আর বের হবিনা। আমার কথা তো একদম শুনলি না। হাত মুখ না

ধুয়ে, মুখে কিছু না দিয়েই চলে গেলি। আয় বাবা স্নান করে চারটে খেয়ে নে।

কুবের বললো মা, আমার একটা কথা রাখবে তো? যদি আমার কথা না রাখো তা হলে স্নানও করবো না, ভাতও খাবো না।

পদ্মাবতী ছেলের এমন অদ্ভুত কথা শুনে ছেলের মুখের দিকে এক পলক তাকালেন। পদ্মাবতীও এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছেন যে তার এই ছেলে সাধারণ ছেলের চেয়ে অনেকটা ব্যাতিক্রম। কুবেরের জন্মের আগে যে সব জমি বন্ধা ছিলো এখন সে সব জমিতে ভালো ফসল ফলছে। যে গাই বাচ্চা দিতো না সে গাইও বাচ্চা দিয়েছে। মৌড়েশ্বরের অপরিসীম কৃপা আছে কুবেরের উপর। এ কথা পদ্মাবতী ষোল আনা বিশ্বাস করেন।

কুবের মা'র নিরবতা দেখে চঞ্চল হয়ে বার বার বলতে লাগলো — বলো না মা আমার কথা রাখবে?

পদ্মাবতী বললেন — বাবা, যদি তোমার কথা রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব না হয় তা অবশ্যই রাখবো। বলো তোমার খুলে কথা।

কুবের মায়ের আঁচলে নিজের হাত দুটো ঢেকে বললো— মা, আমি জানি তোমারা আমার কথা রাখবে। আমি হনুমানজীকে নিমন্ত্রণ করেছি। আগামী রামনবমীর দিন দুপুর বেলায় আমাদের এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে।

হনুমানজী একশো আট সঙ্গী নিয়ে আমাদের বাড়ীতে দুপুরে প্রসাদ পেতে আসবে।

—হনুমান! হনুমান কোথায় দেখলে বাছা! এখানে তো একটা বানরও এত বছরে দেখা যায়নি। তুমি কি কাল রাতে স্বপ্‌ন দেখেছিলে?

— না মা, স্বপ্‌ন দেখিনি। এইতো, এই মাত্র হনুমানজী

এবং তার দল — বলের সঙ্গে জোর পুকুরের পাড় খেলা করে এলাম। হনুমানজী লাফ দিয়ে বড় পুকুরটা পাড় হয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলো সে ত্রেতাযুগে সাগর পার হয়ে লংকায় সীতার সন্ধানে গিয়ে ছিলো।

পদ্মাবতী বললেন বাবা, তুমি আগে স্নান করে ভাত খাও তারপর তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবো

— না মা, আগে আমার কথার জবাব দাও। ওরা কিন্তু ঠিক সময়ে এসে হাজির হবে। তোমরা যদি ওদের অসম্মান করো তা হলে আমায় হারাবে।

পদ্মাবতী মনে মনে শিউরে উঠেন। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলেন বালাই ষাট্। আমি তোমার বাবাকে বলে তোমার হনুমানজীর ভোজনের ব্যবস্থা করবো।

হারাধন আজ মোটামোটি অবসর। কোন ছাত্র আজ আর ন্যায় শাস্ত্রের পাঠ নিতে তার কাছে আসেনি। একটু আগে গরু ঘরে গিয়ে লালীকে যে খাবার দেওয়া হয়েছে তা তদারকি করছিলেন। হারাধন গোয়াল ঘরের কাজ সেরে বাইরে এসে মা ছেলেকে এক জায়গায় কথা বলতে দেখে স্ত্রীকে বললেন — কি গো কুবেরের মা, ছেলেটার স্নান খাওয়ার ব্যবস্থা করো। বেলা হয়েছে।

কুবের বললো — মা, তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করো না হনুমানজীকে খাওয়াবে কি না?

— বলবো বাবা। তুমি চলো। তৈল মেখে স্নান সেরে আসবে। তোমার কথা তোমার বাবা নিশ্চয়ই রাখবেন।

— বাবা যদি আমার কথা না রাখেন তা হলে আমি হনুমানজীর সঙ্গে অজানা স্থানে চলে যাবো।

জগন্নাথও মাকে এসে জড়িয়ে ধরেছে। সে মায়ের কোলে উঠলো। মা জগন্নাথকে কোলে করে কুবেরের হাত ধরে রান্না

ঘরের সামনে গিয়ে শ্যামলীর মাকে ডেকে বললেন— শ্যামলীর মা, তৈলের পাত্রটা এনে কুবেরের গায়ে-মাথায় তৈল মেখে দাও। ওর ক্ষিধে পেয়েছে।

কুবেরের খাওয়ার পর ছেলেকে নিয়ে বিছানায় গেলেন পদ্মাবতী। বললেন— বাবা কুবের, তোমার ভক্ত প্রহ্লাদের গল্প বলবো এখন। গল্প শুনতে শুনতে একটু ঘুমিয়ে নাও। তারপর একটু খেলা করে এসো।

— তুমি গল্প শুরু করো। আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বো। বাবা দুপুরে খেতে বসলে আমার কথাটা বলতে ভুলে যেওনা যেন।

— না বাবা।

পদ্মাবতী বললেন বাবা, প্রহ্লাদ শিশুকাল থেকেই ছিলো বিষ্ণু ভক্ত। প্রহ্লাদ মার কাছে শুনে ছিলো ত্রিজগতে নারায়ণের চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই।

প্রহ্লাদ জানে তার বাবা ত্রিভুবনের অধিশ্বর। ব্রহ্মার বরে তার বাবা হিরন্যকশিপু প্রায় অমরত্বের অধিকারী। হিরন্যকশিপু অমর বর ব্রহ্মার কাছ থেকে না পেলেও এমন বর পেয়েছিলেন যাকে প্রায় অমর বলা যেতে পারে।

হিরন্যকশিপু বলেছিলেন ব্রহ্মা আপনি আমায় এমন বর দিন যে মানুষও নয় পশুও নয় এমন কোন জীব যদি স্থলে জলে অন্তরিক্ষের বাইরে আমাকে বধ করতে উদ্যত হয় তাহলেই বধ করতে পারবে।

পিতার এহেন ক্ষমতার কথা জানা থাকায় প্রহ্লাদ তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মা নারায়ণ কি আমার বাবার চেয়েও শক্তিমান ?

প্রহ্লাদের কথা শুনে তার মা উত্তর করেছিলেন হ্যাঁ বাবা। তিনি সর্ব শক্তিমান। তিনি সর্বভুতে বিরাজমান। এবং সকলের মঙ্গলকারী। তোমার বাবা ব্রহ্মার বলে বলীয়ান হয়ে অহংকার

বশতঃ ভগবান বিষ্ণুকে অস্বীকার করছে। অ মাননা করছে। অপমান করছে। তুমি তোমার পিতার আদেশ না শুনে মনে মনে নারায়ণকেই ভজনা করো। তোমার কল্যাণ হবে।

প্রহ্লাদের কথা শুনতে শুনতে ঘুমে কুবেরের চোখ ছোট হয়ে আসছে। তবুও ক্ষণে ক্ষণে চোখ মেলে মাকে জিজ্ঞেস করছে— তারপর কি হলো মা ?

পদ্মাবতী বলতে লাগলেন হিরণ্যকশিপু যখন শুনলেন তার ছেলে শুধু নারায়ণের নাম জপ্ করছে। অন্য কোন বিদ্যা শিক্ষা করছে না তখন ছেলের মন থেকে নারায়ণের নাম দূর করতে রাজ প্রাসাদ থেকে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। গুরুপুত্রকে ছেলের শিক্ষার ভার দিলেন। গুরু-পুত্রকে অনুরোধ করলেন ছেলেকে এমন শিক্ষা দিতে যাতে ছেলের মন বিষ্ণু বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

প্রহ্লাদ কি বিষ্ণু বিদ্বেষী হয়ে পড়ে ছিলেন ?

— না। তিনি তো অন্তর্যামী। তিনি জানেন প্রহ্লাদের জন্ম হয়েছে শুভ ক্ষণে। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য তাই তার মধ্যে বিষ্ণু ভক্তির ভাবকে আরো বেশী জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

হিরণ্যকশিপু যখন জানতে পারলেন পুত্র প্রহলাদ গুরু গৃহে গিয়েও পড়াশুনা না করে শুধু বিষ্ণু নাম জপ্ করছে তখন বাড়ী এসে রাগ করে নিজ পুত্রকে হত্যা করার জন্য একে একে সাপের বিষ খাওয়ালেন। ফুটন্ত তৈলে নিক্ষেপ করলেন। হাতীর পায়ের নীচে ফেলতে আদেশ দিলেন। তারপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সর্বত্রই প্রহলাদ ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় রক্ষা পেলেন। তারপর প্রহলাদকে জিজ্ঞেস করলেন — তোর নারায়ণ কোথায় আছে বল আমি তাকে হত্যা করবো।

প্রহলাদ বললেন— মা বলেছেন নারায়ণ সর্বত্রই আছেন। তার কৃপাতেই সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি।

হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞেস করলেন ঐ স্ফটিক স্তম্ভের ভেতর তোর নারায়ণ আছে? প্রহলাদ বললেন— হ্যাঁ। হিরণ্যকশিপু রেগে লাথি মেরে স্ফটিক স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেললেন। প্রচণ্ড গর্জন করে নৃসিংহ রূপ পরিগ্রহ করে ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে নিজ হাঁটুর উপর রেখে বুক চিড়ে হত্যা করলেন।

পদ্মাবতী গল্প বলে দেখেন ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বামী পুজো সেরে খাবারের জন্য বসে আছেন। পদ্মাবতী তাড়া তাড়ি রান্না ঘরে ছুটে গেলেন স্বামীকে খাবার দিতে।

বসন্তের শেষ বলে বেশ গরম পড়েছে। পদ্মাবতী স্বামীকে খাবার দিয়ে তাল পাতার একটা পাখা দিয়ে স্বামীকে বাতাস করে গরমের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন।

স্বামীর খাওয়া হয়ে গেলে পদ্মাবতী স্বামীর দুপুরের বিশ্রামের আয়োজন করে দিয়ে হুকায় তামাক সেজে এগিয়ে দিয়ে বললেন —শুনছো, তোমার ছেলে কুবের আমায় এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেছে। আমি তো এটুকুন ছেলের এরকম আচরণ দেখে বিস্ময়ে একে বারে থ' বনে গেছি। এ তল্লাটে হনুমান কেন বানরও নেই। কিন্তু, তোমার ছেলে বলেছে আজই পাঠশালা থেকে ফিরে এসে জোর পুকুর দিয়ে যাবার সময় হনুমান ও তার সঙ্গীদের দেখা পেয়ে ছিলো। তাদের নাকি আগামী রামনবমীতে আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন করে এসেছে। বলেছে যদি হনুমানদের ভোজনের ব্যবস্থা না করা হয় তা হলে সে বাড়ী থেকে হনুমানদের সঙ্গে পালিয়ে যাবে।

হারাধন জানে কুবের শুভ সংস্কার দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। অলৌকিক ঘটনা তার জীবনে ঘটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাই হারাধন বললেন— এই এলাকায় হনুমান কিংবা বানর দেখা যায় না বটে কিন্তু এক ক্রোশ দূরেই তো বন রয়েছে। সেখানে বানর কিংবা হনুমান নিশ্চয়ই আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা

কুবের কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারে না। সাধারণ হনুমান হলে মানুষের ভাষায় কথাও বলতো না। এত বড় দীঘি পারাপার হয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সত্যতা পরীক্ষা দেবারও প্রয়োজন হতো না। কুবের সত্যি কথাই বলেছে তিনি নিশ্চয়ই স্বয়ং হনুমান। আমি তাদের আহারের ব্যবস্থা করবো। জমিদার জয়ন্তবাবুর কাছেও কথাটা জানাতে হয়। জমিদারবাবুও পিতা বসন্ত চৌধুরীর মতোই দেবদ্বিজে ভক্তিমান। তিনিও বামন ভোজনে কিছু সহায়তা করতে পারেন।

জমিদারবাবুর বড় ছেলে গৌরের নবাবের এক হাজারী মনসবদার হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছেন। ছোট ছেলে জয়ন্ত পিতার জমিদারী দেখাশুনা করছেন। তিনিই এখন গ্রামের মানুষের কাছে জমিদার রূপে পরিচিত।

বাসন্তি পূজো ধুম ধামের সঙ্গেই বেশ কয়েক বছর ধরে জমিদার বাড়ীতে চলে আসছে। পুজোর তিন দিন রাত্রিতে বিভিন্ন পালা কীর্ত্তণ এবং নাচের জলসা বসানো হয়। পালা কীর্ত্তন শেষ হলে রাত দ্বিতীয় প্রহর থেকে জমিদার বাড়ীর নাচ মহলে নাচের আসর বসে। এই তিন দিন নাচের আসর সকলের জন্যই খোলা থাকে। গ্রামের সাধারণ কৃষক যেমন বাঈজীর নাচ দেখতে মধ্য রাতে জমিদার বাবুর নাচ মহলে হাজির হয় তেমনি রেশমী পর্দার আড়াল থেকে জমিদার বাড়ীর অন্দর মহলের অনেক মহিলাও বাঈজীর নাচ দেখতে এসে দোতলার বারান্দায় বসেন।

এলাহাবাদের বাঈজী সুন্দরী বাঈ গত দু-বছর ধরেই একচক্রা গ্রামের জয়ন্ত চৌধুরীর বাড়ীতে গান গাইতে আসে। একচক্রা গ্রামেও এক জন বাঈজী আছে। সেও দেখতে সুন্দরী এবং খুব ভালো নাচে। এলাহাবাদের সুন্দরী বাঈজীর সঙ্গে সেও গত বছর নাচের আসরে যোগ দিয়েছিলো।

হারাধন ঠিক করেছে সামান্য সময় বিশ্রাম করে বিকেলে জমিদার বাবুর কাছারি বাড়ীতে গিয়ে বানর ভোজনের আমন্ত্রন জানিয়ে আসবেন সে সময় যদি জমিদারবাবু কোন সাহায্যের আশ্বাস দেন তাহলে ভালই না হলে নিজেই খাদ্য সামগ্রী যোগারের জন্য তৎপর হবে।

একশত আটজন বানর ছাড়াও মানুষ হবে প্রায় দু-তিনশো, । চারশো লোকের রান্নার সামগ্রীর যোগার তাকেই করতে হবে। নিবারণদাও যদি কিছুটা সাহায্য করেন তাহলে তার পরিশ্রম কিছুটা কম হবে।

হারাধন ধুতি পরেন। একটা জামা গায়ে দিয়ে পাতলা একটা চাদর কাঁধে চড়িয়ে পান মুখে দিয়ে জমিদার বাবুর বাড়ী যাত্রা করলেন।

বিকেল বেলায় জমিদার বাবুর বাড়ীতে প্রজাদের উপস্থিতি খুব কমই থাকে। দুপুরের খাবার সেরে, বিশ্রাম নিয়ে কয়েকজন বয়স্ক নিয়ে, দেওয়ান সহ কাছারি বাড়ীতে বসে গল্প করার মাঝে হিসেব পত্র এবং প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেন জমিনার বাবু।

হারাধন কাছারী বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলে জয়ন্ত চৌধুরী সহ সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে হারাধনকে প্রণাম জানালেন। জয়ন্ত বাবু বললেন ঠাকুর মশায় এসেছেন ভালোই হলো। এবারও তো মা বাসন্তীদেবীর পূজোর সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। আপনি রামনবমী পালন করেন বলে পূজোয় আপনাকে তিনদিন কোন বছরই পাওয়া যায় না। এবার কৃপা করে আপনিও পূজোর তিনদিন আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের আনন্দ দান করুন।

হারাধন বললেন - জমিদার মশায়, মায়ের পূজোর তিনদিন থাকতে পারলে আমিও খুব আনন্দ পেতাম। আমাদের শাস্ত্র

বলেছে শয়ন উত্থান, পার্শ্ব ও ভৈমি এই চারটি একাদশী, রামনবমী, শিব চতুর্দশী, কৃষ্ণের জন্মষ্টামী এবং রাধার জন্মাষ্টমী সকলকে অবশ্যই পালন করা কর্তব্য এতদিন রামনবমীতে নির্জলা উপবাস করছি। কিন্তু, আমার শ্রীমান কুবের একশত আটজন হনুমানকে রামনবমীর দিন নেমতন্ন করে এসেছে। রামনবমী এবার তাই বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে পালনের ব্যবস্থা করা হলেও এবার আর নির্জলা উপবাস থাকবো না। হয়তো রামচন্দ্রই কোন কারণে তার জন্মদিনে জীবকে উপবাসী না রাখতে মনস্থ করেছেন। জন্মদিনে উপবাসী না থাকাই ভালো। তিরোধান দিবসে শোক পালন করা হয় আর জন্মদিনে আনন্দ করা হয়। শ্রীরামচন্দ্র তাই লীলাচ্ছলে তার জন্মদিন ভূরি ভোজনের মাধ্যমে পালন করার ইঙ্গিত দিলেন। আমি আপনার কাছে এসেছি রাম নবমীতে আমার বাড়ীতে বানর ভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছরই আমার বাড়ীতে রামনবমী উপলক্ষ্যে কীর্ত্তন, পাঠ ইত্যাদি চলে। এবার বানর ভোজনের আয়োজন করা হওয়ায় গ্রামের কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তিও আমার বাড়ীতে প্রসাদ পাবেন। আমার ইচ্ছে এবার আপনিও আমাদের বাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ করুন।

জয়ন্তও জানে কুবেরের জন্মের পর থেকে তাদের জমিদারীর অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। বাবা স্বয়ং তার সূর্যদর্শনে হাজির থেকে খাবার দাবারের সব খরচই বহন করেছেন। শুধু তাই নয় ব্যবস্থাপনার তদারকিও করেছেন। কিন্তু, তাই বলে ঐ বালকের সঙ্গে হনুমানের আলাপ হবে আর বালকের আহ্বানে হনুমানরা এসে প্রসাদ গ্রহণ করবে এ কথা মেনে নেওয়া ছেলে মানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়।

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন— পণ্ডিত মশায়, আমার মনে হয় না আপনার বাড়ীতে হনুমানেরা দল বেধে

ভোজনে আসবে। তবুও আপনার অগাধ বিশ্বাসের ফলে ভগবান মৌড়েশ্বর হয়তো আপনার বাড়ীতে কোন অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করতেও পারেন। আপনি বানর ভোজনের আয়োজন করুন। আমি দুশো মানুষের ভোজনের খরচ বহন করবো। দুশো লোকের খায় খরচা বাবদ যেসব খাদ্য সামগ্রীর প্রয়োজন হবে অষ্টমী তিথিতে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

— আমি জানি আপনি আপনার পিতার মতই দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধাশীল। আপনি এবারের উৎসবে থাকবেন তো ?

সারা দিন তো থাকা সম্ভব হবে না। আপনি যখন বলেছেন তখন বেলা দ্বিপ্রহরে আপনার বাড়ী যাবো এবং তৃতীয় প্রহরে ফিরে আসবো। চিন্তিত হবেন না, আপনার বাড়ীতে বানরগণ না আসলে আমার এলাকার প্রজাগণ সানন্দে আপনার বাড়ী গিয়ে প্রসাদ খেয়ে আসবে।

— আপনার কথায় মনে অনেক সাহস পেলাম। আমার বিশ্বাস আছে শ্রীরাম নিশ্চয়ই তার জন্ম তিথিতে তার ভক্তদের পাঠিয়ে আমাকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবেন। আমি চলি।

— সপ্তমি দিন পূজোর আগেই একবার এসে দর্শন দিয়ে যাবেন এবং পূজো যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবেন।

— সেতো একশো বার। ভগবান ভক্তকে কখনো ইচ্ছে করে বিপদে ফেলেন না।

বানর ভোজনের কথা পাড়ার যে শুনে সেই অবাক হয়। এ হেন অদ্ভুত ভোজনের ব্যবস্থায় মানুষের কৌতুহল যেন তুঙ্গে উঠেছে। জন্মের পর থেকে যারা এখানে বৃদ্ধ হয়েছেন তারাও এই গ্রামে কখনো হনুমান দেখেন নি। একশো আট জন হনুমান এসে যদি সত্যি সত্যিই হারাধনের বাড়ীতে প্রসাদ

গ্রহণ করে তা হলে বলতে হবে মহাত্মাগণই বানরের বেশ ধারণ করে প্রসাদ গ্রহণ করতে এসেছেন।

গ্রামের অনেক বাড়ী থেকেই বানর ভোজনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ এলো। ভোর হতে না হতেই হারাধন স্নান করে জগন্নাথের পুজোয় বসলেন। জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা জানালেন—প্রভু, তুমি তোমার সম্মান রক্ষা করো। আমি কিছুই জানি না একটি বালকের মাধ্যমে যে লীলার অবতারণা করতে যাচ্ছো তার পুরো দায়িত্ব তোমার।

হারাধনের বাড়ীর পশ্চিম দিকে রয়েছে জমিদার বাবুর দেওয়া নিষ্কর ধানের জমি। জমিতে এখন কোন ফসল নেই। শীতে ধানের ক্ষেতে ফাটল দেখা দিয়েছে। এক পশলা বৃষ্টি হলেই হা করা মাটি আবার জোড়া লাগবে। ক্ষেতেই কীর্তন চলছে। ক্ষেতের এক পাশে পাঁচটি উনোনে রান্নার কাজ চলছে।

রাধুনি, পরিবেশনকারী এবং স্বেচ্ছাসেবী সবাই সতঃস্ফুর্ত হয়ে ভোর হতে না হতেই কাজে নেমেছে। তারাও আজ সেই অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হতে চায়। যারা নেমন্তন্ন পায়নি তারাও নেমন্তন্তের অপেক্ষা না করে হারাধনের বাড়ী এসে হাজির হয়েছে।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের আগেই রান্না শেষ হয়ে গেছে। গৃহ দেবতা জগন্নাথ এবং শ্রীরাম চন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভোগ লাগানো হয়েছে। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে কতটুকু পর পরই কীর্তনীয়াগণ মুখর হয়ে উঠছেন। কীর্তনীয়াদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও সজোরে বলে উঠলেন জয় শ্রীরাম।

জমিদার জয়ন্ত চৌধুরী সেবক পাঠিয়ে হারাধনের এই মহান কাজে সহায়তা করছেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বন্ধুদের নিয়ে জমিদার বাবু এসে দেখেন তার জমিদারীর হাজার দু এক লোক এখানে এসে জমা হয়েছে। অথচ তিনি মাত্র দুশো লোকের ব্যবস্থা করেছেন।

জনগণ দেখে জমিদার দেওয়ানকে বললেন — দেওয়ান মশায়, সকলেই যাতে প্রসাদ পায় এই ব্যবস্থা করুন। এখানে কেউ প্রসাদ না পেয়ে গেলে সেটা আমার পক্ষেই লজ্জার কারণ হবে। মানব ভোজনের ব্যাপারটা আমিই গ্রহণ করেছি।

উৎসুক জনতার ভীর মাঝে মাঝেই চারদিকে চেয়ে দেখছিলো সত্যি সত্যিই রাম ভক্তরা আসেন কিনা। অনেকেই বেলা দ্বিপ্রহর হয়ে যাবার পর বলাবলি করতে শুরু করলো ছেলের কথায় হারাই পণ্ডিতের এই বিরাট ব্যবস্থার আয়োজন করা উচিৎ হয় নি। মাঝে জমিদার বাবুরও বেশ টাকা নষ্ট হলো।

জনরব হারাই পণ্ডিতই শুধু নয়, জমিদার জয়ন্ত চৌধুরীর কাছেও পৌঁছলো। জয়ন্ত চৌধুরী পাশে বসা গ্রামের মোড়লদের বললেন — আপনারা আমার টাকার অপচয়ের কথা বলছেন কেন ? আপনাদের দেওয়া খাজনার টাকাতেই ভোজ হচ্ছে আপনারাই প্রসাদ পাবেন। রাম ভক্তরা না এলেও কুবেরের কথাকে কেন্দ্র করে যে এতবড় উৎসবের আয়োজন হলো তা তো সামান্য ব্যাপার নয়। আমার হনুমান দেখান কৌতুহল আছে বটে কিন্তু হনুমানের দল না এলেও আমার বিন্দু মাত্র মন কষ্ট হবে না। একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাতেই আমি খুশী।

জনার্দন পণ্ডিত বললেন — জমিদার মশায় কুবেরের কথা মিথ্যে হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি সেদিন আমার গোপাল মন্দিরে মানস চক্ষে দেখতে পেয়েছি গোপাল থেকে দুজন বালক বের হয়েছে। একটি গৌরবর্ণ অপূর্ব মুখশ্রী রূপে ঘর আলোকিত করেছে। আর একজন শ্যাম এবং রাধার মিলিত রূপে যে রূপ হয় সেই রূপের একটি বালক। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম দ্বিতীয় বালকটি আর কেউ নয়, আমাদের কুবের। আমি ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে বসে রইলাম।

জমিদার বাবু কুবেরকে কাছে ডেকে নিলেন। ফরাসের উপর নিজের কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বাবা, তোমার হনুমানজী সত্যি, সত্যিই আসবেন তো ?

কুবের জমিদারের কথা শুনে কয়েক মুহুতে চুপ করে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো বেলা কত প্রহর হলো ?

বাকী আছে দুপুর হবে একদণ্ড।

—তা হলে এক দণ্ড পরেই তারা আসবেন। আমি জানি হনুমানজী কখনো মিথ্যে কথা বলেন না।

হারাধনকে উদ্দেশ্য করে বললো— বাবা, পুকুর থেকে বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় গোবর ছটা দিতে বলুন। তারা যেখানে খাবে সেই স্থানও পরিস্কার করে গোবর ছটা দিতে বলুন। খাবার দিতে গিয়ে কেউ কৌতুহলী হয়ে তাদের যেন স্পর্শ না করেন। আপনি এমন লোকদেরই পরিবেশন করতে নিযুক্ত করুন যারা হনুমানদের সঙ্গে কোন রসিকতায় মত্ত হবে না।

জমিদার বাবু জনার্দন পণ্ডিতকে বললেন— পণ্ডিত মশায়, খাবার পরিবেশনের সময় ভোজনের স্থানে আমি স্বয়ং দাঁড়িয়ে তদারকি করবো। আপনি আমায় সহায়তা করবেন। আমি উপস্থিত থাকলে কেঁউ কোন রসিকতার সাহস পাবেনা আর হারাই পণ্ডিত রন্ধন শালার কাছে দাঁড়িয়ে পরিবেশনকারীদের সহায়তা করবেন। যদি সত্যি সত্যিই তারা আসেন তাহলে তাদের খাবারের পরই আমাদের সকলের ভোজনের ব্যবস্থা হবে। আপনিতো ব্রাহ্মণ সমাজের পুরোধা আপনি কি বলেন ?

-- আপনি ঠিক্ কথাই বলছেন। রাম ভক্তরা এলে সকলের মনোযোগ ওদের প্রতি থাকবে, ব্রাহ্মণদেরও থাকবে। তারাও হনুমান ভোজনের মতো অলৌকিক ব্যাপার দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখতে চাই না।

কীর্ত্তণীয়াগণ মুহুর্মুহু জয় রাম ধ্বনি দিতে লাগলো। অনেকে

সমস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো – রাম ভক্তরা দল বেঁধে আসছেন।

কুবের আগেই রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলো। সে সকলের আগে আসা হনুমানকে হাত জোর করে প্রমাণ জানিয়ে বললো— জয় শ্রীরাম. হনুমান ও তার প্রতি নমস্কার জানালো।

জমিদার, হারাই পণ্ডিত, জনার্দন ঠাকুর বাচস্পতি মশায় সহ গ্রামের গন্যমান্য ব্যাক্তিগন হাত জোর করে স্বাগত জানালেন হনুমানদের।

জমিদার তাদের উদ্দেশ্যে বললেন – আপনারা দয়া করে এসেছেন দেখে আমি এবং আমার গ্রামের সকলেই আনন্দিত। আপনারা অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসুন। আপনাদের ভোজনের জন্য সকলেই অপেক্ষা করছেন। আপনাদের ভোজন শেষে আমরা প্রসাদ পাবো। আসুন।

জমিদার বাবু হাত জোর করে তাদের এগিয়ে নিয়ে গেলেন ভোজন স্থানের দিকে। আগে থেকেই একশো আটটি আসন পাতা ছিলো। একশো আটটি মাটির গ্লাসে জল দেওয়া ছিলো।

হনুমানরা দু সারিতে এক শো আটজন বসলো। গ্লাসের জল দিয়ে মানুষের মতোই হাত ধোয়ে নিলো। ঘন ঘন আওয়াজ তুলে কীর্ত্তনীয়াগণ শ্রীরাম ধ্বনি দিতে লাগলো। হারাই পণ্ডিত রান্নাঘরের সামনে দাড়িয়ে একটার পর একটা সামগ্রী পরিবেশনকারীদের পরিবেশনের জন্য দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

মানুষের চেয়েও অনেক দ্রুত খাবার শেষ করলো হনুমানেরা। তাদের জন্য যেখানে আচমানের জল রাখা হয়েছিলো তারা সেখানে গেলো না। সকলেই নিজেদের উচ্ছিষ্ট পাতা ভাজ করে হাতে তুলে নিলো।

জমিদার বাবু বললেন – রাম ভক্তগণ, আপনারা আমাদের সম্মানিত অতিথি। উচ্চিষ্ট নিজ হাতে তুলে নিয়ে আমা-

দের লজ্জা দেবেন না। আপনারা দয়া করে সেগুলি যথাস্থানে রেখে দিলে আমরা খুশী হবো। নয় তো মনে ব্যাথা পাবো।

জমিদারের কথা শুনে হনুমানের দল আবার এঠো পাতা যথাস্থানে রেখে দিলো। একটা বড় পাত্রে জমিদার স্বয়ং সে গুলো তুলে দিলেন। বাহকেরা নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে আসলো।

জমিদার বাবু জিজ্ঞেস করলেন —আপনারা মুখশুদ্ধি করবেন তো ? আপনাদের জন্য পান-সুপারী রাখা হয়েছে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো নিয়ে নিন।

হনুমান ঈশারা করে কুবেরকে ডাকলো কুবের কাছে যেতেই বললো— আমাদের একটা করে পাকা হরিতকী দিতে বলো।

ব্রাহ্মণ বাড়ীতে হরিতকী বারো মাসই পাওয়া যায় ভোজন উপলক্ষে অনেক হরিতকী এনে রাখা হয়েছে। কুবের একটা ডালায় করে হরিতকী তাদের সামনে রাখতে প্রত্যেকেই একটা করে হরিতকী তুলে নিলো। তারপর কুবেরকে বললো আমরা এবার চলি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে জোর পুকুরের পাড় আসবো। আমাদের পিছু নিতে লোকজনের নিষেধ করে দাও।

মৌড়েশ্বর মন্দিরের পুরোহিত শীতল ঠাকুরকে হারাধন দুদিন অনুরোধ করে এসেছেন রাম নবমীতে তাদের বাড়ী আসার জন্য। কিন্তু, শীতল ঠাকুর রাজী হননি। তার এক কথা যেদিন ঠাকুর নিজে এই মন্দিরে এসে পূজা পাবেন তারপর থেকে তিনি অন্যত্র ভোজনে অংশ নেবেন।

হারাই পণ্ডিতের বাড়ীতে বানর ভোজনের ব্যাপারে গ্রামের সকল মানুষ হাজির হয়েছিলো। জমিদার বাবু দরাজ হস্তে তাদের ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয় প্রত্যেক

ব্রাহ্মণকে একটি করে রূপার টাকাও ভোজন দক্ষিণা হিসেবে দান করলেন। উপস্থিত সকলেই এক বাক্যে বলতে লাগলো — এমন অলৌকিক ব্যাপার কেউ জীবনেও দেখে নি। কুবের সামান্য ছেলে নয়। সে যে রামের অংশ রূপে জন্মগ্রহণ করেছে এমন কথা অনেকে বলাবলি করতে লাগলো।

কুবের এখন মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিয়ে হাজির হয় জোর পুকুরের পাড়ে। উচ্চ স্বরে ডাকে রাম ভক্ত হনুমান, তুমি এসো, আমরা তোমার সঙ্গে খেলা করবো।

কুবের তিন চারবার ডাকলে সকলেই দেখতে পায় তালগাছের উপর থেকে হনুমানেরা নেমে আসে। তাদের সঙ্গে সকল ছেলেরা মিলে রামলীলা অভিনয় করে। ইন্দ্র, চন্দ্র, জয়ন্ত মনা সকলেই বালক কুবেরের কথায় কেউ সাজে রাম, কেউ সীতা। কেউ রাবন। আর কেউ মেঘনাদ। হনুমানের অভিনয় হনুমান স্বয়ংই করে থাকেন। একদিন রাবন রূপী ইন্দ্রকে হনুমান অজান্তে এমন একটা ঘুষি মারলো যে ইন্দ্র একেবারে অচেতন হয়ে পড়লো।

কুবের বিচলিত হয়ে বললো ভাই হনুমান, ইন্দ্র মরে যায়নি তো! সে তো মায়ের একমাত্র ছেলে। তা হলে তোমার কলঙ্ক হবে।

হনুবান মৃদু হেসে বললো — একটু জল পুকুর থেকে এনে ওর চোখে দাও। আমি একটা ফল ওর হাতে দেবো। বাড়ী গিয়ে মা — বাবার কাছে যেন ওর অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা না বলে। রাম লীলা অভিনয় করতে করতে হঠাৎ যেন ত্রেতা যুগে ফিরে গিয়েছিলাম। তখন খেয়াল ছিল না একটা বালকের সঙ্গে আমি অভিনয় করছি মাত্র।

কুবের পুকুর থেকে জল এনে চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতেই ইন্দ্রের জ্ঞান ফিরলো। হনুমান তাকে আদর করে বললো — ভাই ব্যাথা পেয়েছো? এই ফলটা খেয়ে নাও, তোমার খুব ভালো লাগবে। আমার ছোট্ট একটা ঘুষি তুমি সহ্য করতে

পারলে না? ছিঃ ছিঃ! বাড়ীতে নিশ্চয়ই তোমায় দুধ ভাত দেওয়া হয় না। আজ থেকে দু-বেলা দুধ ভাত খাবে। ইন্দ্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

জনার্দন পণ্ডিত পাঠশালা শেষ করে গোপালের ভোগ লাগিয়ে হারাধন পণ্ডিতের বাড়ী এসেছেন। হারাধন পণ্ডিত সবে মাত্র গায়ে তৈল মেখে স্নানে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। জনার্দন পণ্ডিতকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। কাঠের একটা চেয়ার জনার্দন পণ্ডিতকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পণ্ডিত মশায়— বাড়ীর সব কুশল তো? আমার কুবের ঠিক মতো পাঠ দিচ্ছে তো?

— কুবেরকে আমার যা বিদ্যে ছিলো সব শিখিয়ে দিয়েছি।

— বলেন কি! এক বছরেই ব্যাকরণ শাস্ত্র শেষ হয়ে গেলো?

— কী করবো পণ্ডিত মশায়। অন্য ছেলেরা যে পাঠ এক সপ্তাহ সময় নেয় আপনার ছেলে কুবের সে পাঠ এক দণ্ডেই শেষ করে ফেলে। আপনি তো ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত আপনি বরং ন্যায় শাস্ত্র সম্পর্কে আপনার কুবেরকে কিছুকাল শিক্ষা দিন।

জনার্দন ঠাকুর এসেছেন দেখে পদ্মাবতী শ্যামলীর মাকে পাঠালেন এক ঘটি জল দিয়ে।

শ্যামলীর মা ঘটিটা রেখে মাথার ঘুমটা একটু টেনে বললো— পণ্ডিত মশায়, মা ঠাক্‌রুণ বলেছেন আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিতে। আমাদের ঠাকুর মশায় এই ফাঁকে পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে ফিরে আসবেন। দুজনে মিলে আজ এখানে প্রসাদ পাবেন।

শ্যামলীর মার কথা শুনে হারাই পণ্ডিত বললেন— পণ্ডিত মশায়, ভালোই হলো। কলা গাছের থুর দিয়ে আজ কুবেরের মা মোচা রান্না করেছে। সরষে দিয়ে কলার থুরের মোচা

আমার খুবই প্রিয়। আশা করি আপনারও ভালো লাগবে। আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।

— আপনার যখন ইচ্ছে হয়েছে একে গোপালের ইচ্ছেই ধরে নিচ্ছি। গোপালের ভোগ লাগিয়ে না এলে হয়তো আপনার বাড়ীতে প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হতো না। আপনি আবার ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত।

— কি যে বলেন পণ্ডিত মশায়! আপনি পড়াশুনা করে পণ্ডিত হয়েছেন আর আমি বাবার মুখে শুনে বা কিছু শিখতে পেরেছি তাই ছাত্রদের শেখাচ্ছি। এখন আপশোষ হয়। সে সময় যদি ভালো করে শিখতাম তা হলে হয়তো ন্যায় শাস্ত্র পড়তে গ্রামের ছেলেদের মিথিলায় যেতে হতো না।
বাসুদেব সার্বভৌম তো মিথিলা থেকে ন্যায় শাস্ত্র মুখস্ত করে ফিরে এসে একটা গ্রন্থ লিখেছেন। তার একটা নকলও এখন রয়েছে নবদ্বীপে। আশা করি ন্যায় শাস্ত্রের জন্য ভবিষ্যতে নবদ্বীপ থেকে আর কাউকে মিথিলায় যেতে হবে না।

—আপনি তামাক সেবা করুন আমি আসছি।

হারাই পণ্ডিত স্নান সেরে জগন্নাথ দেবের সামনে অন্ন ভোগ নিবেদন করলেন। তার পর হারাই পণ্ডিতকে নিয়ে বড় ঘরে খেতে বসলেন। শ্যামলীর মা পরিবেশনের ভার নিলো আর পদ্মাবতী দুজনের মাঝ খানে বসে তালপাতার পাখা দিয়ে দুজনের গায়ে বাতাস দিয়ে গরমের হাত থেকে উভয়কে রক্ষা করলেন।

কুবের পাঠশালা থেকে ফিরে এসে খেলতে গিয়ে ছিলো। বাড়ী এসে জনার্দন পণ্ডিতকে বাড়ী দেখে ভয় পেয়ে গেলো। ভাবলো নিশ্চয়ই পণ্ডিত মশায় বাবার কাছে তার নামে নালিশ করতে এসেছেন। হয়তো একমাস আগের কলা খাওয়ার কথা অন্য পড়ুয়াগণ আচার্যকে বলে দিয়েছেন তাই আচার্য নালিশ নিয়ে এসেছেন। মনে মনে শংকিত হয় কুবের।

কুবের আবার চলে যাচ্ছে দেখে শ্যামলীর মা ডাকলো বাবা কুবের, দুপুর হয়ে গেছে। এখন স্নান করবে এসো। বাইরে কোথাও বের হলে বাবা তোমাকে বকবে। পণ্ডিত মশায়ও তোমাকে খারাপ ছেলে ভাববেন। এসো।

কুবের শ্যামলীর মার কাছে এসে অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করলো পণ্ডিত মশায় কি আমার নামে বাবার কাছে নালিশ করেছেন ?

বাড়ীতে এসে পণ্ডিত মশাইকে দেখে ভয় পেয়ে আবার পালিয়ে যাচ্ছিলো একথা বুঝতে পারলো শ্যামলীর মা বললো দূর বোকা ছেলে। তোর নামে নালিশ করবে কেন ? তুইতো পণ্ডিতের সব চেয়ে ভালো ছাত্র। তোর প্রশংসাই করেছেন আচার্য মশায়। রান্না ঘরে যাও আমি এক্ষুনি ফিরে এসে তোমার গায়ে তেল মাখিয়ে দেবো।

কুবের নির্ভর হয়ে পুকুরে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এলো। জনার্দন পণ্ডিত কুবেরকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন— কি বাবা খুব খেলা ধুলা করে এলে ?

— হ্যাঁ

—কি খেলা করছো ?

—আজ সীতার উদ্ধার পালা অভিনয় করছি।

—বাঃ বাঃ ! তুমি কার পাঠ করছো ?

—আমি তো সব সময়ই লক্ষণের অভিনয় করি। রাম সেজে দায়িত্বে বোঝা মাথায় নিতে চায় না।

--তোমাদের সীতার পাঠ কে করে ?

—আমাদের চন্দ্র। দেখতে মেয়েলি গোছের রংও ফর্সা শাড়ী পড়লে ওকে খুব সুন্দর দেখায়।

—রামায়নের কথা কার কাছ থেকে শিখছো ?

—মার কাছ থেকে। পদ্মাবতী সলজ্জ হাসি হেসে বললেন

আর বলবেন না আচার্য মশায়, গল্প না বলে ওর খাওয়া হল না, গল্প না বললে ওর ঘুম আসবেনা। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ছাড়া আর তো কোন কাহিনী জানি না তাই রামায়ণ মহাভারতের গল্পই কুবেরকে শোনাই।

– খুব ভালো বৌমা খুব ভালো। ছেলেদের ধর্ম কথা শোনানো খুব ভালো। এতে ছেলে মেয়েদের চরিত্র উন্নত হয়। আর তোমার কুবেরের কথা আলাদা। ও জন্মেছে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকারের জন্য।

——কী যে বলেন। গরীব বামুনের ছেলে, টাকা কড়ি কোথায় পাবে যে লক্ষ লোকের উপকার করবে?

——বৌমা, তুমি একটা মোহর দিয়ে একটি পরিবারের দশ দিনের আর্থিক কষ্ট দূর করতে পারবে। তারপর? মহারাজ পৃথু বলেছিলেন আমি সাতবার পৃথিবী দোহন করেছি। পৃথিবীর সকল মানুষের আহার যুগিয়েছি।

পৃথুর এই অহংকারের কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন— মহারাজ আপনি যত জনের আহার যুগিয়েছেন তার চেয়েও অনেক বেশী জীব পৃথিবীতে রয়েছে যাদের আপনি দেখতে পান না। যাদের আপনি দেখেছেন তাদেরই কয়েকদিন আহার যুগিয়েছেন।

এক মাত্র ঈশ্বরই পারেন মানুষের ক্ষুধা দূর করতে। ধর্মবোধের অভাব হলে মানুষের মনে অশান্তি আসবে। অশান্তি মানুষের সুখ নষ্ট করে। মনে শান্তি দিতে পারাই প্রকৃত কল্যাণ। সেই কল্যাণ সাধন টাকা ছাড়াও করা সম্ভব হতে পারে। এবার চলি বৌমা। অনেক দেরী হয়ে গেলো। বাদলের মা হয়তো আমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। আসি পণ্ডিত মশায়, কাল থেকে আর কুবেরকে পাঠশালায় পাঠানোর প্রয়োজন নেই। ওর পাঠ শেষ হয়েছে।

কুবের যখন শুনলো তার কাল থেকে পাঠশালায় যেতে হবে না তখন সে আনন্দে লাফাতে শুরু করলো। কাল থেকে তাহলে সকাল সকালেই খেলতে চলে যেতে পারবে।

জোর পুকুরের তালগাছগুলোতে প্রচুর তাল হয়। পাড়ার লোকেরা ঐ তালের রস জ্বাল দিয়ে তাল মিশ্রী তৈরী করে। শাঁস এখানকার লোকেরা খায় না। কুবেরের কাছে তালের শাঁস খুব প্রিয়। সে মাঝে মাঝেই বন্ধুদের নিয়ে জোর পুকুরের তাল বাগানে গিয়ে হনুমানকে ডাকে হনুমানও যেন কুবেরের ডাক শোনার জন্যই তাল গাছের মাথায় পাতার ফাঁকে বসে থাকে

কুবেরের ডাক শুনে একটা করে কাঁচা তাল কুবেরদের উদ্দেশ্যে উপর থেকে ফেলে আর ইন্দ্র একটা একটা করে লুফে নেয়। জোর পুকুরের পাড়ে লুকিয়ে রাখা দা দিয়ে কেটে খায়। পুকুরের পাড়েই রামায়ণ কিংবা মহাভারতের কোন কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটক শুরু করে।

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে নাটক করতে বলে যখন ছেলেরা খেলতে বের হয় তখন সকলেই বাঁশের তৈরী তীর ধনুক, কাঠের তরবারী আর শোলায় গদা নিয়ে আসে।

কোন কোনদিন বালকদের খেলা দেখতে পাড়ার মেয়েরাও এসে হাজির হয়। মহিলারা অবাক হয়ে ভাবে কুবের বালক মাত্র। সে কেমন করে তার চেয়ে বয়সে বড় সঙ্গীদের নিয়ে এমন সুন্দর অভিনয় করছে!

বলরামের দুজন প্রিয় শিষ্য ছিলো যারা গদা যুদ্ধে সে সময় ভারতের সেরা বীর বলে গণ্য হতো। একজন রাজা দুর্যোধন আর একজন মধ্যম পাণ্ডব ভীম।

একদিন কুবের ভীমের পাঠ নিয়েছিলো আর নকুলকে দিয়েছিলো দুর্যোধনের পাঠ। উপস্থিত ছিলো আটজন মহিলা।

শোলার গদা বারি লেগে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙ্গে যাবার পর ভীমরূপী কুবের ঝঁাপিয়ে পড়েছিলো নকুলের উপর। দুজনের মধ্যেই যেন দুই বিদেহী আত্মার ভর হয়েছিলো। তাই এমন ভাবে ওরা জাপ্‌টা জাপ্‌টি করে কুস্তি করলো যে পাড়ার মহিলারা কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন দুজনকে ছাড়াতে পারলো না তখন এক মহিলা খানিকটা জল ঢেলে দিলো তাদের উপর।

কুবেরের আট বৎসর পূর্ণ হয়েছে। প্রতি বৎসরই কুবেরের জন্মদিন উপলক্ষে পদ্মাবতী মৌড়েশ্বরের মন্দিরে ভোগ নিবেদন করে কুবেরের দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং কুবের যাতে সংসারে থেকে বাবার মতো টোল করে ছাত্র পড়ায় জন্য মৌড়েশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা জানায়।

কুবেরও প্রতি বছরই যায় মৌড়েশ্বরের মন্দিরে। প্রতি বছরই কোন অলৌকিক ঘটনার জন্য প্রতিক্ষা করেন শীতল ঠাকুর। কিন্তু শীতল ঠাকুরের সে প্রতিক্ষা আর শেষ হয় না। কুবের মৌড়েশ্বরের মন্দিরে গিয়ে শান্ত, সুবোধ বালক হয়ে যায়। লজ্জায় শীতল ঠাকুরের দিকে মুখ তুলেও চায় না। শীতল ঠাকুরের বুক বেদনায় ভরে উঠে। মনে মনে বলে হে প্রভু, আমার প্রতিক্ষার কি কখনো অবসান ঘটবে না?

জগন্নাথের পর পদ্মাবতীর কোল আলো করে এসেছে আরো এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলের নাম রেখেছেন কেশব। মেয়ের নাম সনাতনী।

জগন্নাথ ছোট ভাই বোনকে নিয়ে বাড়ীতে খেলতেই ভালো বাসে। ছোট ভাই বোনের প্রতি কুবেরের বিন্দু মাত্র আকর্ষণ নেই। সে সুযোগ পেলেই বাড়ী থেকে বের হয়ে কোথায় যে সারাক্ষণ কাটায় সে কথা বাড়ীর কেউ জানেনা। বাড়ীর লোক মোটামুটি ধরে নিয়েছে কুবেরকে বেশী দিন ঘরে ধরে রাখা যাবে না।

কুবেরকে যে কোন সময় ছেড়ে দিতে হতে পারে। কুবের

সন্ন্যাস না নিলে বারো বছরের পর আর বেঁচে থাকবে না। এই কথা মনে হলেই পদ্মাবৃতীর চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে থাকে। চোখের জল পড়লে পাছে ছেলের অমঙ্গল হয় এই আশংকায় নিজের মনকে বুঝতে চেষ্টা করে। তার তো আরো তিনটি সন্তান আছে। একটি সন্তান না হয় জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের খোঁজে বের হবে। এমন তো অনেক ঘর আছে যারা একটি সন্তানের জন্য ভগবানের মন্দিরে মাথা খুড়ে মরছে।

কুবের তার প্রথম সন্তান। কুবেরকে পাওয়ার জন্য সে তিনটি বছর দেবতার কাছে চোখের জল ফেলেছে! চার সন্তানের মধ্যে কুবের সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে আদরের।

ফাল্গুন মাস। পূর্ণিমা তিথি। এই পূর্ণিমায় পুর্ণগ্রাস চন্দ্র গ্রহণ। ১৪০৭ শকের এই পুর্ণিমা তিথি পৃথিবীর মানুষের কাছেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে একথা তখন কেউ কল্পনাও করেন নি।

কুবের আট বৎসর এক মাসে পড়েছে দেহের গড়নে মনে হতে পারে সে বোধ হয় পনের বছর পার করেছে। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ হলেও মুখশ্রী খুব সুন্দর। শ্রী সবদা বিরাজ করছে যে কেউ একবার কুঁবেরের মুখের দিকে তাকাতো তার পক্ষেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কষ্টকর হতো।

কুবেরের দেহের বাড়ন্ত গড়ন আর অপুর্ব মুখশ্রী এক চক্রা গ্রামের কিশোরী থেকে বৃদ্ধা পর্যান্ত আড চোখে তাকিয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আদিম রসিকতা করতো পদ্মাবতীর কানেও যে ঐসব কথা যে যেতোনা তা নয়। পদ্মাবতী নিজের সহেলীদের বলতো আথ, আমার আট বছরের ছেলেটাকে নিয়ে পোড়ামুখীরা কেমন ঢং করতে শুরু করেছে। সারা এক চক্রা নগরে যেন যুবক নেই। একটা কিশোর যেন তাদের সকলের কাছে কামদেব হয়ে উঠেছে।

সহেলীরা মাঝে মাঝে পদ্মাবতীর কথায় মৃদু হেসে বলতো রাগ করোনা বোন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় শুনেছিলাম কিশোর শ্রীকৃষ্ণের দেহের গড়ন আর অপূর্ব মুখশ্রী দেখে নাকি সারা বৃন্দাবনের গোপীনিগণ পাগলিনী হয়ে গিয়েছিলো। তোমার কুবের আট বছরের ছেলে এ কথা কে বিশ্বাস করবে বলো! সকলেই ভাববে তোমার ছেলে যুবক হয়েছে।

— কি করবো বোন। সংসারে যাকে বেশী দিন ধরে রাখা যাবেনা ভগবান তাকেই অপূর্ব করে তুলেছেন যাতে দুঃখটা বড় বেশী করে বাজে।

পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণগ্রাস চন্দ্র গ্রহণ হবে। এই চন্দ্র গ্রহণকে কেন্দ্র করে সারা এক চক্রানগরে সন্ধ্যায় জমিদার বাড়ীতে নাম কীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়েছে। কুবের বলেছে আজ সে তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে দুপুরে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করবে। এই কৃষ্ণলীলায় সব গান কুবের নিজেই রচনা করেছে। বন্ধুদের সেই সব গান শিখিয়েছে।

শীতল ঠাকুরের কথায় মোড়েশ্বর মন্দিরের বিরাট নাট মন্দিরেই বেলা দুপুর থেকে শুরু হবে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন আর সন্ধ্যায় সকলেই হাজির হবেন জমিদারের কাছারি বাড়ীতে। সেখানে এক প্রহর নাম কীর্ত্তন হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে। নরজাতকের জন্ম সময়ে কোন অশুভ লক্ষণ দেখা দিলে সন্তানের মা বাবা সন্তানের ভাগ্য নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। শুধু মা বাবাই নয় পাড়া পড়শীরাও অনেক সময় নবজাতকের জন্মের সময় কোন অশুভ লক্ষণ দেখলে বিদ্রূপ সমালোচনা করেন। কিন্তু, জন্মের সময় শুভ অশুভ কিংবা জন্ম মাস তারিখ ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষ তার জাগতির বিচার বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে ঈশ্বরের নিয়ম হস্তক্ষেপ করতে চায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অশুভ মাসে, দুর্যোগের সময়ে জন্ম গ্রহণ করে মানুষের ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার শিক্ষাই দিয়েছেন।

ঈশ্বর সর্বত্রই রয়েছে। এই কথা ঈশ্বরেরই কথা। ঈশ্বরের এই কথা মেনে নিলেই পরিস্কার বুঝতে পারা যায় তিথি, বার নক্ষত্র মাস বর্ষ ইত্যাদির উপর জাতকের জন্ম নিয়ে মানুষ যে আলোচনাই করুন না কেন জাতকের সব কিছুই নির্ভর করছে তার পুর্ব জন্মের সুকৃতি ও দুস্কৃতির উপর।

ঈশ্বর যেহেতু সর্বভূতে সর্বক্ষণ বিরাজিত সেহেতু কোন মুহুর্তই অশুভ নয়। অশুভ হলো মানুষের মনের চিন্তা এবং মানুষের কুকর্মের ফল।

কুবের তার চার বন্ধু ইন্দ্র জয়ন্ত, মনা আর গকুলকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কীর্ত্তন করছে। তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সেরে মহিলাগণ এসে সমবেত হয়েছেন মৌড়েশ্বরের নাটমন্দিরে বালকদের কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন শুনতে।

দুপুরে শুরু হলো কীর্ত্তন। কীর্ত্তন করতে করতে মাঝে মাঝেই নিজেকে হারিয়ে ফেলছে কুবের। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বারবার। বাকী চার বালক কুবেরের এই ভাব দেখলেই হরি বোল ধ্বনিতে নাট মন্দির মুখরিত করে তুলছে। অজ্ঞাত আশংকায় উপস্থিত শ্রোতাগণও চার বালকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হরি-বোল ধ্বনি দিচ্ছেন।

শীতল ঠাকুরের দেহে মৌড়শ্বরের আবেশ ঘটছে। একচক্রা নগরীর সবচেয়ে প্রবীন এই ব্রাহ্মণ ভাবাবিষ্ট হয়ে বালকদের কীর্ত্তনের স্থানে এসে নৃত্য করেছেন। মাঝে মাঝে কুবেরের পায়ে ধরে প্রণাম করছেন। কুবেরও বাহ্য জ্ঞান শূন্য। এই অতি বৃদ্ধের প্রণাম বেশ আনন্দের সঙ্গেই সে গ্রহণ করছে। পদ্মাবতী ছেলেকে বার বার ডেকে বলেছেন -বাবা, বড়দের প্রণাম গ্রহণ করতে নেই, পাপ হয়। কিন্তু, মা'র ঐ সব কথা কুবেরের কানে পৌঁছেছে বলে মনে হলো না।

গ্রামের মানুষ অনেকটা কৌতুহলী হয়ে পাঁচ বালকের মুখে

শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্তন শুনতে এসে অবাক্ বিস্ময়ে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে কীর্তন শুনতে লাগলো। কুবের কখন কবে ঐ সব গান শিখেছে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু, এত শ্রুতি মধুর সঙ্গীত তারা কেউ এই গ্রামে কখনো শুনে নি।

বিকেল হয়ে গেছে। কীর্তন শেষ হলেও সমবেত মানুষ স্থানুর মতোই কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে যার যার বাড়ীর পথে পা বাড়ালো।

শীতল ঠাকুর পাঁচ বালককে বললেন— বাবা তোমরা আজ যা শোনালে ইতি পূর্বে এমনটি আর কেউ শোনে নি। আমার খুব ইচ্ছে করেছে তোমাদের ভোজন করাই আমি মোড়েশ্বরের কাছে ভোগ নিবেদন করে তোমাদের জন্য প্রসাদ সযত্নপূর্বক রেখে দিয়েছি। তোমরা প্রসাদ পেয়ে বাড়ী যেও।

শীতল ঠাকুর নিজের হাতেই রান্না করেন দুটি গাভী আছে। একটার পর একটা বাচ্চা দেয়। দুধের অভাব হয় না। শীতল ঠাকুর রোজই গরুর খাঁটি দুধ দিয়ে পায়েস রান্না করে মোড়েশ্বরের কাছে ভোগ নিবেদন করেন। আজ বালকদের খাওয়ানোর বাসনা থাকায় দুটি বাড়ী থেকে দুধ কিনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, কেউ দুধের দাম নিতে রাজী হয় নি। মোড়েশ্বরের ভোগের জন্য আনন্দে তারা দুধ দান করেছে।

যদুনাথ পণ্ডিতের মেয়ে কমলা অপরূপ সুন্দরী। এক চক্রা গ্রামে এমন সুন্দর মুখশ্রী আর কোন কিশোরীর নেই। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং। ভ্রূ দুটি রাম ধনুর মতো বাঁকা। চোখ দুটো যেন ভ্রমরের চেয়েও কালো। হরিণের মতো মায়াবী চোখের চাহনিতে পাড়ার আবাল বৃদ্ধ সকলেই মুগ্ধ

কমলার বয়স সাত বছর। কুবেরের চেয়ে এক বছরের ছোট। পদ্মাবতী এবং যদু মিশ্রের স্ত্রী মালতীর মধ্যে, খুবই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে কুবেরের জন্মের পর থেকেই। কুবের যেমন পদ্মাবতীর প্রথম সন্তান তেমনি কমলাও মালতীর প্রথমা কন্যা।

পদ্মাবতী আর মালতীর রোজই একবার করে দেখা হয়। একজন আর একজনের কাছে মনের কথা একদিন বলার সুযোগ না পেলে দিনটাই তাদের কাছে ব্যর্থ বলে মনে হয়।

কুবের ফর্সা না হলেও মুখের শ্রী কুবেরকে কামদেবের মতোই সুন্দর করে তুলেছে। কমলা যেন স্বয়ং বৈকুণ্ঠ ছেড়ে মর্ত্তে যদু মিশ্রের ঘরে আবির্ভূত হয়েছে।

পদ্মাবতী এবং মালতী নিজেদের অজান্তেই কুবের আর কমলাকে এক ডোরে বেঁধে ফেলেছেন। কুবের এ সবের কিছু না জানালেও সাত বছরের মেয়ে কমলা তার মা এবং পদ্মামাসীর কথায় বুঝতে পারে ভবিষ্যতে কুবেরের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে।

কুবেরের সুন্দর মুখশ্রী কমলাকেও আকৃষ্ট করেছে। মার সিদ্ধান্তে সে খুব খুশী। কুবেরকে স্বামী হিসেবে লাভ করতে পারলে সে খুবই খুশী হবে।

কুবের প্রায় সব সময়ই গান গায়। গান ও সুর তাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি কিন্তু কুবের নিজেই রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য ধর্মমূলক কাহিনী নিয়ে ছোট ছোট পদ রচনা করে ছোট ছোট গান গায়।

কুবেরের গলার স্বর শুনলেই চুম্বকের আকর্ষণের মতোই ঘরের ভেতর থেকে ছুটে আসে কমলা। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর শুনলে রাধারাণী যেমন করে পাগলিনীর মতো ঘর থেকে ছুটে আসতো ঠিক তেমনি করেই কমলাও ছুটে আসে। কখনো কখনো মালতীর নজরে পড়ে কমলার এই চঞ্চলতা। মালতী রাগ করে না। শুধু কমলা কেন কুবেরের গান শুনলে গ্রামের যে কোন মানুষ হাতের কাজ রেখে মুহুর্তের জন্য হলেও কুবেরের গান শুনে।

মালতী প্রতি বৃহস্পতি বারে লক্ষ্মীর ঘট স্থাপন করে লক্ষী দেবীর পুজো দিয়ে শাড়ীর আঁচল গলায় জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে লক্ষী দেবীর কাছে গৃহের শ্রী বৃদ্ধির প্রার্থনা জানায় কমলাও তখন লক্ষী দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম মনে মনে

কুবেরকে স্বামী হিসেবে লাভ করার প্রার্থনা জানায়।

জয়ন্ত চৌধুরীর বাড়ীতে কীর্ত্তন শুরু হয়ে গেছে। খোল করতাল নিয়ে সকলে গাইছে "—হরি হরয়ে নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাম। রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহিমাম"।

ধীরে ধীরে জমিদার বাড়ীর নাট মন্দির পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কুবের তার বাবা এবং ভাই জগন্নাথের সঙ্গে জমিদার বাড়ীতে গেছে। জমিদার বাবু একটা কারু কাজ করা কাঠের চেয়ারে বসে কীর্ত্তন শুনছেন। মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে সুরের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছেন।

কুবের কীর্ত্তনের আসরে পৌঁছতেই কয়েকজন এসে কুবেরকে আসরে নিয়ে গেলো। কুবের তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দু হাত তুলে কীর্ত্তন শুরু করলো।

একটু পরে সন্ধ্যা নামতেই সোনার থালার মতো চাঁদ পূর্ব আকাশে দেখা দেবে। তার পরই শুরু হবে গ্রহণ। প্রবাদ আছে ভগবান বিষ্ণু মোহিনী বেশ ধারণ করে যখন দেবতাদের মধ্যে অমৃত বিতরণ করছিলেন তখন দৈত্যপতি রাহু দেবতাদের বেশ ধরে দেবগণের পংক্তিতে গিয়ে বসে পড়লেন। মোহিনী-রূপী বিষ্ণু দেবতা রূপী রাহুর হাতে অমৃত দেওয়া মাত্রই রাহু অমৃত খেয়ে নিলো। রাহুর পাশে বসা চন্দ্র ও সূর্য রাহুকে চিনতে পেরে বলে উঠলেন — ও দেবতা নয়, দৈত্যপতি রাহু।

রাহুর পরিচয় পাওয়া মাত্র ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। কিন্তু অমৃত পান করায় রাহুর মৃত্যু হলো না। রাহুর মস্তক আকাশে ঘুরতে থাকলো আর শরীরের অংশ সাপের আকৃতি হয়ে সমুদ্রে পতিত হলো। সেই সর্পাকৃতি অংশের নাম হলো কেতু।

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে বিজ্ঞান অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ

করে। বিজ্ঞানের মতে চন্দ্র সূর্য পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করলে শুক্লপক্ষে চন্দ্র গ্রহণ এবং কৃষ্ণপক্ষে সূর্য গ্রহণ হয়।

কুবের এগারোতে পা দিয়েছে। যদু পণ্ডিত কুবেরকে উপনয়ন সংস্কারের জন্য হারু পণ্ডিতকে তাগাদা দিতে শুরু করেছেন। কুবের এমনিতেই বেশ বড় সড় হয়ে গেছে। দেখলে মনে হবে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত কিন্তু, হারু পণ্ডিতের মনে ভয় ছেলে যদি উপনয়নের সময়ই সন্ন্যাস নিয়ে চলে যায়? তাই কুবের এগারোতে পা দিলেও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন। কিন্তু, জনার্দন ঠাকুরও যখন বললেন — সামবেদীদের এগারোয় উপনয়ন দেওয়াই প্রশস্ত তখন আর হারাধন চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না।

জনার্দন ঠাকুরই হলেন কুবেরের উপনয়ন গুরু। ঠিক হলো পৈতের তিনদিন কুবের যখন ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য আলাদা ঘরে অসূর্য স্পর্শা হয়ে থাকবে তখন জনার্দন ঠাকুর কুবেরের সঙ্গী হবেন।

উপনয়ন হবার পর তিন রাত্রি এমন ভাবে থাকতে হয় যাতে কোন স্ত্রীলোক এমনকি গর্ভধারিনী মা পর্যন্ত ছেলের মুখ দর্শন করতে পারবেন না। ব্রাহ্মণ ব্যতিত অন্য কোন পুরুষও তিনদিন ব্রহ্মচারীর মুখ দর্শন করতে পারেন না।

উপনয়নের ত্রিরাত্রি অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত উপবীতধারী ব্রহ্মচারীকে সূর্য দর্শন করাও নিষিদ্ধ। উচ্চ স্বরে কথা বলতে পারবে না, উচ্চ স্বরে হাসতে পারবেনা এবং গান গাইতে পারবে না। ঐ তিনদিন গেরুয়া পরে থাকতে হবে ভগবানের নাম জপ্ করতে হবে।

তিনরাত্রি অতিক্রান্ত হলে সূর্য উঠার আগেই উপবীতধারী ব্রহ্মচারীকে দণ্ড ও গেরুয়া নিয়ে নদীতে স্নান করে আসতে হবে। তারপর সূর্য্য উঠলে গেরুয়া পরে, গেরুয়া রং এর ঝোলা নিয়ে ভিক্ষায় বের হতে হয়। প্রথমে মায়ের হাতে ভিক্ষা নিতে

হয়। মা যদি বিধবা হন তাহলে নিকটতম কাকীমা জ্যেঠিমা প্রভৃতির কাছ থেকে প্রথমে ভিক্ষা নিয়ে তারপর অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বাড়ী ভিক্ষা নিতে হয়।

তিন বাড়ী থেকে ভিক্ষা নিয়ে যে ভিক্ষা পাওয়া যাবে তাই রান্না করে সেই উপবীত ধারী ব্রহ্মচারীকে দেওয়া হবে। খাবার সময় ব্রহ্মচারী কথা বলতে পারবেনা। খেতে বসে কথা বললে সেদিন সূর্য্যাস্তের আগে আর খাওয়া চলবে না।

উপনয়নের চার দিন পর যে কোন দিন উপনয়নধারীকে মাছ স্পর্শ করতে হলে কমপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মাছ স্পর্শ করা যাবে।

একবছর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে উপবীতধারীকে বিভিন্ন নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। যে কোন খাবার খেতে যেমন কথা বলতে পারবেনা তেমনি নিকটতম মাতৃস্থানীয়া কোন মহিলা ব্যতিত অন্যের হাতে ভোজন করা চলবে না। ব্রাহ্মণ বাড়ী ভিন্ন অন্য কোন বাড়ীতেও ভোজন নিষিদ্ধ।

একবছর পর যদি কোন যজমান নিজ বাড়ীতে ব্রহ্মচারীকে বিভিন্ন দান দ্বারা ভোজন করায় তবেই সেই ব্রহ্মচারী অন্য বর্ণের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক রান্না গ্রহণ করতে পারেন।

কুবেরকে মাটির প্রলেপ দেওয়া একটি ঘরে রাখা হয়েছে। এই তিন দিন ব্রহ্মচারীকে সবসময় ঠাকুরের নাম জপ করে কাটাতে হয়।

জনার্দন ঠাকুর শীতল ঠাকুর আর যদু পণ্ডিত পালা করে কুবেরকে ভাগবত কথা শোনানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাত্রিতে কুবেরের সঙ্গে জনার্দন ঠাকুর ঘুমাবেন বলে ঠিক হয়েছে।

হারুপণ্ডিত জনার্দন ঠাকুরকে দিয়ে কুবেরের কুষ্ঠি তৈরী করিয়েছিলেন। জনার্দন ঠাকুরও বলেছেন—কুবেরের ঠিক বার বছরের মাথায় মৃত্যু যোগ আছে। কোন অলৌকিক ঘটনা

ব্যতিত এই মৃত্যুযোগ থেকে কুবেরের রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার হবে।

কুবের খেলতে গিয়েছিলো। ধুলোমাখা শরীরে ফিরে এসে দেখতে পেলো বাবার সঙ্গে সাতজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী বারান্দায় বসে কথা বলছেন। একজন ব্রহ্মচারী উঠানের এক কোনে রান্নার আয়োজন করছেন এবং তার মা পদ্মাবতী ব্রহ্মচারীকে এটা ওটা এনে দিয়ে সাহায্য করছেন।

কুবের সন্ন্যাসী দেখেই বারান্দায় এসে— নমো: নারায়ণায় বলে নমস্কার জানালো। মহন্ত গোবিন্দানন্দজী কুবেরের মুখে নারায়ণ সম্ভাষণ শুনে মৃদু হেসে উত্তর করলেন নমো: নারায়ণায়।

জনার্দন ঠাকুরের কাছেই কুবের শুনেছে সন্ন্যাসী দেখলেই প্রণাম করতে হবে এবং নমো: নারায়ণ বলে সম্ভাষণ জানাতে হবে।

কুবেরকে হারুপণ্ডিত মুখ ধোয়ে আসতে বললেন। দুপুরে এবং রাতে সন্ন্যাসীরা এখানেই প্রসাদ পাবেন। ব্রহ্মচারী কুবের তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে।

উপনয়ন সংস্কারের পর যজমান বাড়ীতে পুরো উপনয়নের খরচ বহন করে ভিক্ষা না করানো পর্যন্ত উপবীত ধারীর ব্রহ্মচৈর্য ভঙ্গ হয় না। এই ব্রহ্মচৈর্যকালে মা ব্যতিত অন্য কোন নারীর রান্না গ্রহণ করা যায় না। ব্রাহ্মণ বাড়ী ভিন্ন অন্য বর্ণের বাড়ীতে খাওয়া যায় না সে ব্রাহ্মণের রান্না হলেও না।

কুবেরের পৈতে হয়েছে এক বছর আগেই। কিন্তু, এখনো কুবেরের ব্রহ্মচৈর্য ভঙ্গ করা হয় নি। দু-একবার গ্রামের মানুষ কুবেরের ব্রহ্মচৈর্য ভাঙ্গানোর উদ্যোগ নিলেও ব্রহ্মচৈর্য ভাঙ্গানো হয় নি।

জমিদার জয়ন্ত চৌধুরী বলেছেন কুবেরের ব্রহ্মচৈর্য আগামী বাসন্তী পুজোর সময় ধুমধাম করে ভাঙ্গানো হবে। বাসন্তী

পূজার আরো একমাস বাকী।

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি। হারু পণ্ডিত মহন্ত গোবিন্দানন্দজীকে বললেন—মহারাজ, কাল একাদশী করে পরশু পারায়ণ করে গেলে খুশী হবো।

গোবিন্দানন্দজী কুবেরকে একপলক দেখেই চিনতে পেরেছেন। এই অমূল্য রত্নকে ছেড়ে যেতে মন চাইছিলো না তাছাড়া তার ললাট দেখে বুঝতে পেরেছেন একদিকে ওর মৃত্যুর হাতছানি অন্যদিকে সন্ন্যাসীর বেশ। দুটার একটা কুবেরকে গ্রহণ করতেই হবে। কুবের এবং তার পরিবার এই অবস্থা সম্পর্কে মোটেই অবগত নয় সুতরাং কুবেরের এই বিপদে পণ্ডিতকে সাহায্য করাই কর্তব্য তাই পণ্ডিতের কথায় রাজী হলেন মহারাজজী। কুবেরের খুব আনন্দ হলো।

সন্ন্যাসীর কাছে একটি শিবলিঙ্গ এবং পটে আঁকা একটি শংকরাচার্যের ছবি রয়েছে। খাবার তৈরী হলে বারান্দায় এক পাশে ছোট্ট একটা হরিণের ছালের আসনের উপর শিবলিঙ্গ আর পটে আঁকা শংকরাচার্যের ছবির কাছে ভোগ নিবেদন করলেন গোবিন্দানন্দজী।

কুবের স্নান সেরে এসেছে। গোবিন্দানন্দজী যে থালায় ভোগ লাগিয়েছেন তাতে নারকেল্ এবং গুড় দিয়ে তৈরী দুটো সন্দেশ রয়েছে। নারকেলের সন্দেশ কুবেরের খুবই প্রিয়। মা শীতের সময় প্রতিবার নারকেলের সন্দেশ তৈরী করেন আর প্রায় প্রতি দিনই কুবের খেলা থেকে ফিরে এসে চুপি চুপি ঠাকুর ঘরে গিয়ে একটা দুটো নারকেলের সন্দেশ খায়।

মাটির পাত্রে ধুপ দিয়ে ধুনো দেওয়া হয়েছে। সন্নাসী ব্রহ্মচারীগণ ভোগ লাগানোর পর গুরুজীর সঙ্গে ধ্যান করছেন। পদ্মাবতী, হারু পণ্ডিত এবং পাড়ার আরো দু-একজন সন্ন্যাসীদের পুজো দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছেন এমন সময় দ্রুত বেগে ছুটে

এসে কুবের একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে মুখ পুরে দিলো।

সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীগণ ধ্যানস্থ বলে কুবেরের এই কাণ্ড দেখতে পায়নি কিন্তু, বাড়ীতে উপস্থিত সকলে এই কাণ্ড দেখে অজ্ঞাত আশংকায় চমকে উঠলো।

গোবিন্দানন্দজী চোখ খুললেন। জোরে তিনবার শঙ্খে ফু দিলেন। পূজারী ব্রহ্মচারীকে বললেন ভোগ সরিয়ে খাবারের আয়োজন করো।

পদ্মাবতী সামান্য দূরে থেকে শিবের প্রতি প্রণাম জানিয়ে হাত জোর করে বললেন মহারাজ, আমার বড় ছেলে কুবের বার বছরের পা দিলেও পাঁচ বছরের বালকের মতোই অবোধ। সে ভোগের থালা থেকে পূজোর আগেই প্রসাদ নিয়ে গেছে আপনি ওকে ক্ষমা করুন।

গোবিন্দানন্দজী বললেন মা, তোমার তাতে ভয় পাবার কিছুই নেই। কুবের শুদ্ধ আত্মা। ওর মাধ্যমে আমার শিব-ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেছেন।

রাতে পদ্মাবতী স্বপ্ন দেখলেন কুবের গোবিন্দানন্দজীর সঙ্গে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাচ্ছেন। পদ্মাবতী ছেলেকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আটকে রাখতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। পড়ে গেলেন মাটিতে। মাটিতে পড়ে থেকেই চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন কুবের ফিরে আয়, ফিরে আয়।

স্বপ্নের চিৎকার হঠাৎ করে মধ্য রাতের নিঃস্তব্ধ হারু পণ্ডিতের শোবার ঘর প্রকম্পিত কার তুললো। কুবেরের ছোট বোন সনাতনী মা বাবার সঙ্গে শোয়। সে মায়ের চিৎকারে জেগে উঠলো। জেগে উঠলেন হারু পণ্ডিত।

ঘরে মাটির হাড়িতে ধানের তোষের আগুনে গন্ধক ভেজানো কাঠি রাখতেই আগুন জ্বলে উঠলো বনা গাছের তেল দিয়ে মাটির প্রদীপ ভরে রাখা হয়। চিকন করে তুলো দিয়ে সলতে

পাকিয়ে তেলে ভিজিয়ে রাখা হয়। গন্ধক তুলায় মিশিয়ে কাঠিতে জড়িয়ে রাখা হয়। আগুন জ্বালতে হলে মাটির হাড়িতে তোষের আগুনে সেই গন্ধকের কাঠি ছোঁয়াতেই আগুন জ্বলে উঠে। ঘরে ঘরেই প্রদীপ জ্বালার ব্যবস্থা রয়েছে। হারু পণ্ডিতেরও শোবার ঘরে খাটের নীচে আগুনের হাড়ি এনে রাখা হয়।

মোটা বাঁশের ছোট্ট চোঙের মধ্যে রক্ষিত গন্ধকের কাঠি তোষের আগুনে ছুইয়ে আগুন ধরিয়ে নিলেন হারাই পণ্ডিত। পদ্মাবতী বিছানায় উঠে বসে আছেন। মেয়েটা অবাক হয়ে ম'য়ের দিকে তাকিয়ে আছে। হারু পণ্ডিত জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে, কুবেরের মা ?

—রাতে স্বপ্নের কথা বলতে নেই। কাল সকালে বলবো ?

—ঠিক আছে তা হলে আবার শুয়ে পড়ো।

বাকী রাত আর ঘুম এলো না পদ্মবতীর। কেন যেন মন বার বার বলতে লাগলো কুবেরকে হারাবি, কুবেরকে হারাবি।

দূরের মুসলমান পাড়ায় মোরগ ডেকে উঠলো। আগত সন্ন্যাসীর দল উঠে বসেছেন মোরগ ডাকার আগেই। তাদের ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। হয়তো তারা প্রত্যেকেই ধ্যান্ জপ্ নিয়ে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। ভোরের আলো ফোটে উঠার আগেই তারা প্রাতকৃত: সেরে নেবেন। গোবিন্দনন্দজীর মাথায় জটার পাহাড়। তিনি কখনো ডুব দিয়ে স্নান করেন না। গলা অবধি জলের নীচে ডুবিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে মাথায় তিনবার—‘‘কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুস্কারাণীচ তীর্থানি পুণ্যানী সন্ধ্যা কালে ভবন্তিহো বলে কয়েক ফোটা জল ছিটিয়ে দিয়ে জল থেকে উঠে আসেন।

গোবিন্দানন্দজীর হাতে বড় একটা পেতলের কমণ্ডলু নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছেন। পরনে একটা ল্যাংটি। মাথায় এক টুকরো গেরুয়া কাপড় বাঁধা।

শ্যামলীর মা ঝাঁটা দিয়ে উঠান পরীস্কার করে সারা বাড়ীতে গোবরের জল ছিটিয়ে দিয়েছে। পদ্মাবতী দুর্গা দুর্গা বলে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। তিনিও স্নান না সেরে বাসী কাপড়ে উনুনের পাশে যান না। শুদ্ধ বস্ত্র না পড়ে রান্না ঘরে গেলে লক্ষ্মী দেবীর সে দিন কৃপা পাওয়া যাবে না আর যদি লক্ষ্মী দেবীর কৃপা না পাওয়া যায় তাহলে রান্না ভালো হবেনা। রান্না খেয়ে অন্যরাও পরিতৃপ্ত হবেন না।

পদ্মাবতী স্বামীকে ডেকে বললো— তুমিও উঠে পড়ো। গাই দোহন করে দুধ এনে দাও। আমি স্নান সেরে এসে সন্ন্যাসীদের কাঁচা দুধ দিয়ে আসবো পূজোর জন্য।

হারু পণ্ডিত বললেন— সাধুরা আজ সারাদিন জপ্ তপ্ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। যে দুধ এখন ভোগে লাগাবেন সে ভোগ আজ আর সরাবেন না। কাল ভোরে স্নান সেরে ঠাকুরের ভোগ লাগিয়ে কোন সাধুকে পারণ করিয়ে তারপর প্রসাদ পাবেন। আমরা গৃহীরা যেমন করে একাদশীর উপবাস পালন করি সাধুদের মধ্যে অনেকে সে রকম করেন না।

একাদশীর উপবাস পালন করতে হলে একাদশীর আগের দিন সংযম পালন করতে হয়। একাদশীর আগের দিন এক বেলা নিরামিষ আহার করতে হয়। রাতে রমন নিষিদ্ধ। পরদিন জলও গ্রহণ করা যায় না। দ্বাদশী তিথিতে কোন ব্রাহ্মণ কিংবা বৈষ্ণবকে পারণ করিয়ে অর্থাৎ যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ভোজন করিয়ে এবং দক্ষিণা প্রদান করে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তারপর নিজে ভোজন করতে হয়।

পদ্মাবতী বললো আমি যাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

পদ্মাবতী স্নান সেরে একটা বড় পাথরের বাটিতে এক বাটি কাঁচা দুধ নিয়ে গোবিন্দানন্দজীর সামনে রেখে বললেন শিবের ভোগে লাগাবেন।

গোবিন্দানন্দজী বললেন মা ,একাদশী তিথিতে কেউ কেউ উপবাসী থাকে আবার কেউ কেউ খেয়েও উপবাসী থাকেন। আমি দ্বিতীয় দলের সন্ন্যাসী। আমার শিবজীর কাছে একাদশী তিথিতেও ভোগ লাগাই। প্রসাদ পাই। তুমি অবসর হয়ে এখানে এসে বসো তোমাকে একাদশীর গল্প শোনাবো। আমাদের জন্য কিছু আটা, ঘি আর তরকারী পাঠিয়ে দিও।

পদ্মাবতীর বাবা একাদশীর উপবাস করতেন। তিনি আগের দিন বিকেলে একবার চরু রান্না করে খেতেন। একাদশীর তিথির দিন জলও গ্রহণ করতেন না। পরদিন পাড়ার কোন ব্রাহ্মণ বালককে ভোজন করিয়ে তবে খেতেন একাদশীর দিন খেয়েও কি ভাবে উপবাস থাকা যায় তা পদ্মাবতীর মাথায় ঢুকলো না।

কুবের প্রতিদিনই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ্ করে তারপর হাত মুখ ধোয়ে পুকুরের পাড়ে হাঁটা হাঁটি করে।

ব্রাহ্মণ পাড়ায় শেষরাতে শোনা যায় ব্রাহ্মণ বালকদের সামবেদ গান, ন্যায়, অলংকার ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের পাঠ। কুবের কোন কোন দিন ইন্দ্রের বাড়ী যায়। তাকে ন্যায় শাস্ত্রের পাঠ বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ী এসে কোন দিন দুধ মুড়ি, কোনদিন চিড়া ভাজা খায়।

স্বামীর কাছে দুর্ব্বাশা ও অম্বরীশ রাজার কাহিনী সে শুনেছে। কুবেরকে খেতে বসিয়ে কতদিন দুর্বাশা এবং অম্বরীশ রাজার কাহিনী শুনিয়েছে।

অম্বরীশ রাজার রাজ্যে সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। সকলেই একাদশীর দিন উপবাস থেকে হরির আরাধনায় মগ্ন হতেন। আগের দিন নিষ্ঠাভরে সংযম থেকে একাদশীর দিন উপবাসী থেকে দ্বাদশীর দিন কোন ব্রাহ্মণ কিংবা বৈষ্ণবকে ভোজন করিয়ে রাজা অম্বরীশ অন্ন গ্রহণ করতেন।

নারদ ঋষির কাছে অম্বরীশ রাজার গুণের কথা শুনে, কৃপণ স্বভাব দুর্বাশা বাট হাজার শিষ্য সহ একাদশী তিথিতে গিয়ে অতিথ্য গ্রহণ করলেন। মহারাজকে বললেন একাদশী তিথিতে তিনি অন্ন জল গ্রহণ করবেন না। নদীর তীরে হরিনাম চিন্তা করতে করতে কাটাবেন এবং দ্বাদশী তিথিতে এসে আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

রাজা অম্বরীশ একাদশী তিথিতে অন্ন জল ত্যাগ করে হরিনাম ভাবনা করতে করতে কাটিয়ে দিলেন। ক্রমে একাদশী তিথি শেষ হয়ে দ্বাদশী তিথি এলো। দ্বাদশী তিথিও তখন শেষ হবার পথে। মহারাজ অম্বরীশ তখন খুবই ভাবনায় পড়লেন। একাদশীর উপবাস শেষে দ্বাদশী তিথিতে পারনা না করলে একাদশীর তিথির উপবাসের ফল লাভ হয় না। রাজা অম্বরীশ নারায়ণের নাম স্মরণ করে তুলসী পাতা সহ একটু জল খেয়ে যখন পারণা সারবেন ঠিক এমন সময়ই দুর্বাশা ঋষি সব শিষ্য নিয়ে রাজার কাছে এসে অত্যন্ত রাগ হয়ে অভিশাপ দিলেন হে রাজা তুমি পরম বৈষ্ণব বলে নিজের পরিচয় দিয়ে অতিথিতে অভুক্ত রেখেই পারণা করতে গিয়ে বৈষ্ণব অপরাধে অপরাধী হয়েছো। তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি তোমার রাজত্ব আগুনে ছারখার হয়ে যাবে।

দুর্বাশার অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গেই অম্বরীশ রাজার রাজপুরী সহ সারা রাজ্যে আগুনের তাণ্ডব চলতে লাগলো। রাজা অম্বরীশ নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা জানালেন প্রভু আমার জীবন যদি নষ্ট হয় এতে আমি বিন্দুমাত্র [illegible] নই। কিন্তু আমার রাজ্যের একজন প্রজাও যাতে দুর্বাশার অভিশাপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তুমি সে ব্যবস্থা করো।

মহারাজের প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান বিষ্ণু বরুণ দেবকে বলে বৃষ্টিতে রাজ্যের সব আগুন নিভিয়ে দিলেন। দুর্বাশা ঋষিকে শাস্তি দিতে সুদর্শন চক্রকে আদেশ দিলেন।

দুর্বাশা ঋষি দেখলেন সুদর্শন চক্র প্রচণ্ড গতিতে তার দিকে ধেয়ে আসছে। প্রাণ ভয়ে ভীত দুর্বাশা সর্বত্র ছুটতে লাগলেন। সুদর্শন চক্রও তাকে পিছু ধাওয়া করতে লাগলো। দুর্বাশা ক্রমে স্বর্গ, ব্রাহ্মলোক শিব লোক ভ্রমণ করে স্থানে পেয়ে শেষে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পদতলে আশ্রয় নিলেন।

নারায়ণ বললেন— দুর্বাশা, তুমি মর্ত্তে অম্বরীশ রাজা'র কাছে ফিরে যাও। রাজা যদি তোমার ক্ষমা করেন তা হলেই সুদর্শন চক্র তোমাকে পরিত্যাগ করবে।

দুর্বাশা ঋষি তখন অম্বরীশ রাজার কাছে ফিরে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন রাজা অম্বরীশ লজ্জিত হয়ে, নতজানু হয়ে, বললেন - ঋষিবর আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে গ্রহণ করে কৃতার্থ করুণ।

দুর্বাশা ঋষি তখন মহারাজের পুরীতে সশিষ্য ভোজন করে তৃপ্তমনে নিজ আশ্রমে ফিরে এলেন। পদ্মাবতীর মনে বহুদিন প্রশ্ন জেগেছে যে দুর্বাশা ঋষিকে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত ভয় করেন তিনি কেন অম্বরীশ রাজার কাছে পরাভূত হলেন।

হারাই পণ্ডিত নিজেও নির্জলা একাদশী পালন করেন। কুবেরও পৈতের পর থেকে বাবার সঙ্গে নির্জলা একাদশী পালন করে আসছে। পদ্মাবতীর তাই আজ রান্নার জন্য তেমন কোন তারা নেই। শ্যামলীর মা জগন্নাথ ও, সীতাকে এর মধ্যেই গরম ভাত রান্না করে খাইয়ে দিয়েছে।

গোবিন্দানন্দজী ভোগ লাগিয়ে কীর্ত্তন করে শিবাজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ভোগ গ্রহণ করতে প্রার্থনা জানালেন।

হারু পণ্ডিত এবং সবাইকে ডাগলেন শিবাজীর প্রসাদ নেবার জন্য। হারাই পণ্ডিত এবং কুবের ছাড়া সকলেই প্রসাদ নিলো।

গোবিন্দানন্দজী বললেন আজ একাদশী, একাদশীর কাহিনীই তোমাদের শোনাবো। পণ্ডিত, তুমিতো উপোস করছো কেন করছো ? কী জন্য করছো তা জানো ?

— একাদশী দেবীর প্রীতির জন্য এই উপবাস পালন করছি।

— আচ্ছা পণ্ডিত, মনে করো তুমি তোমার মায়ের জন্মদিন পালন করবে তুমি যদি উপবাসী থেকে মায়ের জন্মদিন পালন করতে যাও, মাকেও জন্মদিনে না খাইয়ে রাখো তাহলে তোমার মায়ের জন্মোৎসব কেমন সুন্দর হবে ?

একাদশী তিথিতে একাদশী দেবীর সৃষ্টি হয়েছিলো বিষ্ণুর দেহ থেকে। একাদশী তিথিতে যে কায়মনোবাক্যে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেন তার প্রতি একাদশী তুষ্ট হন। সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন।

হারাই পণ্ডিত বললো — মহারাজ, বাবার কাছে একাদশী তিথির মহাত্ম শুনেছিলাম। কোন এক ব্যাধ শিকারে গিয়েছিলো। ঘরে কিছু না থাকায় তার সেদিন খাওয়া হয়নি। সারা দুপুর শিকার করে ক্লান্ত ব্যাধ যখন এক গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলো তখন গাছের কোটর থেকে একটি সাপ বের হয়ে সেই ব্যাধকে দংশন করে এবং তাতেই সেই ব্যাধের মৃত্যু হয়।

সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়ায় এবং সারা জীবন জীব হত্যার যুক্ত থাকায় ভীষণাকার যম দূতগণ তাকে যমলোকে নিতে আসে। ঠিক সে সময় সুন্দর রথ নিয়ে বিষ্ণু দূতেরাও এসে হাজির হয়।

যমদূত এবং বিষ্ণু দূতদের মধ্যে ব্যাধের অধিকার নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়। এমন সময় স্বয়ং যমরাজ এসে তাঁর দূতদের নিবৃত্ত করেন। বলেন — সর্পাঘাতে ব্যাধের মৃত্যু হলেও একাদশী তিথিতে তার মৃত্যু হওয়ায় সে অক্ষয় স্বর্গ লাভের অধিকারী হয়েছে।

যমের কথা শুনে যমদূতেরা চলে গেলো এবং বিষ্ণু দূতেরা ব্যাধকে বিষ্ণু লোকে নিয়ে গেলো সে যদি সেদিন উপবাসী না থাকতো তা হলে একাদশীর সম্পূর্ণ ফল তার লাভ হতো না।

মৃদু হেসে মহারাজ বললেন পণ্ডিত, তোমার কথা ঠিক হলো না। যারা একাদশী তিথিতে দেহত্যাগ করে তাদের সকলেরই অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। শোন— তোমাদের একাদশী দেবীর কথা শোনাচ্ছি।

সত্যযুগে মুঢ় নামে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী এক দৈত্য ছিলো। তার আকৃতি ছিলো ঠিক কেশী দৈত্যের মতো। মাথাটা ঘোড়ার মতো। দেহ মানুষের মতো।

মুঢ় দৈত্যের পরাক্রমে দেবগণ স্বর্গ ত্যাগ করে অনাথের মতো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হলেন। তখন মুঢ় দৈত্য ভগবান বিষ্ণুকে হত্যা করতে সচেষ্ট হলেন। কারণ ভগবান বিষ্ণুই প্রতি বার দেবগণকে বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

ভগবান বিষ্ণুও মুঢ় দৈত্যের মধ্যে শুরু হলো প্রচণ্ড সংগ্রাম। হাজার হাজার বছর ধরে চললো সংগ্রান। বিষ্ণু এবং মুঢ় দৈত্য দুজনেই ক্লান্ত। মুঢ় দৈত্য একবার ক্লান্তিতে জ্ঞান হারালে ভগবান বিষ্ণুও দূরের এক গুহায় বিশ্রাম নিতে গিয়ে যোগ নিদ্রায় শায়িত হলেন।

মুঢ় দৈত্য জ্ঞান লাভের পর ভগবান বিষ্ণুকে খুঁজতে সেই গুহায় এসে হাজির হলেন বিষ্ণুকে ঘুমন্ত দেখে হত্যার উপযুক্ত সুযোগ মনে করে যখন ভীষণ খরগ দিয়ে বিষ্ণুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে ঠিক তখনি বিষ্ণুর দেহ থেকে সস্ত্রধারিণী অপরূপা নারী মুর্তির আবির্ভাব ঘটলো। সেই নারী যুদ্ধে মুঢ় দৈত্যকে পরাজিত এবং নিহত করলেন। দৈত্যের বিকট চিৎকারে ভগবান বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো।

ভগবান বিষ্ণু চোখ মেলে দেখলেন বিশালাকার ঘোড়ামুখ

মূঢ় দৈত্য রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে আর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সস্ত্রধারিণী এক অপূর্বসুন্দরী নারী।

ভগবান বিষ্ণুকে সেই নারী প্রণাম জানালেন। ভগবান বিষ্ণু যোগমায়ার প্রভাবে বিষ্ণু দেহ থেকে সৃষ্ট এই নারীকে সম্বোধন করে বললেন— কুমারী, তুমি দেবতাগণের ত্রাস মুঢ় দৈত্যকে সংহার করে জগতে কল্যাণ সাধন করেছো। তুমি তোমার মনোমতো বর প্রার্থনা করো। তুমি শুক্লপক্ষের একাদশী দিবসে আবির্ভূত হয়েছো তাই তোমার নাম হউক একাদশী। তোমার নামানুসারে একাদশ দিন একাদশী তিথি নামে অভিহিত হবে। তুমি বর প্রার্থনা করো।

একাদশী বললেন প্রভু এই বর দিন, যারা এই তিথিতে মৃত্যুবরণ করবে তাদের যেন বৈকুণ্ঠে স্থান হয়। যারা এই তিথিতে ভক্তি ভরে আপনাকে স্মরণ করে তাদের যেন সকল বিপদ দূর হয়।

—তথাস্তু।

গোবিন্দানন্দজী একাদশীর ঐ কাহিনী বলে পদ্মাবতীকে বললেন — মা, আমাদের সন্ন্যাসীদের কোন বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখা কঠিন। এমনিতেই আমাদের মধ্যে সংযমের জন্য, আত্মাকে জানার জন্য কৃচ্ছ সাধনার শেষ নেই। কিন্তু লোকাচারের অনেক রকম নিয়ম আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। আর শক্তি ধর, দিব্যভাবে বিভোর সাধু সন্তদের ভাব সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারে না। সাধারণ মানুষ কেন স্বয়ং রাধারাণী পর্যন্ত দুর্বাশা ঋষির ভাব ধরতে পারেন নি। লক্ষ্মীদেবী দ্বারকায় ব্রাহ্মণ রূপী হনুমানকে ভোজন করাতে গিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়েছিলেন।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন— মহারাজ, রাধারাণী স্বয়ং পরমাশক্তি। তিনি দুর্বাশা ঋষির কাছে কেন হার মানলেন?

হার মেনেছেন বলে ঠিক হবে না। বলা চলে মানবীয় দেহের

গুণের প্রভাবে রাধারাণী সাময়িক কালের জন্য বিস্মৃত হয়েছিলেন। দুর্বাশা ঋষি সাধনার বলে অপরিসীম শক্তিধর ঋষিতে পরিণত হয়েছিলেন। তার তপ: প্রভাবকে ত্রিলোকের সকলেই ভয় করতো। এই দুর্ব্বাশা ঋষি ছিলেন অত্যন্ত বদ মেজাজী। যার জন্য অনেক সময় তার অভিশাপের ফলে অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে।

দুর্বাশা ঋষি একবার বৈকুণ্ঠে গেলে ভগবান বিষ্ণু তার গলায় পারিজাত ফুলের মালা মুনিবরকে উপহার দেন। মুনিবর বৈকুণ্ঠ থেকে ফেরার পথে ইন্দ্রপুরীতে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের মঙ্গলের জন্য মালাটি ইন্দ্রকে দান করেন। ইন্দ্র সেই মালাটি প্রণাম করে ঐরাবতের মথায় রাখেন। ঐরাবত পারিজাত ফুলের সুগন্ধে বিভোর হয়ে শুঁড় দিয়ে মালা মাথা থেকে নিয়ে মদমতী বশতঃ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দুর্বাশা ঋষি চোখের সামনে ভগবান বিষ্ণুর উপহারের অবমাননা হতে দেখে দেবরাজকে অভিশাপ দেন — তুমি লক্ষ্মী ছাড়া হবে।

দুর্বাশার অভিশাপে স্বর্গ লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন। হাজার হাজার বছর দেবগণ স্বর্গচ্যুত হয়ে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। তারপর সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মী দেবীকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়।

দুর্বাশা ঋষির বদ মেজাজ তার স্ত্রীকে পর্যন্ত ভস্মীভূত করে দিয়েছিলো। পরে অনুশোচনা করেও নিজ স্ত্রীকে আর ফিরে পাননি।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন মহারাজ— দুর্বাশা ঋষি কেন তার স্ত্রীকে ভস্মীভূত করে ছিলেন? তার স্ত্রীর নাম কি?

মহারাজ বললেন তপস্যায় সিদ্ধ দুর্বাশা মুনির মনে অহংকার ছিলো যে তিনি কামকে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এক দিন

তিনি দেখতে পেলেন বলি পুত্র দৈত্য অপ্সরা তিলোত্তমাকে নিয়ে মনোরম উদ্যানে রমন করছেন। দৈত্য ও তিলোত্তমার রমন ক্রিয়া দেখে দুর্বাশার মনে প্রচণ্ড কামভাবের উদয় হলো। কিন্তু, তার বদ মেজাজের জন্য কেউ কন্যা দান করতে রাজী হলো না।

ঔর্ব্য ঋষির এক মানস কন্যা ছিলো তার নাম, ছিলো কন্দলী। কন্দলী ছিলেন অযোনী সম্ভূতা। ঔর্ব ঋষিও ছিলেন অযোনী সম্ভূত। ব্রহ্মা'র ঊরু থেকে জন্ম হয়ে ছিলো বলে ঋষির নাম হয় ঔর্বা।

ঔর্ব্য ঋষির মানস কন্যা কন্দলী এমন কলহ প্রিয়া ছিলেন যে ত্রিজগতে কেউ এই কন্যাকে বিয়ে করতে রাজী হলেন না অথচ কন্দলী রূপে ছিলেন অতুলনীয়া।

ঔর্ব্য ঋষি তার মানস কন্যা কন্দলীকে দুর্বাশা ঋষির কাছে নিয়ে এলেন দুর্বাশা ঋষিও তার বদ মেজাজের জন্য পাত্রী পাচ্ছেন না আর কন্দলী বদ মেজাজের জন্য স্বামী পাচ্ছেন না। তাই দুজন দুজনকে বিয়ে করতে রাজী হলেন। ঔর্ব্য ঋষি দুর্বাশার তপস্যার প্রভাবের কথা জানতেন। তাই কন্দলীকে সম্প্রদান করার সময় কন্দলীর অপরাধ ক্ষমা করার জন্য বার বার দুর্বাশাকে অনুরোধ করেন।

দুর্বাশা ঔর্ব্য ঋষির অনুরোধকে মর্যাদা দিয়ে কন্দলীর শত অপরাধ ক্ষমা করেন তার পরই শাপ দিয়ে ভস্মীভুত করেন। কন্দলী থেকেই কন্দলী বৃক্ষের জন্ম হয়।

ঔর্বা ঋষি নিজ কন্যার ভস্মীভুত হবার খবর পেয়ে ছুটে আসেন দুর্বাশার আশ্রমে। দুর্বাশাকে এই বলে অভিশাপ দেন যে হে দুর্বাশা, তুমি নিজের তপস্যার অহংকারে আমার সরল মেয়েকে ভস্ম করছে। তোমার তপস্যার অহংকার চুর্ণ হবে।

ঔর্ব্য ঋষির অভিশাপে দুর্বাশা ঋষি একবার অম্বরীশ রাজার কাছে নতজানু হয়ে ছিলেন আর একবার পাণ্ডব দের বন বাসের

সময় লজ্জিত হয়েছিলেন ।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন পাণ্ডবদের কাছে দুর্বাশা কি ভাবে লজ্জিত হয়েছিলেন ?

মহারাজ বলতে শুরু করলেন— দুর্বাশা ঋষি একবার রাজা দুর্যোধনের আতিথ্য গ্রহণ করে ছিলেন। দুর্যোধন স্বয়ং ঋষির সেবায় নিযুক্ত থেকে সেবায় ঋষিকে খুশী করেন। ঋষিবর যাবার আগে বললেন কুরুরাজ তোমার সেবায় আমি প্রীত হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা করো। দুর্যোধন বললেন - ঋষিবর, দ্রৌপদীর রাতের খাওয়া হয়ে গেলে আপনি সশিষ্য যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করবেন এই প্রার্থনা জানাই।

দুর্বাশা ঋষি মৃদু হেসে বললেন তাই হবে। তুমি অন্য বর প্রার্থনা করো।

দুর্যোধন বললেন ঋষিবর আমাকে জলের নীচে স্তম্ভন করে বাস করার মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বনবাসী পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য ষাট হাজার শিষ্য সহ যাত্রা করবেন।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন মহারাজ, দুর্যোধন দ্রৌপদীর রাতের খাবার হবার পর দুর্বাশাকে আতিথ্য গ্রহণের কথা কেন বললেন ?

মহারাজ বললেন সূর্যের বরে পাণ্ডবরা একটি অলৌকিক থালা অথাৎ হাঁড়ি লাভ করেছিলেন। এই হাঁড়িতে সামান্য কিছু রান্না করলেও তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের ভোজন সমাধা হতো। কিন্তু, দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গেলে সেদিনের মতো হাঁড়িতে আর কিছুই পাওয়া যেতো না। দুর্যোধন সে কথা জানতেন তাই দ্রৌপদীর রাতের খাবার হবার পর আতিথ্য গ্রহণের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

দুর্যোধন ভেবে ছিলেন রাত দ্বিতীয় প্রহরে ষাট হাজার শিষ্য সহ পাণ্ডবদের অতিথি হলে সামান্য সময়ের মধ্যে পাণ্ডবদের পক্ষে ষাট হাজার লোকের খাবার যোগার করা সম্ভব হবে

না। সূর্যের মহা ক্ষমতা সম্পন্ন থালিও কোন কাজে আসবে না। অভুক্ত দুর্বাশা তখন শাপ দিয়ে পাণ্ডবদের সর্বনাশ করবেন। কিন্তু দুর্যোধন ভুলে গিয়েছিলেন যে পাণ্ডবদের পক্ষে স্বয়ং মধুসূদন যেখানে রয়েছেন সেখানে তাদের কোন বিপদ হতে পারে না।

দ্রৌপদীর খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর দুর্বাশা যখন পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণ করে তাদের ক্ষুধায় কথা জানালেন তখন অতি বিনীত ভাবে যুধিষ্ঠির দুর্বাশা ঋষি এবং তার শিষ্যদের নদী থেকে সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে আসতে বললেন। এরই ফাঁকে তাদের খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে বলেও জানালেন।

দুর্বাশা চলে যাওয়ার পরই পাঁচ ভাই এবং দ্রৌপদী মহা ভাবনায় পড়লেন। ঘরে এক জনের খাবারও নেই। সূর্য উদয় হবার আগে সূর্যের থালি কোন কাজে আসবেনা। তাই দ্রৌপদী এবং পাঁচ ভাই সখা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগলেন।

ভক্তের স্মরণ মাত্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে পাণ্ডবদের কাছে এসে হাজির হলেন তিনি এসেই দ্রৌপদীর কাছে খাবার চাইলেন। দ্রৌপদী সজল চোখে নিজেই বিপদের কথা জানিয়ে কৃষ্ণকে রসিকতা বন্ধ করতে আবেদন জানালেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন — রসিকতা নয় তোমার হাড়িতে যদি এক কনা খাবার থাকে তবে তাই আমাকে দাও। দ্রৌপদী হাঁড়ি খোঁজে দুটি শাক আর ভাতের কণা পেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাই দিলেন। ভগবান সেই দুটি শাক আর ভাতের কণা মুখে দিয়ে বললেন আমি যেমন তৃপ্ত হলাম তেমনি সমস্ত জীব তৃপ্ত হউক। ভগবান একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যা কার্যে রত দুর্বাশাও তাঁর শিষ্যদের ঘন ঘন ঢেকুর উঠতে থাকলো। দুর্বাশা দেখলেন ফিরে এসে কিছূই খেতে পারবেন না তাই শিষ্যদের নিয়ে গোপনে চলে গেলেন।

পদ্মাবতী বললেন—মহারাজ, মুনির নাম কেন দুর্বাশা ঋষি হয়েছিলো কৃপা করে বলুন।

গোবিন্দানন্দজী বললেন—মা, সত্য, ত্রেতা দ্বাপর এই তিনটি যুগের মানুষ কলি যুগের মানুষের চেয়ে অনেক বেশী আয়ু লাভ করতেন। শুনেছি সত্য যুগে মানুষ ছিলো একুশ হাত লম্বা। মিথ্যের আশ্রয় সহজে কেউ নিতে চাইতেন না। ত্রেতা যুগে মানুষ ছিলো চৌদ্দ হাত লম্বা। দ্বাপরে সাত হাত। আর কলিযুগে সাড়ে তিন হাত।

দুর্বাশা ঋষি নামের ব্যাখ্যা করার আগে তোমাকে সত্যযুগের রেবতীর কাহিনী শুনাচ্ছি।

রেবতীর বাবা সম্রাট ছিলেন। নিজ কন্যার সুযোগ্য পাত্রের খোঁজে স্বর্গ. মর্ত, পাতাল ভ্রমণ করে কোথাও সুযোগ্য পাত্রের সন্ধান না পেয়ে পিতা ব্রহ্মার কাছে গেলেন রেবতীর পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে তা জানার জন্য।

ব্রহ্মা তখন অপ্সরাদের নাচ দেখছিলেন। অগত্য ঋষিকে কন্যা সহ ব্রহ্মার প্রমোদ কাননে অপেক্ষা করতে হলো।

নাচ গান শেষ হলে পর রেবতীর পিতা ব্রহ্মার কাছে কন্যার সুযোগ্য পাত্রের কথা নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা নিজ মানস পুত্রকে সান্তনা দিয়ে বললেন—রেবতীর যোগ্য পাত্র অচিরেই পাওয়া যাবে। সেই পাত্র বলরাম রূপে দ্বারকায় বিরাজ করছেন।

প্রজাপতিকে ব্রহ্মা বললেন—পুত্র, তুমি যতক্ষণ আমার এই ব্রহ্ম লোকে নাচ-গান শোনেছো সেই যঁাকে পৃথিবীতে তুমি যাদের জানতে চিনতে তাদের নিজেদেরও নয় এমন কি তাদের বংশ ধরদেরও দেখা পাবে না। সুতরাং তুমি সোজা দ্বারকাপুরে নিজ কন্যা সহ গিয়ে রাজসভায় বলরামের হাতে তোমার কন্যাকে, সম্প্রদান করার অভিপ্রায় জানাও।

রেবতী এবং তার বাবা সত্য যুগের মানুষ হওয়ায় তারা সকলেই ছিলেন যার যার হাতে একুশ হাত লম্বা। ব্রহ্ম লোকে অবস্থান করায় মাঝখানে যে প্রায় তিন যুগ শেষ হয়ে গেলো তাদের কাছে মনে হলো এক প্রহর বেলা শেষ হয়েছে।

একুশ হাত লম্বা একজন পুরুষ আর একজন নারী দ্বারকায় এলে সকল মানুষ তাদের দেবতা মনে করে দেখতে ছুটে এলেন। রেবতীর বাবা এবং রেবতী নিজেদের তুলনায় আকারে তিন ভাগের এক ভাগ আকৃতির মানুষ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। রেবতীর বাবা এবং রেবতীর মনেও গভীর হতাশার সৃষ্টি হলো। তবুও ব্রহ্মার কথা মতো রেবতীর বাবা রাজা উগ্রসেনের কাছে নিজ কন্যা রেবতীর স্বামী হিসেবে বলরামকে পেতে প্রার্থনা জানালেন। ব্রহ্মার অভিপ্রায়ের কথাও তিনি রাজা উগ্রসেনকে জানালেন

ব্রহ্মার অভিপ্রায়ের কথা শুনে রাজা উগ্রসেন এবং বাসুদেব বলরামের সঙ্গে একুশ হাত লম্বা রেবতীর বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হলেন।

বিয়ের বাসরে সাত হাত লম্বা বলরাম কী করে একুশ হাত লম্বা কনের গলায় মালা দেবেন একথা যখন সবাই মনে মনে ভাবছিলেন তখন বলরাম নিজ লাঙ্গল কনের কাঁধে রেখে সামান্য ঝাকুনি দিতেই একুশ হাত লম্বা রেবতী সাত হাত লম্বায় পরিনতা হলেন। সকলে তখন অবাক হয়ে বলরামের প্রশংসা করতে লাগলেন।

সত্য যুগের কয়েকজন ঋষির মধ্যে দুর্বাশাও ছিলেন অন্যতম তিনি তপস্যা বলে ইন্দ্রকে বার বার পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাকে সাক্ষাত শিবের অংশ বলে সকলেই জানতেন

সেই দুর্বাশা ঋষি কিছু দুর্বা একত্র করে পিষে একটি রুটির মতো বানিয়ে সারাদিনে একটি রুটিই আহার করতেন। দুর্ব্বা

দিয়ে তৈরী রুটিই তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতেন।

দুর্ব্বাশা ঋষির এই কৃচ্ছ্র আহার দেখে রাধারাণীর মনে খুব করুণার সঞ্চার হলো। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন আগামী একাদশীর পারণা গ্রহণ করতে দুর্ব্বাশাকে তিনি আমন্ত্রণ জানাবেন।

রাধারাণী দুর্ব্বাশা ঋষিকে খাইয়ে খুশী করার জন্য নিজ হাতে একশো আট প্রকারের ব্যঞ্জন রান্না করলেন যথা সময়ে দুর্ব্বাশা এলেন। রাধারাণী নিজ হাতে এক এক তরকারী পরিবেশন করে দুর্বাশাকে খাওয়ালেন।

রাধারাণী যখন দুর্বাশা ঋষিকে পারণা করানোর কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে বলেছিলেন দুর্বাশা ঋষি দুর্বা দিয়ে তৈরী একটি রুটি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না। সুতরাং একাদশীর পারণাও দূর্বা দিয়ে তৈরী রুটি দ্বারাই করতে হবে। দূর্বাশা ঋষি ভোজন বিলাশীর মতো এক এক তরকারী আলাদা আলাদা ভাবে অস্বাদন করায় দূর্বাশার ভোজন শেষে রাধারাণী জিজ্ঞেস করলেন — মুনিবর শুনেছিলাম আপনি দুর্বাঘাস দিয়ে তৈরী রুটি ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আজ আপনি ভোজন প্রেমীর মতোই বিভিন্ন ধরণের তরকারী স্বাদ গ্রহণ করেছেন দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি আশা করবো ভবিষ্যতে যদি কেউ আপনাকে ভোজন করাতে চায় তাহলে তাদের নিবেদিত জিনিষই আপনি গ্রহণ করবেন।

রাধারাণীর কথা শুনে দুর্বাশা ঋষি বললেন — দেবী আমি দুর্বা ঘাসের তৈরী রুটি ছাড়া কিছুই গ্রহণ করি না একথা অতি সত্য। আপনার এখানেও আমি কিছুই গ্রহন করিনি। আপনার ইচ্ছে পুরণের জন্য ভবিষ্যতে আমি ভক্তের সব জিনিষই গ্রহণ করবো।

রাধারাণী বিস্মিত হয়ে বললেন আপনি তো আমার সামনেই সব কিছু গ্রহণ করলেন।

দুর্বাশা মৃদু হেসে বললেন এই দেখুন রাধারাণী আপনার সব কিছু খাবার যেমনি ছিলো তেমনি রয়েছে।

দুর্বাশা একথা বলে— মুখ থেকে আলাদা আলাদা ভাবে একশো আট রকমের তরকারী এবং অন্ন বের করে দিলেন। রাধারাণী বললেন মুনিবর আমি খুব সাধ করে অপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনি সবকিছুই গ্রহণ করুন।

রাধারাণীর অনুরোধে দুর্বাশা ঋষি এবার সব কিছুই গ্রহণ করলেন। পরবর্ত্তী সময়েও কোন ভক্ত ভক্তি সহকারে যা নিবেদন করবেন তা গ্রহণের অঙ্গীকার জানিয়ে রাধারাণীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

দুর্বাশার কাহিনী শুনিয়ে গোবিন্দানন্দজী বললেন মা, আমাদের স্থূল জগতের চোখের শক্তি অত্যন্ত সীমিত দুর্বাশা ঋষি ছিলেন মহা শক্তিধর। হাজার হাজার বছর তিনি তপস্যা করেছেন। আমাদের কলি যুগের মানুষের সে শক্তিও নেই. আয়ুও বেশী নেই।

হাজার হাজার বছর ধরে মুনি ঋষিগণ না খেয়ে, না ঘুমিয়ে সমাধিস্থ হয়ে তপস্যা করেছেন। আমাদের কলির জীবের জীবনে একাধিকবার মাসব্রত গ্রহণের শক্তি নেই। আহারে সংযম পালন করে যেমন আমাদের কাম ক্রোধ নামক ছয় রিপুকে দমন করার চেষ্টা করা যায় তেমনি সাধনার দ্বারাও তা সম্ভব হয়। এই দেখনা পাখীরা খুদ কুরা খেয়েও সন্তান উৎপাদন করে। গরু ছাগল ঘাস লতা পাতা খেয়েও সন্তান উৎপাদন করে। মাছ জল, থেকে শেওলা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করেই বংশ বিস্তার করে আবার মাংসাসী হয়েও বছরে এক বারের বেশী সঙ্গমে লিপ্ত হয়না।

আমাদের দেহ রক্ত মাংস, মলমূত্র, অস্থি মজ্জা অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ তেজ, বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চভূতের সমন্বয়ে গঠিত এই শরীর প্রকৃতির দান। একাদশী তিথি থেকে অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা যে কোন তিথিতেই উপবাস পালন করা যায়। উপবাস শব্দের অর্থ কিছু না খেয়ে থাকা নয়, ভগবানের নাম নিয়ে ভগবানের ভাবনায় ভাবিত হয়ে দিন কাটানোর নামই উপবাস

আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে নিয়মের মাধ্যমে পদক্ষেপ বাড়ানো কর্তব্য। এমন একটি সময় আসে যখন নিয়ম কানুনের বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ রাখা যায় না। বাজিকর পুতুলকে যেমন নাচায় ভগবানও ভক্তকে ঠিক তেমনি ভাবে নিয়ে খেলা করেন।

কুবেরের মধ্যে রয়েছে সুপ্ত এক মহা ঐশীক শক্তি। সে শক্তির বিকাশ ঘটলে জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হবে। শিব ঠাকুর তাই আমাকে জোর করে তোমাদের এখানে টেনে নিয়ে এলেন। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের কুবের আবার একদিন তার নতুন রূপ নিয়ে ফিরে আসবে। কাল পারণা শেষে কুবেরকে নিয়ে আমি যাত্রা করতে চাই। কুবের মহাশক্তির মহাপুরুষ। মায়াজালে সে শক্তি ঢাকা পড়ে আছে। আমি ঈশ্বরের নির্দেশেই সেই মায়াজাল ছিন্ন করে দিতে চাই।

কুবেরকে তার মঙ্গলের জন্যই ছেড়ে দিতে হবে। কুবের আর কখনো মায়ের কাছে ফিরে আসবে কিনা সে কথা ভবিষ্যতই বলতে পারে। কিন্তু, সন্নাস নিলে কুবেরের আয়ু বৃদ্ধি পাবে এই আশাতেই যেন পদ্মাবতীর বুক হাহাকার করতে গিয়েও থেমে পড়ে।

গোবিন্দানন্দজী পদ্মাবতীকে বললেন— মা, তোমার এই সন্তান জগতের কল্যাণের জন্য জন্ম গ্রহণ করেছে সে কথা তো

তোমাকে প্রথমবারই বলেছিলেম। তোমার পরম সৌভাগ্য এক মহাপুরুষ তোমার সন্তানরূপে এসেছে। তুমি হাসি মুখে বিদায় না দিলে তোমার বিষাদ মাখা মুখ, তোমার দীর্ঘশ্বাস তোমার কুবেরের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবে। কাল পারণা শেষ হতেই আমরা যাতে যাত্রা করতে পারি তোমরা সে আয়োজন করো। তোমার কুবেরকে আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী রক্ষা করতে চেষ্টা করবো। তুমিতো জানো, মানুষ নিজের শক্তিতে কোন কিছুই করে উঠতে পারে না। অহংকার বশতঃ মানুষ আমিই সব করছি বলে মনে করে। যখন সে বুঝতে পারে তার সমস্ত শক্তির উৎসই ভগবান তখনই সে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তোমার কুবেরকে স্বয়ং ভগবানই রক্ষা করবেন। মাঝখানে আমি নিমিত্তের ভাগী মাত্র।

কুবের শুনেছে কাল গোবিন্দানন্দজীর সঙ্গে তাকে গৃহ ত্যাগ করতে হবে। খবর শোনা মাত্র আনন্দের ঢেউ যেন একের পর এক এসে তার ছোট্ট বুকে আছড়ে পড়ছে। ইন্দ্র তাপস, তমাল, মালতি কারোকথাই এই মুহূর্তে তার মনে এলো না। তার শুধু মনে হলো যদি একবার যাবার সময় হনুমানজীর দেখা পাওয়া যেতো!

রাতে অনাগত দিনের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কুবের। রাতে স্বপ্ন দেখে বিশালকায় হনুমানজী গদা কাঁধে কুবেরের কাছে এসে হাত জোর করে প্রণাম করে বলছে — প্রভু, আমায় কেন স্মরণ করেছেন? আপনি আমার লক্ষণ ঠাকুর। আপনি আমার বলরাম আমি ছায়ার মতোই আপনার সঙ্গে আছি। আপনি আদেশ করুন আমায় কি করতে হবে?

কুবের ঘুমের মাঝেই বলতে থাকে— হনুমানজী, তুমিও শ্রীরামচন্দ্রের সেবক, আমাদের মধ্যে তাই কোন প্রভেদ নেই। ত্রেতা যুগে তুমি আমার চেয়েও অনেক বেশী অসাধ্য সাধন করে

শ্রীরামের প্রিয় হবার সৌভাগ্য লাভ করেছো। বয়সেও তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়। তাই তুমিও আমার নমস্য, তোমাকে প্রণাম জানাই।

ত্রেতা যুগে লক্ষণ রূপে রামের সেবা করে যে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেছি দ্বাপর যুগে বলরাম হয়ে আমার সমস্ত আনন্দই মাটি হয়ে গেলো। শ্রীরাম আমাকে বড় বানিয়ে দিয়ে সেবা থেকে যেমন বঞ্চিত করেছে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম গ্রহণ করতে গিয়ে ত্রেতা যুগের কথা মনে করে আমি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়েছি। এ জন্মে যেন আমার তেমন অবস্থা না হয়।

হনুমানজী বললো - লক্ষণ ঠাকুর, শ্রীরামচন্দ্র কাকে নিয়ে কখন কিভাবে লীলা করেন তিনি ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না। আপনি আমার ছোট প্রভু! আপনি যেখানে যাবেন আমি ছায়া হয়ে আপনার সঙ্গে যাবো। আপনি যখন স্মরণ করবেন তখনি আমার দেখা পাবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে অর্জুনের সারথির কাজ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সারথি হওয়ায় আমিও রথের ধ্বজায় বিশ্বম্বর মূর্তিতে বিরাজমান ছিলাম। অর্জুন যখন গাণ্ডীবে টংকার দিতেন তখন আমিও হুংকার দিতাম। গাণ্ডীবের টংকার ও আমার হুংকার মিলিত হয়ে এমন এক ভয়াবহ শব্দের সৃষ্টি করতো যে শত্রু শিবির সেই হুংকারেই ভীত হয়ে পড়তো।

শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীরাম এবং লক্ষণই যে বলরাম রূপে দ্বাপরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আমি তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছি। আপনিই যে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণই যে সম্প্রতি শচী মাতার ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত।

কুবের শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কখন কোথায় শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেছেন, কে এই শচীমাতা, কার ঘরনী এসব কথা জিজ্ঞেস করতে যাবে ঠিক এই সময়েই

মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেলো। কুবের মনে মনে বললো— মা, তুমি ডেকে আমার যে কী ক্ষতি করে দিয়েছো তা বলা যাবে না।

আট বছরের মেয়ে কমলা। কমলার সঙ্গে কোনদিন খেলাও করেনি কুবের। কুবেরের সুন্দর চেহারা, সুন্দর চলার ভঙ্গি এবং সুমধুর গলার গান শুনে পাঁচ বছরের কমলা ঠাকুর্মাকে জিজ্ঞেস করতো ঠাকুর্মা, ছেলেটি কে গো ?

ঠাকুর্মা ঠাট্টা করে নাতনীকে বলতো— তোর বর। বড় হলে ঐ ছেলেটার সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে।

কমলা যখন সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে পুতুল খেলা করতো, তখন কেউ সাজতো ছেলের শাশুরী, কেউ মেয়ের শাশুরী, কেউ ছেলের মা, কেউ বা মেয়ের মা। শাশুরী এবং মায়ের অভিনয় করে ছোট্ট ছোট্ট কিশোরী মেয়েরা তাদের পুতুল ছেলে ও পুতুল মেয়ের বিয়ে দিতো।

কুবের মেয়েদের সঙ্গে খেলা না করলেও কমলা ও তার সঙ্গীরা কখনো কখনো কুবেরের খেলার সাথীদের কাউকে খেলার সাথী হিসেবে পেতো।

পুতুলের ঘর কন্না করতে গিয়েই সমবয়সী কিশোরী মেয়েদের কাছ থেকে বর কাকে বলে, বরের কাজ কি জানতে পেরেছিলো আর কুবেরই ভবিষ্যতে তার বর হবে এই ভেবে পাঁচ বছরের কিশোরী মেয়ের মনে ভাবী সংসারের যে চিত্র ফুটে উঠতো তাতে ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হতো কিশোরী কমলার মনে কুবের গভীর আসন পেতে বসেছে। জমিদার বসন্ত চৌধুরীর বাড়ীতে চন্দ্রগ্রহণের দিন যখন কুবের নাচতে নাচতে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলো সে সময় কমলার ঠাকুমার মুখে কুবেরের জ্ঞান হারানোর কথা শুনে কিশোরী কমলা কুবেরের জীবন নাশের আশঙ্কা করে নিজেও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো।

একচক্রা গ্রামের বকুল-পিসিকে সহমরণে যেতে হয়েছিলো

সাত আট মাস আগে। বকুল পিসির গায়ের রং যেমন কাঁচা হলুদের মতো ছিলো তেমনি মুখখানাও ছিলো। পূর্ণিমার চাঁদের মতোই স্নিগ্ধ ও কোমল। পাড়াতে বকুল পিসির মতো সুন্দরী আর একজনও ছিলো না। স্বাভাবিক ভাবেই বকুল পিসির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কিছু বিত্তশালী মুসলমান যুবক বকুল পিসির প্রতি লালসার হাত বাড়িয়ে ছিলো। চন্দ্রনাথ মিশ্র মেয়ের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান না পেয়ে বারো বছর বয়সেই পাশের গ্রামের মধু ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।

মধু ভট্‌টাচর্য্য বকুল পিসির আগেও আটটি বিয়ে করেছিলেন। বকুল পিসির আগে শান্তি নামে যে মেয়েটিকে বিয়ে করে অষ্টম বধু হিসেবে ঘরে এনেছিলেন তার বয়সও ছিলো মাত্র এগার বছর বয়স।

শান্তি বকুল পিসির মতো সুন্দরী না হলেও দেখতে একেবারে খারাপ ছিলোনা। শান্তির অবস্থাও মোটামোটি ভালো ছিলো। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের অভাবেই শান্তির বাবা ষাট বছরের মধু ভট্‌টাচার্যের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।

কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে একাধিক বিয়ে করা কোন দোষের ব্যাপার ছিলোনা। কোন কোন কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে উদ্ধার করাই যেন জীবনের একমাত্র পথ বলে বেছে নিয়েছিলো।

বকুল পিসির যখন বিয়ে হয় তখন কমলা সাত বছরের। আট মাস যেতে না যেতেই বকুল বিধবা হয়ে গিয়েছিলো

বিয়ের পর সাত আট মাসে বকুল পিসির সৌন্দর্য্য আরো বেড়ে গিয়েছিলো। মধু ভট্‌টাচার্যের ছেলেদের কেউ কেউ বিয়ে করেছিলো। তাদের স্ত্রীরা এবং বাকী সন্তানেরা সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করলো —বকুল পিসি বিধবা হয়ে ঘরে থাকলে রূপের আগুনে মুসলমানেরা ঝাঁপ দেবে। হিন্দু মুসলমানে শুরু হবে

কমলা শুনেছে বকুল পিসি প্রথমে কিছু না বললেও চিতা প্রদক্ষিণের সময় সহ মরণে যেতে আপত্তি করছিলো। সে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলো। জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু, সমাজপতিরা বকুল পিসিকে সে সুযোগ দেয়নি। চার পাঁচ জন শক্তিশালী যুবক বকুল পিসিকে জোর করে ধরে চিতা সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়ে হাত পা বেঁধে চিতায় এক প্রকার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো।

কুবের সন্ন্যাস হয়ে চলে যাবে শুনে কমলার মনে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিলো। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও অনেক সময় সহ মরণে যেতে হয় একথা কমলা জানে। কিন্তু, স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলে তখন স্ত্রীকে সমাজ কি দণ্ড দেয় তা কমলা জানে না কমলা মনে মনে ভাবছে এবার তাকেও হয়তো কোন কঠোর নিয়ম মেনে চলতে তার মা, বাবা, ঠাকুমা ঠাকুর্দা তাকে বাধ্য করবে কুবের যে তার ভাবী স্বামী একথা ঠাকুমা নিশ্চই অন্যদের কাছে বলে দেবে।

কুবের চলে যাবে শুনেই কমলার মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো সেই আতঙ্কেই চিৎকার করে বলতে থাকলো মা, আমার স্বামীকে তোমরা যেতে দিওনা, আমি তা হলে মরে যাবো। তোমরা আমাকে বাঁচতে দেবে না।

কমলার মা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো— তুই কি বক্‌ছিস কমলা? তোর তো বিয়েই হয়নি! তোর স্বামী আবার কে?

পদ্মাবতীর ডাকে ঘুম থেকে উঠে বসলো কুবের। মা তার কাছে এসে মাথায় চুমু খেয়ে বললেন বাবা, মোড়েশ্বরের কৃপায় তোকে পুত্ররূপে পেয়েছিলাম। জন্মের পর তোর মুখ দেখে যখন আনন্দ সাগরে ভাসছিলাম তখনই জানতে পারলাম

তোকে বেশীদিন ধরে রাখা যাবেনা। ধরে রাখতে গেলে হারাতে হবে। বাবা, তোর বার বছরের জীবনে আমি তোকে মায়ের সম্পূর্ণ স্নেহ ভালবাসা দিতে পারিনি বলে এই মুহূর্ত্তে খুব খারাপ লাগছে। তোর জন্মের পর ছোট ছোট ভাই বোনেরা এসে তোকে মাতৃ স্নেহ থেকে অনেকটা বঞ্চিত করে দিয়েছে। তুই যেখানেই থাকিস, যে অবস্থাতেই থাকিস, তোর অভাগিনী মায়ের আশীর্বাদ তোকে সর্বদা সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মুসলমান পাড়ায় মোরগ ডেকে উঠলো। কুবের বললো মা, তুমি, বৃথাই ভাবছো। সুমিত্রা কিংবা মা রোহিনীও আমায় যে আদর, ভালবাসা দিতে পারেনি তুমি তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছো

তুমিই আমার সুমিত্রা তুমিই আমার রোহিনী। তুমিই আমার মা পদ্মাবতী। তিন জন্মে আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তোমার তপস্যার সার্থকরূপ দিয়েছি। তুমি এবার স্নান সেরে অতিথি সৎকারের আয়োজন করো। আমিও প্রাতঃকৃত্ত সেরে সন্ধ্যা শেষ করি।

পদ্মাবতী ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন — বাবা সত্যিই যদি আমি সুমিত্রা আর রোহিনী হয়ে থাকি তা হলে জন্মে জন্মে কেন আমাকে পুত্রের বিরহে চোখের জল ফেলতে হচ্ছে? কী অপরাধ আমি করেছিলাম? লক্ষণ দাদার সঙ্গে চৌদ্দ বছরের বনবাস কাটাতে সুমিত্রাকে কাঁদিয়ে চলে গিয়েছিলো। কৃষ্ণ বলরাম রাজা কংসের আমন্ত্রণে দ্বারকায় সেই যে ধনুর্যজ্ঞে যোগ দিতে গিয়েছিলো তারা আর রোহিনীও যশোদার কাছে ফিরে আসেনি।

কুবের বললো – মা, সুমিত্রা এবং কৌশল্যা যশোদা এবং রোহিনী শক্তির সাক্ষাৎ অংশ বলেই পুত্র বিরহ সহ্য করতে

পেয়েছিলেন। দেবলোকের মহান কার্য সিদ্ধির জন্যই তারা এই শোক পেয়েছিলেন এ জন্মে তুমি যেমন পুত্র বিরহে কাঁদবে তেমনি শচী নামে আর এক মহিয়সী নারী যার গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে জানতে পেরেছি তিনিও তোমার মতোই ছেলের বিরহে কাঁদবেন। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছেন তা আমার জানা হলো না। এই খবরটি জানার জন্যই আজ থেকে আমার পথ চলা শুরু হবে। তুমি আশীর্বাদ করো মা আমি যেন কৃষ্ণকে খুব তাড়া তাড়ী খুঁজে বের করতে পারি।

গোবিন্দনন্দজী প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে ঠাকুরের নাম করতে শুরু করেছেন। এক্ষুনি মহেশ্বর এবং শংকরের বাল্য ভোগের আয়োজন করতে হবে। পদ্মাবতী মাথায় ঘোমটা টেনে ছেলেকে আর একবার চুমু খেয়ে বের হয়ে গেলেন। কুবেরও প্রাতঃকৃত্য সারতে বের হলো

জগন্নাথ, সনাতনী, বাসুদেব আর মাধব জানতে পেরেছে দাদা কুবের আজ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে চলে যাবে। মাধবের বয়স তিন বছর। সে সকলের ছোট্ট। সনাতনীর বয়স সাত।

সনাতনী বার বার মাধবকে বলছে ভাই, দাদা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে

দিদির কথা শুনে মাধব অবাক হয়ে দিদির মুখের দিকে তাকাচ্ছে। মাধব দেখেছে দাদা একা একা ঘুরে বেড়ায়। তাকে কচিত কখনো কয়েক মুহুর্তের জন্য কোলে নেয়। তবুও দাদা চলে যাবে শুনে মাধব অবাক হয়ে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ছোট ভাই এর অবাক্ হওয়ার ভাব লক্ষ্য করে সনাতনী আবার বলছে দাদা আর কোনদিন আসবে না।

জগন্নাথ আর সনাতনী কাঁদছে। জগন্নাথ দেখেছে দাদাকে পাড়ার সবাই ভালোবাসে। গ্রামের প্রতিটি পশুও যেন দাদাকে আপন করে নিয়েছিলো। সেই দাদা কুবের চলে যাবে। কথাটা

পাড়ায় প্রচার হতেই ভোরে হারু পণ্ডিতের বাড়ী লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো।

যে শীতল ঠাকুর মৌড়েশ্বরের মন্দির ছেড়ে বের হন না তিনিও সাত সকালে এসে হাজির হয়েছেন হারু পণ্ডিতের বাড়ীতে। তিনি কুবেরকে জড়িয়ে ধরে বললেন—বাবা, তোমার মধ্যে যে আমি একদিন মৌড়েশ্বরকে দেখেছি ! তুমি মন্দিরের পাশ দিয়ে যখন যাও তখন তোমার দিকে তাকিয়ে থেকে আমি দিব্য আনন্দ লাভ করি। তুমি চলে গেলে আমার আনন্দও চলে যাবে। শুনেছি সব কথা। তুমি যেখানে যাবে সেখানেই আনন্দের হাট বসবে। তুমি কবে ফিরে আসবে সেদিনের জন্যই আমি পথ চেয়ে থাকবো।

১৪১১ শকাব্দের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বেলা দ্বিপ্রহরে গোবিন্দানন্দজীর সঙ্গে ঘর ছেড়ে অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে দিব্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্যুযোগকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে, একচক্রানগরের সকল মানুষকে চোখের জলে ভাসিয়ে বার বছরের কুবের ধীর পায়ে এগিয়ে চলে।

সনাতনী মা পদ্মাবতীর পাশে দাঁড়িয়ে দুহাতে চোখের জল মুছে বার বার ডাকতে লাগলো —দাদা, তুই ফিরে আয়, ফিরে আয়।

ছেলের পাছে অমঙ্গল হয়, সাধনার বিঘ্ন ঘটে তাই ইষ্টের নাম জপ করে কুবেরের সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করে চোখের জলকে এবং মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছেন পদ্মাবতী। তবুও মাঝে মাঝেই মন ইষ্ট নাম ভুলে গিয়ে মেয়ে সনাতনীর মতোই চিৎকার করে বলতে চাইছে – কুবের ফিরে আয়, ফিরে আয়।

পাড়া পড়শীদের সঙ্গে কমলার ঠাকুর্মা কমলাকে নিয়ে এসেছিলো হারাই পণ্ডিতের বাড়ীতে কুবেরের বিদায় দৃশ্য দেখতে কমলা কুবেরের পা ছুঁয়ে একবার ছুট করে প্রণাম করায় চমকে উঠলো কুবের। তাকে কেউ প্রণাম করতে পারে এধারণা তার

ছিলো না। সনাতনী, জগন্নাথ, মাধব এরা তার ছোট হলেও কোনদিন তাকে প্রণাম করেনি।

কমলা কুবেরকে প্রণাম করে শাড়ীর আঁচলে দুচোখ ঢেকে কাঁদতে থাকায় পদ্মাবতী নিজের শোক ভুলে গিয়ে কমলার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করলো মা, কুবের আমার বড় ছেলে। ঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা জানিয়েছি। মৌড়েশ্বরের মন্দিরে কতবার গিয়ে ধর্ণা দিয়ে তবে কুবেরকে পেয়েছিলাম। সে চলে যাচ্ছে। অভাগিনী মা আমি। ছেলের অমঙ্গল হতে পারে বলে একটুও কাঁদছিনা তুমি কেন কাঁদছো মা?

কমলা পদ্মাবতীর কথার কোন উত্তর দিতে পারলো না। কান্নাও বন্ধ করতে পারলো না। কমলার ঠাকুরমার চোখে জল এলো এবার। বললো— পদ্মাবতী, নাতনীর সঙ্গে ঠাট্টা করতে গিয়ে যে কত বড় অন্যায় করে ফেলেছি তা সে সময় বুঝতে পারি নি। কয়েক বছর আগে কোন এক দিন ঠাট্টা করে নাতনীকে বলেছিলাম কুবের তার বর। সে কথাটা কমলা যে গভীরভাবে নেবে তা ভাবতেই পারিনি। এখন একে বাঁচানোই কষ্ট হবে দেখছি। আমার বকুলকে অকালে সমাজের নির্মমতার কাছে বলি দেবার পর কমলার মুখ চেয়েই মেয়ের শোক ভুলতে চেষ্টা করছিলাম। কমলার মাঝেই আমি আমার ছোটবেলার বুকলকে খুঁজতে চেষ্টা করতাম। কমলা তাই, আমার কাছে মেয়ে বকুলের চেয়েও প্রিয়। গতকাল থেকেই কমলা কুবেরের জন্য এমন সব কাণ্ড করছে যে ওর ব্যাথায় ব্যাথিত হয়ে আমারও বুক ব্যাথায় ভরে উঠছে।

পদ্মাবতী এবার কমলাকে নিজের বুকে টেনে নিলো। গোবিন্দানন্দজী কুবেরকে নিয়ে জোর পুকুরের পাড় দিয়ে মৌড়েশ্বর মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। হয়তো তারা এতক্ষণে মৌড়েশ্বরের মন্দিরে পৌঁছে গেছেন। পদ্মাবতী যায় নি। সনাতনী

জগন্নাথ কুবেরের বাবা এবং আরো অনেক প্রতিবেশী গেছেন মৌড়েশ্বরের মন্দিরে।

মৌড়েশ্বরের মন্দিরে কুবের প্রণাম করে উঠতেই শীতল ঠাকুর মৌড়েশ্বরের আশীর্বাদ কুবেরের হাতে দিয়ে বললেন— বাবা, আমি জানি তোমার মাঝে লুকিয়ে আছেন এক মহাত্মা। মৌড়েশ্বরের আশীর্বাদে সেই মহাত্মার বিকাশ যেন শীগ্‌গীর প্রকাশ পায় আমি সেই আশীর্বাদই করছি। তুমি যেদিন ফিরে আসবে সেদিন হয়তো আমি থাকবো না কিন্তু, আমি দেখতে পাচ্ছি সেদিন দিব্য আলোতে সারা বাংলার আকাশ স্বর্গ শোভা লাভ করবে।

গোবিন্দানন্দজীর শিষ্য পূর্ণানন্দকে বললেন— পূর্ণানন্দ আমরা প্রথমে বক্রেশ্বর যাবো। বক্রেশ্বর শক্তি পীঠই শুধু নয় শিবঠাকুরেরও পরম প্রিয় স্থান। বক্রেশ্বর হবে ভাবো বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথে গিয়ে আমার আশ্রমে কুবেরের ব্রহ্মচৈর্য্য দীক্ষা হবে। তার নতুন নামকরণ হবে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত পথ চলে কোন এক মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাবে।

বার বছর বয়স হলেও কুবেরকে পূর্ণ যুবকের মতোই দেখায় গায়েও যথেষ্ট শক্তি আছে। গোবিন্দানন্দজীর সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে বিন্দুমাত্র কষ্ট বোধ করলো না কুবের। বরং এতদিনের জীবনকে বন্দী জীবন বলে মনে হলো। মুক্তির স্বাদ লাভ করে মন তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভোগ করতে করতে এগিয়ে চললো।

বসন্তের মধ্যভাগে গ্রাম বাংলার মাঠে মাঠে সরষে ফুলের হলুদ আভা সূর্য্যোরবিদায়ী সোনালী আভার সঙ্গে মিশে প্রকৃতিকে যেন সোনায় ভরিয়ে দেয়। সরষে ফুলের গন্ধের তীব্রতা কুবেরের কাছে অসহ্য মনে হলো। সরষে ক্ষেতের পাশে পাশে কোথাও লংকা কোথাও মিষ্টি আলো, কোথাও দেশী ও বিদেশী বেগুনের ক্ষেত পেড়িয়ে এক বিষ্ণু মন্দিরে এসে থামলেন গোবিন্দানন্দজী।

গোবিন্দানন্দজীর হাতে লোহার একটি মোটা শলাকা। নীচের দিকটা বর্শার মতো ধারালো, আর গোড়ার দিকে লোহার বৃত্তকে কেন্দ্র করে চারটে শেকলের বৃত্ত। শলাকা একটু নড়লেই নূপুরের আওয়াজের মতো আওয়াজ বের হয়। সঙ্গে একটা বড় শঙ্খ।

গোবিন্দানন্দজী নাট মন্দিরে গিয়ে শঙ্খে ফু দিলেন। তারপর এগিয়ে অষ্ট ধাতুর তৈরী প্রায় দু-হাত উচু চতুর্ভুজ নারায়ণকে প্রণাম জানালেন।

পূর্ণানন্দ একটা কম্বল বিছিয়ে, কম্বলের উপর বড় একটা কৃষ্ণসার হরিণের ছাল বিছিয়ে গুরুর বসার জায়গা করে দিলেন।

কুবেরের মনে হলো পাশেই যে বিশাল দীঘি খনন করা হয়েছে তার অর্দ্ধেক মাটি দিয়ে দীঘির পাড় তৈরী হয়েছে আর অর্ধেক মাটি দিয়ে ছোট্ট গোবর্ধন পাহাড় তৈরী করে বিষ্ণু মন্দির স্থাপিত হয়েছে।

গোবিন্দানন্দজীর শঙ্খের শব্দ অনেক দূর অব্দি পৌছেছিলো। সন্ন্যাসী এবং সাধুর শঙ্খ বাজিয়েই প্রথমে তাদের আগমন বার্তা পাশাপাশি লোকালয়ের কাছে পৌছে দেন। মেয়েরা এবং গৃহবধুরা সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে উলু ধ্বনি দিয়ে প্রতিবেশীর কাছে তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেন।

বিষ্ণু মন্দিরে পেছনেই টালির ছাউনি দেওয়া দু চালা। একটি দালানে পুরোহিত এবং সাক্ষাযাকারী বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বেলা পড়ে গেলেও মন্দিরের কাঠের দরজা তখনো সম্পূর্ণ খোলা হয়নি। শেকল দিয়ে এমনভাবে দুটো দরজাকে তালাবন্দি করে রাখা হয়েছিলো যাতে ভগবান দর্শন করা যায় কিন্তু, কোন মানুষ মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে না পারে।

পূজারী উঠে এসে জটাকুটধারী পাঁচজন সন্ন্যাসী একজন যুবক ব্রহ্মচারী আর একজন যুবককে দেখতে পেলেন।

পুরোহিত নমো নারায়ণায় বলে গোবিন্দানন্দজী এবং অন্যদের উদ্দেশ্যে হাত জোর করে প্রণাম জানালেন। তারাও সবাই নমো নারায়ণায় বলে প্রত্যোত্তর দিলেন।

ইটে বাঁধানো নাট মন্দির পুরোহিত মন্দিরের দরজা খোলে ছোট্ট একটা কাপড়ের তৈরী আসন বের করে এনে গোবিন্দানন্দজীর কাছে বসে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

গোবিন্দানন্দজীর মূল আশ্রম হরিদ্বারের কাছে। কুম্ভ মেলা উপলক্ষে যখন আশ্রম থেকে বের হন তখন অনেক সময় অনেক সাধু ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘোরার সিদ্ধান্ত নেন। গোবিন্দানন্দজীও কুম্ভ মেলা শেষে ভারতের তীর্থ সমূহ দেখতে বের হয়েছিলেন গঙ্গাসাগর মেলা শেষে এক চক্রাগ্রাম হয়ে বৈদ্যনাথে নিজের আশ্রম দর্শন করে হরিদ্বার ফিরে যাবেন।

সূর্য ডুবতে বসেছে কিন্তু রৌদ্রের আলো বিন্দুমাত্র কমে নি। এমন সময় দীঘির পারে জটলা শোনা গেল। চার পাঁচ জন লোক দশ বার বছরের একটি ছেলেকে বেদম প্রহার করছে।

পুরোহিত সেবককে বললেন — দেখতো কি হয়েছে? গোবিন্দানন্দজীও মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীকে বললেন — তুমিও দেখে এসো ছেলেটাকে মারছে কেন? কুবের তুমিও যাও

মোহনানন্দ ও কুবের প্রায় দৌড়ে দীঘির পাড়ে গিয়ে চিৎকার করে বললো — মারা বন্ধ করো।

একজন মোটা সোটা লোক বললো — তুমি কে হে? দেখে তো মনে হয় বাইরের লোক। স্থানীয় ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছো কেন বাবা? অন্যায় করলে মারবো না চুমো খাবো?

মোহনানন্দ বললেন — আগে ওকে ছাড়ো। ও কি অন্যায় করেছে? অন্যায় করলে বিচারের জন্য নিশ্চয়ই জমিদারের কিংবা বাদশার লোক রয়েছেন? তোমরা হাতে আইন তুলে নিয়েছো কেন?

খেয়ে উপস্থিত গ্রামের লোকদের বললো — আমার যদি জাত গিয়ে থাকে তা হলে এই লোকটিরও এই মুহূর্তে জাত গেলো। কি বলেন আপনারা ?

উপস্থিত পাঁচজন লোকই এক সঙ্গে বলে উঠলে হ্যাঁ, এই লোকটিরও জাত গেছে।

কুবের এবার স্বাস্থ্যবান যুবকটিকে জাপ্‌টে ধরলো। শরীরের আয়তনের সঙ্গে তুলনা করলে যুবকটির কাছে কুবেরের শক্তি নেহাতই নগণ্য তবুও যুবকটির মনে হলো নরম দুটো হাতের বাঁধন যেন মরণ ফাঁসে পরিণত হয়ে তাকে পিষে মারতে চাইছে। কুবের যুবকটির বল প্রদর্শন সত্বেও ঠোঁটে ঠোঁট রেখে সঙ্গীদের বললো এই লোকটিরও আমি ধর্ম নাশ করে দিলাম।

কুবেরের কাণ্ড দেখে ভীত হয়ে বাকী চার যুবক দৌড়ে পালালো আর হরিহর ও যুবকটি মাথায় হাত দিয়ে বিমর্ষ হয়ে দীঘির পাড়ে বসে পড়লো।

ব্রহ্মচারী কুবেরের এই কাণ্ডের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলোনা। কিন্তু, মন্দিরের সেবক এবং গ্রামের স্বাস্থ্যবান যুবকটি অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়ে যাওয়ায় মনে মনে খুশী হলো। এই গ্রামের এই দুজনই গ্রামের মানুষকে কুসংস্কার থেকে প্রকৃত সত্যের পথ দেখাতে পারে।

ব্রহ্মচারী দুজনের গায়ে হাত দিয়ে বললেন তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই ভাই। একজন আর এক জনের দিকে চেয়ে দেখো তোমাদের জাত যায়নি। তোমাদের অহংকারের বিনাশ হয়েছে মাত্র। দীঘির জলের দিকে চেয়ে দেখো দীঘির জল তেমনি আছে। মন্দিরে চলো। আমাদের জন্য অন্যেরা অপেক্ষা করছেন।

কুবের ঝটকা মেরে ব্রহ্মচারীকে সরিয়ে দিয়ে বুক উঁচু করে দীঘির দিকে তাকিয়ে রইলো।

গোবিন্দানন্দজী কুবেরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন তার মধ্যে কোন দেবতার আবেশ হয়েছে তাই তিনি ব্রহ্মচারীকে বললেন—মোহনানন্দ, ঈশ্বর হয়তো একে দিয়ে এই মন্দিরে কোন লীলা করাতে চান। আমাদের দর্শক হওয়া ভিন্ন আর কোন পথ নেই, চিন্তা করোনা ওর কোন ক্ষতি হবে না।

কুবের হঠাৎ করে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—হনুমানজী হনুমানজী, তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে এসো। আজ আমরা রাক্ষস বধ করবো।

গোবিন্দানন্দজী কুবেরের দুটো হাত ধরে জোরে ঝাকুনি দিয়ে বললেন—কুবের এমন কাজ করো না যাতে যুগের মাধুর্য নষ্ট হয়। তুমি কে আমি তা জানি। কিন্তু, কলিতে তোমার সেই লীলা মাধুর্য নষ্ট করে দেবে। তোমাকে স্মরণে রাখতে হবে এটা কলিযুগ ত্রেতা কিংবা দ্বাপর নয়। তুমি শান্ত হও, আমি মানুষকে শান্ত করার চেষ্টা করি।

গোবিন্দানন্দজী নাট মন্দিরে দাঁড়িয়ে অস্ত্র হাতে ছুটে আসা লোকদের প্রতি ডান হাত তুলে স্বস্তিক মুদ্রা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত মানুষের দল থমকে দাঁড়ালো। কয়েকজন চেঁচিয়ে বললো—গ্রামের ক্ষতি যে করেছে তাকে আমরা চরম শাস্তি দেবো। কয়েকজন চীৎকার করে বলে উঠলো—মুচির ছেলেকে যে বামুন বুকে টেনে নিয়েছে তাকে মার!

গোবিন্দানন্দজী বললেন— বাবা তোমরা মারবে কাকে? যে চান করেছে সেও অবুঝ আর যে তাকে আলিঙ্গন করেছে সেও অবুঝ। ওরা জানে না ভগবান সকল মানুষের প্রতি সমান অধিকার দান করলেও মানুষ মানুষকে সমান অধিকার দিতে রাজী নয়।

আমরা ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন সূর্য বন্দনা করি। সূর্য ভগবান বিষ্ণুর এক অংশ। তিনি তার কিরণ দ্বারা মানুষকে পাপমুক্ত করেন। আমরা মুচির ছেলেকে বুকে নিতে কুণ্ঠাবোধ

করলেও সূর্য্যদেব কিন্তু সকল জীবকেই সস্নেহে বুকে টেনে নেন। সূর্য্যালোকে দাঁড়িয়ে দেখুন, সূর্য্য আপনাকে যেমন কিরণ দান করবেন এই মুচির ছেলে সুবলকেও সেই একই কিরণ দান করবেন। সূর্য্য মুচি মেথরকে কিরণ দান করলেও আমরা তো সূর্য্যকে অপবিত্র বলিনা? চন্দ্রও আমাদের সবাইকে কিরণ দেয়, পবন দেব বাতাস দিয়ে সবাইকেই বাঁচিয়ে রাখছেন। চন্দ্র সূর্য্য পবন তারা যদি অপবিত্র না হন তাহলে মুচি মেথরের ছোঁয়ায় গঙ্গাদেবী কেন অপবিত্র হবেন? বাবা সকল, ভগবান শঙ্করাচার্য্য লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে এনেছেন এদের মধ্যে মুচি মেথর সবই রয়েছে।

আমাদের দেহ পঞ্চভূতের তৈরী। ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী, অপ অর্থাৎ জল, তেজ অর্থাৎ আলো, বায়ু অর্থাৎ পবন, আকাশ অর্থাৎ মহাব্যোম এই পাঁচটি উপাদান দিয়ে গঠিত। প্রকৃতিদেবী আমাদের মুচি মেথর ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় এসব করে পাঠাননি। জন্মসূত্রে আমাদের জাতির পরিচয় দান করা হয়। কিন্তু আমাদের ধর্মে জন্মসূত্রে নয়, কর্ম্মসূত্রে বর্ণ ভাগ করা হয়েছে।

আমাদের কর্মকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যারা যাগ-যজ্ঞ পূজা পার্বন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখছেন, যারা জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করছেন তারাই ব্রাহ্মণ। যারা সমাজকে শত্রুর হাত থেকে, অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন তারা ক্ষত্রিয়। যারা সম্পদ সমূহের সদব্যবহার করছেন তারা বৈশ্য এবং যারা সম্পদ সৃষ্টি করছেন এবং সমাজের সেবা করছেন তারা শূদ্র নামে অভিহিত হন।

সেবা ধর্মের এক বিরাট কাজ। যারা যে সমাজের সেবা করেন তারাও ঈশ্বরের কাজ করেন। সুতরাং শূদ্ররা কোন অংশেই সমাজে অবহেলিত বলে গণ্য হতে পারেন না। ভগবান যদি মুচির ঘরে যেতে পারেন, দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে যেতে পারেন আমরা কেন শূদ্রকে ঘৃণা করবো? ভগবান-তো আমা-

দের শিক্ষার জন্যই ঐসব লীলা করে গেছেন।

মহামুনি কৈশ্যপ ঋষি থেকেই তো মানব জাতির সৃষ্টি। আমাদের সৃষ্টি কর্তাতো একজনই। কর্ম আমাদের এক এক জন থেকে পৃথক করে রেখেছে মাত্র। আপনারা শান্ত হউন। ভগবানের সৃষ্টিকে ঘৃণা না করে পরম যত্নে ভালবাসা ও প্রেমদান করুন।

উত্তেজিত জনতা গোবিন্দানন্দজীর কথায় কান না দিয়ে মার মার করে এগিয়ে এসে কুবের ও সুবল দাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গোবিন্দানন্দজী এমন ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভেবেছিলেন উত্তেজিত জনতা তার শাস্ত্রের কথা শুনে শান্ত হবে।

কুবের নিজের শরীর দিয়ে সুবলকে আড়াল করে রাখায় কয়েকটা লাঠির ঘা কুবেরের মাথায় পড়লো। মাথার একটা অংশ দিয়ে জলের ধারার মতো রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো এমন সময় আক্রমন কারীদের উপর কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাদেরই লাঠি পেটা করতে লাগলো।

আক্রমন কারীদের অনেকেই পালিয়ে গেলো আর যারা পালাতে পারলো না তাদের ঘাড় ধরে কুবেরের পায়ে এনে ফেলে বললো-ছেলেটার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

গ্রামবাসীরা অপরিচিত সশস্ত্র লোক দেখে অবাক্ হয়ে গেলো। অবাক্ হয়ে গেলেন কুবের ও গোবিন্দানন্দজী। একজন লোক কুবেরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো বাবা গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যদি অন্যায়ের প্রতিকার করার ক্ষমতা না থাকে তা হলে প্রতিবাদ করতে যেওনা আর যদি অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পারো তা হলে অবশ্যই করবে। কলির প্রভাবে মানুষ জ্ঞান শূন্য হয়ে অজ্ঞানের মতো কাজ করবে। ভবিষৎ পুরাণে বলা হয়েছে কলিতে শূদ্রের প্রাধান্য

দেখা যাবে। আজ বর্ণ হিন্দু নামধারী মানুষ শূদ্রের উপর অত্যাচার করছে বটে কিন্তু এমন দিন সামনে আসবে যখন বর্ণ হিন্দুরাই শূদ্রের সামনে নতজানু হয়ে করুণা প্রার্থনা করবে। আমরা চলি। জয় শ্রীরাম।

জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনেই চমকে উঠলো কুবের। এরা আর কেউ নয়, হনুমানজী স্বয়ং মানুষের বেশ ধারণ করে দল বল নিয়ে এসে মানুষের আক্রমন থেকে কুবেরকে রক্ষা করেছেন।

দেখতে না দেখতেই মাঠের উপর দিয়ে মানুষগুলো কর্পূরের মতোই উড়ে গেলো। গ্রামের যে সব মানুষ কুবেরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো তারা জিজ্ঞেস করলো — ঠাকুর, ওরা কারা ? আপনাদের গ্রামের লোক ?

কুবের বললো— না, ওরা ভগবানের দূত। শ্রীরাম চন্দ্রের দাস। আপনারা আমাদের গুরু দেবের কথা স্মরণ রেখে মানুষ মানুষকে ভালো বাসতে চেষ্টা করুন। ভগবান শংকরাচার্য হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি সে সময় আবির্ভূত না হলে এত দিনে হিন্দু ধর্মও বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়তো এই পুণ্য ভূমি ভারত থেকে।

ভগবান বিষ্ণু মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে। গ্রামের বেশ কিছু মানুষ আসায় নাট মন্দিরে তিল ধারণের জায়গাও আর খালি নেই। সকলের সঙ্গে সুবলও বসে আরতি দেখছে। পুরোহিত প্রথমে পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে হাত নেড়ে ঠাকুরের সামনে আরতি করলেন বড় একটা শঙ্খে জল ভরে আরতি করলেন। তারপর ক্রমে ফুল, চামর, পাখা, ইত্যাদি দিয়ে ঠাকুরের আরতি শেষ করে ভজন আরতি গেয়ে সকলকে প্রসাদ দিলেন।

সুবল জন্মের পর এই প্রথম মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ

পেয়েছে। তারা দু-একদিন বিশেষ বিশেষ উৎসবে প্রসাদ নিতে এসে মন্দিরের বাইরে তাদের সমাজের মানুষের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে। বড় মাটির হাঁড়িতে প্রসাদ এনে দিয়ে সেবক বলেছে তার সমাজের কোন লোকেই পরিবেশন করে দিতে।

নারায়ণ যদি সত্যি সত্যিই সকলের জন্য সমান অধিকারের কথা বলে থাকেন তা হলে তাদের সমাজকে কেন পূজোপার্বন থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

সুবলের বাবা কয়েকজনকে নিয়ে উদগ্রীব হয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলো। এক দফা মারামারি হবার পর তারা সবাই ছেলের ক্ষতদেহ নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু, ছেলের কোন খোঁজ না পেয়ে সুবলের বাবা আরো শংকিত হয়ে পড়লো। ভাবলো ছেলেকে হয়তো সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে কোন কঠিন কঠোর উপায়ে হত্যা করার জন্য।

প্রসাদ বিতরণের সময় সুবল একবার মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলো চার পাঁচজন লোক আঁধারে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে একবার সুবলের বাবা চেঁচিয়ে ডাকলো। সুবল, সুবলরে ? সুবল প্রসাদ হাতে নাট মন্দিরের একপাশে এসে উত্তর করলো বাবা, আমি এখানে। আজ আমার কী আনন্দ। নারায়ণের মুর্তি দর্শন করছি। আরতি দর্শন করেছি। পুরোহিত স্বয়ং আমাকে প্রসাদ দিয়েছেন। তোমরাও এসোনা বাবা।

সুবলের বাবা চিৎকার করে বললো-বাপু তুই চলে আয়। আজ তোকে ছেড়ে দিলেও কাল কিংবা পরশু সুযোগ পেলেই প্রাণে মেরে ফেলবে। আমরা, যে নীচু জাত। আমাদের মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নেই। আমাদের সকলের সঙ্গে চলাফেরা করার অধিকার নেই। পাছে আমাদের কেউ ছুঁয়ে

ফেলে এজন্য আমাদের গলায় ঘন্টা বেঁধে রাস্তায় চলতে হয়। আমাদের মন্দির দেখার দরকার নেই। বাপু নারায়ণকে আমরা এখান থেকেই নমস্কার জানিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি আমাদের মতো নীচু জাতের লোকদের যেন ভগবান এই পৃথিবীতে দুঃখের বোঝা মাথায় নিতে আর কখনো না পাঠান।

পুরোহিত এবার ওদেরও ডাকলেন। বাবা তোমরাও এসো। আমিও সাধারণ মানুষের পাল্লায় পড়ে ভগবানের বিধানকে ভুলে গিয়ে তোমাদের ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম। আমাদের অহেতুক গোঁড়ামির জন্যই নিম্নবর্ণের বহু মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। এসো, প্রসাদ নিয়ে যাও। কাল থেকে এই মন্দির তোমাদের সকলের জন্যই খোলা থাকবে। জমিদার বাবু আশা করি এই কাজে বাঁধা দেবেন না।

গ্রামের নাম তারাপুর। সামান্য দূরেই রয়েছে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ট দেবের সাধন পীঠ। এই স্থানেই মহর্ষি বশিষ্ট তারা মায়ের গুহ্যরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারা মায়ের গুহ্যরূপটি হলো সাগর মন্থনে উত্থিত বিষ পান করা শিবকে সুস্থ করে তুলতে আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্তনা দান।

গোবিন্দানন্দজী বললেন -- তারা পীঠ থেকে বক্রেশ্বর হয়ে তারা গয়ার পথে যাত্রা করবেন।

গ্রামের মানুষ গোবিন্দানন্দজীকে অনুরোধ জানালো আগামী দু'দিন এই মন্দিরে দয়া করে থেকে যেতে। ভগবান সকলের জন্য। মন্দির সকলের জন্য। এই যে নতুন নূতন কথা তিনি শুনিয়েছেন তার জন্য গ্রামের সকল মানুষ একদিন উৎসব পালন করতে চায়। মানুষ মানুষের যার যার প্রয়োজনে বিভিন্ন কর্ম করবে। মন্দিরে এসে কাজের পর সকলেই সকলের কুশল বিনিময় করে সমবেত ভাবে উপাসনা করবে এজন্যই তো দেবালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের একটি অংশকে, সমাজের এক একটি অংশকে যদি মহান কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা

হয় তা হলে যে ভগবানও দূরে সরে যাবেন।

একজন গ্রামবাসী বললো পুরোহিত ঠাকুর, মহামান্য অতিথিদের সেবার জন্য যদি আমাদের কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় বলুন আমরা সব করতে রাজী আছি

পুরোহিত বললেন নারায়ণের ইচ্ছায়, তোমাদের সহায়তায় নারায়ণের ভাণ্ডারে স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজ করেন আজ রাতে তোমাদের কোন কষ্টের প্রয়োজন হবে না। তোমরা যাও।

ভোর না হতেই জনতার ঢল নামলো জমিদার বাড়ীতে। তাদের যে বিরাট প্রাপ্তি ঘটেছে তার জন্য তারা উৎসব করতে চায়। গোবিন্দানন্দজী উপস্থিত মানুষকে বললেন— হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলমান শাসকগণ তাদের ক্ষমতা চিরকালের জন্য কায়েম রাখতে চায়। মুসলমান শাসকদের আগমনের আগে মন্দির তো সকলের জন্যই খোলা ছিলো। এখন নিম্নবর্ণের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ হলো কেন? কারণটা আর কিছুই নয়, উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ করে পুরোহিত সম্প্রদায়কে অর্থ দিয়ে হাত করে নিম্নবর্ণের মানুষদের বিশাল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে হিন্দুস্থানে মুসলমানগণ যেমন কাজের লোক পাবে তেমনি নিম্নবর্ণের মানুষদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করা যাবে।

গোবিন্দানন্দজীর উপদেশ মন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। গ্রামের মানুষ বুঝতে পেরেছে বিদেশী সংখ্যালঘু মুসলিম শাসকগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে বর্ণের দোহাই দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে হিন্দুদের শক্তি কমাতে না পারলে, ইসলাম ধর্মে হিন্দুদের দীক্ষিত করে ভারতে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারলে মুসলমানদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিন্দুদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

চৈত্র মাস। চারদিকেরই ফসলের জমি ফসল শূন্য। জমির মাটি খরায় ফেটে চৌচির হয়ে আছে। চাতক পাখী

যেমন এক ফোঁটা জলের জন্য মাঝে মাঝে আকাশে উড়তে উড়তে মেঘ দে মেঘ দে বলে চিৎকার করে ঠিক তেমনি ভাবেই ধরিত্রী, গরু, মোষ, মানুষ সকলেরই ঈশ্বরের কাছে একই প্রার্থনা মেঘ দে, মেঘ দে।

ফসল হীন বিশাল ক্ষেতে শুরু হয়েছে উৎসব। হরিনাম কীর্ত্তন করে গ্রামের সকল স্তরের মানুষ ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করে আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরে গেলো। জমিদার বাড়ীর অনেকেই জমিদারের প্রতিনিধিরূপে উৎসবে অংশ গ্রহণ করে সুষ্ঠু, ভাবে উৎসব সম্পন্ন করতে সহায়তা করলো।

গোবিন্দানন্দজী পুরোহিতকে আলিঙ্গন করে গ্রামের মানুষকে আশির্বাদ জানিয়ে শিষ্যদের নিয়ে যাত্রা করলেন তারা পীঠের উদ্দেশ্যে।

এই পীঠস্থান বশিষ্ট দেবের পর থেকেই কোন না কোন সাধক রক্ষা করে আসছেন। একান্ন পীঠের এক পীঠ না হলেও মহর্ষি বশিষ্টের সাধনায় সিদ্ধ পীঠে পরিণত হয়েছে। পাশেই রয়েছে শিব মন্দির ও বিষ্ণু মন্দির।

চৈত্রমাস বলে দ্বারকা নদীতেও হাঁটু জলের কম। বশিষ্ট মুনি যে স্থানে সাধন করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে তার উপর টালী দিয়ে চার চালা ছোট্ট একটা ঘর তৈরী করা হয়েছে। পাশেই ঘরের দু চালা ঘরে এক সাধু থাকেন। গোবিন্দানন্দজী এই সাধুর পরিচিত। গোবিন্দানন্দজী মহাপুরুষ তাই সাধুজী গোবিন্দানন্দজীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বিষ্ণু মন্দিরের পুরোহিত, শিব মন্দিরের পুরোহিত এসে যোগ দিলেন সাধুসেবায়। দুপুরে বশিষ্ট দেবের কাছে ভোগ নিবেদন করে সকলেই প্রসাদ পেলেন।

বশিষ্ট দেবের সাধন পীঠ যে সাধু মহারাজ রক্ষা করছিলেন তার নাম জীবন চৈতন্য ভারতী। তিনি শৃঙ্গেরী মঠের সন্ন্যাসীর

কাছ থেকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেছিলেন। শৃঙ্গেরী মঠে যারা দীক্ষা নিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তাদের ব্রহ্মচর্য উপাধী হলো চৈতন্য। জ্যোতি মঠের শাখায় যারা ব্রহ্মচর্য পালন শুরু করেন সে সমস্ত ব্রহ্মচারীদের উপাধী আনন্দ। সন্ন্যাস উপাধী গিরি, পর্বত ও সাগর।

শৃঙ্গেরী মঠের সম্প্রদায়কে বলে— ভূমিবার। গোবর্ধন মঠের সম্প্রদায়ের নাম – ভোগবার জ্যোতি মঠের সম্প্রদায়ের নাম — আনন্দবার আর সারদা মঠের সম্প্রদায়ের নাম কীট্‌বার।

জীবন চৈতন্য ভারতী গোবিন্দানন্দজী এবং তার অনুগামীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন। ভোগ নিবেদন করে সকলেই খাওয়া শেষ করলেন। জীবন চৈতন্য বললেন— গোবিন্দানন্দজী, আপনি তো পাণ্ডিত্যে মহাসাগর। সমস্ত পুরাণ আপনার মুখস্থ। আপনি দয়া করে এমন কিছু বলুন যা শুনে আমরা মনে শান্তি পেতে পারি।

গোবিন্দানন্দজী বললেন চৈতন্য মহারাজ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের কাছে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিভিন্ন প্রশ্ন শুধু নিজের জ্ঞান অর্জনের জন্য করেছিলেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জন্য যেমন অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা উপহার দিয়েছেন তেমনি মহামতি ভীষ্মও জগতের কল্যাণের জন্যই দয়া পরাবশ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব যে সমস্ত উপদেশ করেছেন তারই কয়েকটা বর্ণনা করবো।

প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন সাধু ও অসাধু কে? যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব যা বর্ণনা করেছেন তাতে সাধু ব্যাক্তি বলতে তাদেরই বুঝায় যারা সত্য কথা বলেন পরের উপ-

কার করেন। গো ও ব্রাহ্মণের পূজা করেন। গুরুজনদের শ্রদ্ধা করেন। অতিথিদের নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করেন। জীবকে ভালোবাসেন।

যারা পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন, যাদের রুচিবোধের অভাব আছে, যারা স্ত্রী জাতির মর্য্যাদা দিতে জানেনা, যারা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করেনা, সত্যকথা বলার ধার ধারে না, যারা জীবকে হিংসা করে এবং নিজের স্বার্থছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না তারাই সমাজে অসাধু ব্যক্তি বলে পরিচিত।

মানুষ ধর্মানুসারে শুভ কিংবা অশুভ ফল লাভ করে থাকে। একজন মানুষ আর একজনের প্রতি যতটুকু ভাল কিংবা খারাপ ব্যবহার করে জগৎ থেকে সে ঠিক তত টুকুই খারাপ কিংবা ভালো ফল পেয়ে থাকে। আমাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার যে কেউই পৃথিবীতে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। যে রমণীর গর্ভে পুরুষ জন্মগ্রহণ করে সেই অনেক ক্ষেত্রে যৌবনের অহংকারে স্ত্রী জাতিকে অবহেলা করে, ঘৃণা করে এবং অত্যাচার করতে উদ্যত হয়। অনেক মুনি ঋষি কামিনী থেকে সাধু মহাপুরুষকে দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু, আমাদের জানতে হবে নারীর চারটি রূপ আছে। মাতৃ ভাব, সন্তান ভাব, সেবিকা ভাব এবং কামিনী ভাব অর্থাৎ কামবাসনা চরিতার্থ করার মানসিকতা।

একজন নারী যখন শিশুকে, পতিকে, আত্মীয় পরিজনকে সেবা-শুশ্রূসা করেন তখন তিনি সেবিকা। যখন সন্তানদের এবং অনুজদের স্নেহ করেন, আদর যত্ন করেন তখন তিনি মাতৃ স্বরূপা। যখন কোন নারী ঋতুবতি হয়ে কোন পুরুষের সাহচৈর্য কামনা করেন তখনি তিনি কামিনী। নারীকে মাতৃরূপে কল্পনা করলে কোন সাধকেরই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। পরমা-প্রকৃতি যখন কোন নারীর মাধ্যমে কোন সাধককে কৃপা করেন তখন সেই সাধক অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

আমরা যখন কোন বস্তু কাউকে দান করি সে দান যদি সতঃস্ফর্ত না হয় তা হলেও দানের ফল লাভ করা যায় না। ঋষি উদ্দালক এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে বিভিন্ন দ্রব্য ব্রাহ্মণদের দান করেন এবং এমন কয়েকটি গাভী দান করেন যেগুলির ভবিষ্যতে দুধ দানের কোন ক্ষমতাই নেই।

উদ্দালক ঋষির একমাত্র পুত্র নচিকেতা পিতার ঐ দানে মোটেই খুশী হতে পারলেন না। তিনি পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন — পিতা, আপনি বিভিন্ন জিনিস ব্রাহ্মণদের দান করেছেন আমাকে কাকে দান করবেন?

উদ্দালক ঋষি পুত্রের ঐ কথার উত্তর না দিয়ে বললেন নদী তীরে আমি সমস্ত পূজার উপকরণ ফেলে এসেছি তুমি সেগুলো নিয়ে এসো।

নচিকেতা নদী তীরে গিয়ে দেখেন পুজোর উপকরণ নদীতে জোয়ার আসায় সব ভেসে গেছে। তখন নচিকেতা বাড়ী ফিরে এসে পিতার নিকট ঐ সংবাদ জানিয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন — পিতা, আপনি আমাকে কাকে দান করবেন?

পুজোর উপকরণ হারানোর উদ্দালক ঋষি কিছুটা মনঃ ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। পুত্রের দ্বিতীয় বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন — তোমাকে যমকে দান করলাম।

উদ্দালক ঋষির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একমাত্র পুত্র নচিকেতা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। উদ্দালক ঋষি পুত্র শোকে বহু কান্নাকাটি করে নিজেও জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

একদিন ও রাত্রির অবসানের পর ঋষি যখন পুত্রের সংকারের চিন্তা করছেন তখনই নচিকেতা আবার জীবন ফিরে পেলেন। নচিকেতার জীবন প্রাপ্তিতে উদ্দালক ঋষি যারপর নাই আনন্দিত হয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ছেলে নচিকেতা বললেন পিতা আপনার অভিশাপের ফলেই আমার যমলোক

দর্শন এবং যমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। যমের কাছ থেকে শুধু গোদানের ফলই নয় আরো অনেক তত্ত্ব জানতে পেরেছি।

যমরাজ বলেছেন এমন গাভী ব্রাহ্মণকে দান করতে নেই যে গাভীর ভবিষ্যতে দুধ দানের ক্ষমতা নেই। আপনি বৃদ্ধ ও রুগ্ন গাভী দান করে পরিনামে বিপরীত ফলই প্রাপ্ত হয়েছেন। এক্ষণে আপনার মঙ্গলের জন্যই আমাকে পুনরায় গো-দান যজ্ঞ করা কর্তব্য। যমরাজ আরো বলেছেন, গো-দানের পূর্ণফল লাভ করতে হলে গো-দানের পর দশদিন গোময় ও গোচনা আহার করে জীবন রক্ষা কর্তব্য। গো-দানের আগের দিন সকালে ব্রাহ্মণের সবিশেষ যত্ন সহকারে ভোজন করিয়ে রাত্রিকালে গো-শালায় বৃষ ও ধেনুগণের সঙ্গে রাত্রি যাপন করা কর্তব্য। বৃষকে পিতা এবং ধেনুকে মা বলে গণ্য করা উচিত।

ধেনুগণ ইহলোকে দুগ্ধ দান করে মানুষের পরম উপকার সাধন করেন। পরকালেও মানুষের উদ্ধারের সহায়তা করে থাকেন।

বৃষ তার শ্রম দ্বারা ইহলোকে মানুষকে কৃষিকাজে সহায়তা করে। মানুষের অন্ন উৎপাদনে সাহায্য করে। পরলোকে পরম শংকুল বৈতরনী পার হতে মানুষকে সাহায্য করে।

গোবিন্দানন্দজী বলতে লাগলেন — জীব চৈতন্যজী, এমন কোন জিনিষ দান হিসেবে গ্রহণ করতে নেই যে জিনিষ চুরি, বাটপারী কিংবা হিংসা দ্বারা অর্জন করা হয়েছে। এমন জিনিষ দান করতে নেই যে জিনিষে নিজের অধিকার নেই এবং সৎভাবে উপার্জন করা হয়নি।

—মহারাজ আমরা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সিদ্ধস্থানে রাত্রি যাপন করছি। বশিষ্ঠের আশ্রমে বসে বশিষ্ঠের কাহিনীই বর্ণনা করা প্রয়োজন। আমি সংক্ষেপে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের দু-একটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্টের আশ্রমে গো মাতা সুরভি অবস্থান করছিলেন। তিনি ঋষির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাসময়ে প্রদান করতেন। একদিন সম্রাট বিশ্বামিত্র কয়েক হাজার সৈন্যসহ ক্ষুধা ও পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্টের আশ্রমে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বশিষ্টদেব রাজা বিশ্বামিত্র ও তার হাজার হাজার সৈন্যের খাবার গোমাতা সুরভীর কাছে প্রার্থনা করেন। গোমাতা সুরভী ব্রহ্মর্ষির প্রার্থনা শুনে তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য এবং পানীয় দিয়ে রাজা বিশ্বমিত্র এবং তার হাজার হাজার সৈন্যের ক্ষুধা এবং পিপাসা নিবৃত্তি করান।

রাজা বিশ্বামিত্র এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে গাভীটিকে যাবার সময় নিয়ে যেতে চাইলেন। বশিষ্ট বললেন — রাজন, গোমাতা সুরভি আমার আজ্ঞাবহ নয়। তাকে আমি শ্রম দ্বারা উপার্জন করেও নিয়ে আসিনি। তিনি কৃপা করে আমার আশ্রমে অবস্থান করে বিভিন্ন ভাবে আগত অতিথিদের সেবায় সাহায্য করছেন। তাকে দান করার ক্ষমতা আমার নেই। তিনি যদি সেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যেতে রাজী হন তা হলে আমার কোন আপত্তি নেই।

বিশ্বামিত্র শুধু একজন রাজা নন, রাজ চক্রবর্তী, সম্রাট। তিনি একটি গাভীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবেন? তিনি ঠিক করলেন বলপূর্বক গাভীটিকে তার রাজ প্রাসাদে নিয়ে যাবেন।

গোমাতা সুরভী নিজের শরীর থেকে সৃষ্টি করলেন অসংখ্য সৈনিক যারা বিশ্বামিত্রের চেয়েও বড় বীর। বিশ্বামিত্র ও তার সৈনিকেরা গোমাতা সুরভীর সৈন্যদের কাছে পরাজিত হলো। অপমানিত রাজা বিশ্বামিত্র আর রাজধানীতে ফিরে গেলেন না। তিনি তপস্যা করে বশিষ্টের মতোই ক্ষমতাশালী হতে চাইলেন।

বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা বলে সিদ্ধিলাভ করলেন। লাভ করলেন অপরিসীম ক্ষমতা। ক্ষমতা বলে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা করে সৃষ্টি করলেন আলাদা এক স্বর্গরাজ্য। তবুও ঋষি মুনি এবং দেবগণ তাকে ব্রহ্মর্ষি বলে মানতে চাইলেন না। ব্রহ্মা বললেন— যদি তাকে ব্রহ্মর্ষি হতে হয় তা হলে বশিষ্ট দেবের কাছ থেকেই সেই উপাধি আদায় করতে হবে।

বিশ্বামিত্র এ ক্ষেত্রেও বলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বশিষ্ট তার রক্ত চক্ষুর ভয়ে ব্রহ্মর্ষি হিসেবে তাকে মানতে রাজী না হওয়ায় তিনি বশিষ্টের নিরানব্বইটি সন্তানকে হত্যা করলেন। এক রাতে এলেন বশিষ্টকেই হত্যা করার সংকল্প নিয়ে খড়গ হাতে রাতে এসে হাজির হন। এসে শুনতে পান ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ট তার স্ত্রীকে বলছেন— বিশ্বামিত্রের ঘর থেকে একটু নুন চেয়ে আমার জন্য।

বশিষ্টের প্রস্তাবে তার স্ত্রী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। যে লোক তাদের নিরানব্বইটি সন্তানকে হত্যা করেছে তার কাছ থেকে নুন চেয়ে আন! ব্রহ্মর্ষি স্ত্রীকে বুঝালেন বিশ্বামিত্র বড় তপস্বী বটে কিন্তু মনের দিক থেকে এখনো শিশু তাই এমন অন্যায় কাজ করেছে।

ব্রহ্মর্ষির কথা শুনে বিশ্বামিত্রের মনের পরিবর্তন হলো। তিনি বশিষ্টের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং বশিষ্টও তখন তাকে সস্নেহে বুকে টেনে ব্রহ্মর্ষি হিসেবে মেনে নিলেন।

তারা পীঠ হয়ে তারকেশ্বর শিব দর্শনে এলেন গোবিন্দানন্দজী। তারকেশ্বরের শিব নাকি খুবই জাগ্রত। এখানে উষ্ণ প্রস্রবন রয়েছে। যাদের বাতব্যাধি আছে এমন অনেক রোগী তারকেশ্বরে এসে এক মাসের ব্রত পালন করেন। প্রতিদিন তিনবার উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান করে তারকেশ্বর শিবের কাছে রোগ মুক্তির প্রার্থনা জানান।

তারকেশ্বরে কমলা তীর্থ নামে এক ভৈরবী থাকেন। ভৈরবীর বয়স হয়েছে। মাথার জটা শরীরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ

লম্বা হয়ে গেছে। অত্যন্ত ক্ষীণ দেহ। শরীরের প্রতিটি হাড় গোনা যায়। এই বৈষ্ণবী শুধু মৃত মানুষের তৈল খেয়েই নাকি জীবন ধারণ করেন।

তারকেশ্বর শ্মশানে যে সব শব পোড়াতে নিয়ে আসা হয় ভৈরবী সে সমস্ত জ্বলন্ত শবের মাথার মগজ থেকে যে রস নিঃসরণ হয় সেই রস চিমটি দিয়ে মাথার খুলিতে ধারণ করে সামান্য গরম থাকতেই খেয়ে নেন।

বৃদ্ধা ভৈরবী যে ঘরে থাকেন সে ঘরটি পাটশোলা আর মাটি দিয়ে তৈরী। খরের ছাউনি, দু চালা। বেড়ার গায়ের কটি জায়গায় কয়েকটি মৃত মানুষের খুলি মাটিতে বসানো রয়েছে। কুবের ভৈরবীর ঘরে ঢুকে মাথার খুলি গুলোর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো। প্রতিটি মাথার খুলি থেকেই ভাটার মতো দুটো করে চোখ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভৈরবী কুবেরের মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বাবা, তুমি ভয় পার্চ্ছো? ওরা এক একজন ভৈরব। রাতে এদের সঙ্গে আমি ভৈরব চক্রে যোগ দিই। নূতন অতিথিদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ভাবী কালের মহান পুরুষ রয়েছেন যাকে দেখার জন্য ভৈরবগণ দিবা নিদ্রা ভঙ্গ করে প্রাণ ভরে তাকে দেখছেন।

গোবিন্দানন্দজী ভৈরবী মাকে শ্রদ্ধা করেন। উনি তারকেশ্বরের জীবন্ত শক্তি। মানুষের কাছ থেকে নিজেকে অপূর্ব কৌশলে লুকিয়ে রেখেছেন।

ভৈরবী বললেন— বাবা, তোমরা এসেছো, আজ আমার কী আনন্দ! তোমরা বিশ্রাম নাও, আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে কিছু খাবার সামগ্রী নিয়ে আসি।

ভৈরবী ডাকলেন জয়া, বিজয়া, তোরা কোথায়? ছাখ, গরীবের কুটিরে আজ মহাপুরুষদের পদধুলি পড়েছে। সেবা করে তোমরা ধন্য হও। আমি একটু গ্রাম থেকে ঘুরে আসি।

ভৈরবীর ডাক শোনা মাত্রই হাওয়ায় যেন ভেসে এলো

অপূর্ব সুন্দরী দুটি ষোড়ষী মেয়ে। ভৈরবীকে জিজ্ঞেস করলো মা, আমাদের কি করতে হবে।

ভৈরবী বললেন - অতিথিদের হাত পা ধোয়ার জল দাও। বসার জায়গা দাও। যা বলেন তাই করো আমি এক্ষুণি যাব আর আসবো।

ভৈরবীর ঘরের সামনেই বড় একটি বকুল গাছ গাছের নীচে একটা পাতাও নেই। কয়েক দিন আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিলো বলে ধুল উড়ছে না। জয়া একটা সুন্দর মাদুর আর একটা সুন্দর আসন পেতে দিলো।

গোবিন্দানন্দজীকে হাত জোর করে বললো মহাত্মন। আপনি এখানে এসে বসুন। অন্যরা মাদুরে বসবেন। মা একটু পরেই ফিরে আসবেন।

বিজয়া বড় একটা কাঠের থালায় কয়েকটি পাথরের গ্লাস বসিয়ে লেবুর সরবত নিয়ে এলেন। গোবিন্দানন্দজী বললেন মা, আমি সন্ন্যাসী মানুষ তোমরা কুমারী তাই তোমাদের মাতৃ ভাবে কল্পনা করতে পারছিনা। ব্রহ্মচারীও তোমাদের হাতের খাবার গ্রহণ করবেন না। ভৈরবী মা আসুন উনি তৈরী করে যা দেবেন তাই আমরা খাবো।

বিজয়া থালাটি মাটিতে রেখে বললেন বাবা, আজ যে কুমারী, কাল সে মাতা, পরশু সে গর্ভস্থ ভ্রূণ। আমাদের এই লীলা চক্রাকারে সব সময়ই চলে আসছে। এটি আত্মার বিভিন্ন ক্রম-বিকাশ মাত্র। আমিই একদা মা হয়েছিলাম। তারপর আবার মৃত্যুর পর আর এক মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছি। আমাকেও মাতৃ ভাবেই কল্পনা করুন তাতে শাস্ত্রের কোন হানি হবে না।

গোবিন্দানন্দজী বললেন — তুমি হয়তো ঠিকই বলেছো মা। কিন্তু. এই সংস্কার ভাঙার মতো সাহস আমার নেই। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

ভৈরবী ঠিকই বলেছেন। এক দণ্ড সময়ের মধ্যেই আশ্রমে

ফিরে এলেন। পেছনে একজন গ্রাম্য লোক একটা বাঁশের তৈরী ঝাঁপিতে বিভিন্ন খাবার সামগ্রী নিয়ে আসছে।

গোবিন্দানন্দজী এমনিতে রুটি ভোজী। কিন্তু, অন্ন গ্রহণে তার আপত্তি নেই। কুম্ভ মেলা শেষে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমায় বের হয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের খাবারই গ্রহণ করতে হয়। তারকেশ্বরে ভৈরবী মায়ের আশ্রমেও শিব ও শংকরজীর কাছে দুপুরে অন্ন ভোগ নিবেদন করে সকলেই প্রসাদ পেলেন ভৈরবী তার নিত্য অভ্যাস পরিত্যাগ করে শংকর ও শিবের কাছে নিবেদিত অন্নই গ্রহণ করলেন।

রাতে ভৈরবীর ঘরে ভৈরবচক্র বসবে। ভৈরবী বললেন - বাবা গোবিন্দানন্দজী, আজ আপনি চক্রের প্রধান হয়ে আমাদের এই রাতের চক্রকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন।

গোবিন্দানন্দজী বললেন – মা, আমি সন্ন্যাসী মানুষ। সন্ন্যাসীদের পক্ষে কামিনী ও কাঞ্চন স্পর্শ করা পাপ তাছাড়া এই চক্রের যেমন কোন নিয়ম কানুন আমার জানা নেই তেমনি তান্ত্রিক চক্রে বসাও সন্ন্যাসীর পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আমার গুরুদেব মাথায় স্ত্রীলোকের মতো লম্বা ঘোমটা মাথায় দিয়ে পথ চলতেন যাতি কোন স্ত্রী লোক দৃষ্টি গোচর না হয়।

ভৈরবী বললেন — দ্যাখো বাবা, তোমার গুরুদেব নিজে কত বড় ভুল করেছেন আর তোমাদেরও কত বড় ভুলের মাঝে ফেলে গেছেন। আচ্ছা বাবা, তুমি নিজেই বলতো তোমার দেহটি কোন কোন উপাদান দিয়ে গঠিত? তুমি কোন কোন দ্রব্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছো? তুমি কার সাহায্যে বেঁচে আছো?

আমাদের দেহ যেমন প্রকৃতির গর্ভে সৃষ্টি হয়েছে তেমনি আমাদের দেহের সমস্ত উপাদানই প্রকৃতির বস্তু দিয়েই গঠিত। আমরা যা গ্রহণ করছি, যার জন্য বেঁচে আছি তার মূলেও প্রকৃতি। তুমি পুরাণের এমন কোন ঋষির নাম খুঁজে পাবে

না। যিনি সংসার করেন নি এবং প্রকৃতির কাছ থেকে কোন সম্পদ গ্রহণ করেন নি। সনক সনৎ সনাতন, সনন্দ প্রভৃতি চার ঋষি এবং দেবর্ষি নারদ প্রকৃতিকে স্ত্রী হিসেবে, কামিনী হিসেবে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য তারা ও প্রকৃতির কাছ থেকে কৃপা গ্রহণ করেছেন।

যুগে যুগে যে সমস্ত প্রধান ঋষিগণ সপ্তর্ষি উপাধীতে ভূষিত, হয়েছেন, যে সব পণ্ডিত ব্যাক্তি ও শ্রষ্টা ব্যাসদেব রূপে পরিচিত হয়েছেন তারাও সংসার ধর্ম করে পিণ্ডদানের জন্য সন্তান রেখে গেছেন। অগস্ত্য ঋষি, জরৎকারু ঋষি সনৎ কুমারদের মতোই সংসার ধর্ম না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু বনে ভ্রমনকালে জরৎকারু ঋষি এবং অগস্ত্য ঋষি উভয়েই কয়েকজন অঙ্গুলী পরিমিত ঋষিকে কুপের ভেতর বাদুরের মতো শিকড়ে ঝুলছে দেখতে পেয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন তারা তাদের পূর্বপুরুষ। বহু বছর পিণ্ড না পাওয়ায় এবং ভবিষ্যতে পিণ্ড লোপ পাবার আশংকায় তারা এই যন্ত্রনা ভোগ করছেন তখন উভয় ঋষিই পূর্বপুরুষদের কাছে সংসারী হবার প্রতিশ্রুতি দান করেন।

জরৎকারু ঋষি বাসুকী নাগের ভগিনী তথা শিবের মানস কন্যা মনসাকে বিয়ে করেন আর অগস্ত্য ঋষি বিয়ে করেন রাজ-কন্যা লোপা মুদ্রাকে। উভয় ঋষিই নিজ নিজ পত্নীর গর্ভে সুসন্তানের জন্ম দিয়ে, ভবিষ্যতের পিণ্ড দানকারী সৃষ্টি করে পুনরায় তপস্যা করতে চলে যান।

গোবিন্দানন্দজী, দুর্বাশা ঋষির মতো কৃপণ স্বভাব এবং বদরাগী ঋষিও বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন নারদ প্রথমে বিয়ে না করলে ও পরবর্তীকালে যখন গন্ধর্ব কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন সংসারী হয়ে সন্তান উৎপাদন করে পুনরায় স্বর্গে ফিরে আসেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য হিন্দু ধর্মের জনজাগনের জন্য জন্ম গ্রহণ

করেছিলেন। তিনি এত অল্প বয়স পর্য্যন্ত জীব দেহে ছিলেন যে সংসার ধর্ম গ্রহণের সুযোগও লাভ করেন নি। যে মাতা পিতার এক মাত্র পুত্র রয়েছে তার উচিত বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করে সন্ন্যাসী হওয়া নতুবা বিধির বিধানকেই অবমাননা করা হয়। আমরা যে ভৈরব চক্র করি সেই চক্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রাস লীলায় সংগঠিত করেছিলেন।

ভৈরবী গোবিন্দানন্দজীকে বললেন— সেই রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একা বহু হয়ে প্রতিটি গোপীনির হাত ধরে বৃত্তাকারে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ রাসের প্রধানা গোপী শ্রীমতী রাধিকা।

আমাদের ভৈরব চক্রেও যতজন ভৈরব ততজন ভৈরবী থাকেন। একজন ভৈরবকে প্রধান ও একজন ভৈরবীকে প্রধানা বলে অভিষিক্ত করা হয়। নৃত্যের পর আমরাও যখন বসি তখন উলঙ্গ ভৈরবের কোলে উলঙ্গ ভৈরবীগণ বসেন। ভৈরব বা ভৈরবী যে ভৈরব বা ভৈরবীকে নিয়ে সাধনা করেন চক্রে সে ভৈরব বা ভৈরবীকে অন্য ভৈরব বা ভৈরবীকে নিয়ে বসতে হয়। ভৈরব বা ভৈরবীর মধ্যে যদি চক্রে কাম ভাবের উদয় হয় তাহলে বুঝতে হবে সে ভৈরব বা ভৈরবী সিদ্ধি লাভ করতে পারেন নি।

আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে যাকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বলে অভিহিত করা হয় বৈষ্ণবদের কাছে তিনিই চিত্তশক্তি। যাকে আবার হলাদিনী শক্তি, সম্বিৎ শক্তি এবং সন্ধিনী শক্তি বলে বৈষ্ণবরা অভিহিত করেছেন।

আমরা যাকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বলে অভিহিত করি তিনি শিবলিঙ্গকে আড়াই প্যাঁচ দিয়ে মুখে নিজের ল্যাজ ঢুকিয়ে রেখেছেন। সেই কুলকুণ্ডলিনী সর্পাকৃতি মহাশক্তিকে যোগ সাধনা দ্বারা জাগ্রত করলে এক একটি ধাপ পার হয়ে

সহস্রারে পৌঁছলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করেছেন বলে ধরে নেওয়া হয়

আমাদের মুলাধার বা গুহ্য দ্বারে রয়েছে চতুর্দ্দশ দলপদ্ম। পদ্মের মাঝেই স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে আড়াই পাঁচ দিয়ে রেখেছেন। এই স্থানের বীজ মন্ত্র লং।

মানব দেহের তলপেটে রয়েছে ষড়দল বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান চক্র। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠানে পৌঁছলে স্বং বীজ মন্ত্র জপ্ করতে হয়। নাভি মুলে রয়েছে দশ দল বিশিষ্ট মণিপুর চক্র। এই চক্রের বীজ মন্ত্র হলো — দং। বুকের ঠিক যেখানে কড়ি থাকে সেখান রয়েছে দ্বাদশ দল বিশিষ্ট অনাহত চক্র। এর বীজমন্ত্র হলো যং'। কণ্ঠ দেশে রয়েছে ষোড়শ দল বিশিষ্ট বিশুদ্ধ চক্র। এর বীজ মন্ত্র হলো ওং'। দুটি ভ্রুর মাঝখানে রয়েছে আজ্ঞা চক্র। এর বীজ মন্ত্র হলো — হং। তারপর মস্তকে রয়েছে সহস্রার যাকে ক্ষীর সমুদ্র বা মানস সরোবর বলে অভিহিত করা হয়। ঐ সহস্রারের মুল মন্ত্র হলো ওঁ তৎ সৎ।

আমাদের দেহ পঞ্চ মহা ভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্র ও মন, বুদ্ধি অহংকার দিয়ে গঠিত।

আমরা প্রকৃতি থেকেই সব গ্রহণ করি। মৃত্যুর পর আবার প্রকৃতির সঙ্গেই আমাদের দেহ বিলীন হয়ে যায় সে পুড়ানোই হউক আর সমাধীস্থই করা হউক।

গোবিন্দানন্দজী বললেন — সন্ন্যাসীদের কোন পুজো নেই। কাজকর্মের বিনাশ সাধন করে অহংকার ত্যাগ করতে পারলেই সন্ন্যাস নেওয়া হয়। সং নাশ অর্থাৎ আমিত্ব বোধের নাশই সন্ন্যাস। এ হচ্ছে জ্ঞান মার্গের কথা। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ভক্তিবাদের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। গোপীগণের মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন ভক্তিরসের অপূর্ব স্বাদ।

গোপীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার জন্য কাত্যায়ণী ব্রত পালন করেছিলেন। ভগবান অন্তর্য্যামী। গোপীরা প্রত্যেকদিন ভোরে যমুনায় স্নান করে কাত্যায়ণী দেবীর পূজো সেরে গৃহ কাজ করতেন।

গোপীগণের ভক্তির অভাব ছিলনা। কিন্তু, তবুও তাদের মন স্বামী, সংসারের চিন্তায় কিছুটা আবৃত ছিলো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সম্পুর্ণভাবে কৃষ্ণগত প্রাণা করে তুলতে একদিন নদী তীরে গিয়ে গোপীদের পরনের কাপড় কদম গাছে তুলে নিলেন।

গোপীরা স্নান সেরে নিজেদের কাপড় দেখতে না পেয়ে কদম গাছের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের সকলের পরনের কাপড় কদম গাছে ঝুলছে। শ্রীকৃষ্ণ কদম গাছে বসে আছেন। তারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে লজ্জায় গলা অবধি জলে ডুবিয়ে কৃষ্ণকে মিনতি করতে লাগলেন তাদের পরনের কাপড় ফিরিয়ে দেবার জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বললেন জল থেকে উপরে উঠে তাদের যার যার বস্ত্র নিয়ে যাবার জন্য। প্রথমে গোপীরা সংকোচ বোধ করলো তারপর মন প্রাণ কৃষ্ণকে ঢেলে দিয়ে দু-হাত তুলে কৃষ্ণকে প্রার্থনা জানালো তাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দিতে। ভগবান ভক্ত গোপীদের মাধ্যমে লীলা সংগঠিত করে বুঝাতে চাইলেন— নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ লজ্জা। এই লজ্জা ভগবানে সমর্পণ করাতে যেমন গোপীদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে ঠিক তেমনি মানুষ মনপ্রাণ ভগবানকে অর্পণ করতে পারলেই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।

লীলাময় রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ ত্রেতাযুগে রাম অবতারে অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই শারদ পূর্ণিমায় যমুনার তীরে গোপীদের নিয়ে রাসলীলা করলেন।

যাকে বৈষ্ণবগণ মধুর রস বলে অভিহিত করে থাকেন।

গোপীরা শারদ পূর্ণিমা রাতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর শুনে সকলে ছুটে গেলেন। ভৈরবী মা, শ্রীকৃষ্ণকে রাসলীলা নিয়ে কত অপবাদ দিতে চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া প্রেম সাধন করেছেন বলেও অনুযোগ দেয় অনেকে অথচ এরা বুঝতে চায় না গোপীরা যদি রাতে স্বামী, পুত্র, কন্যা এদের ছেড়ে দৌড়ে ঘরের বার হতো তাহলে গোপগণও তাদের পিছু নিতো এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্ত্রী-কন্যাদের হাস্য কৌতুকে রাত্রি যাপন করতে দিতো না। আসলে শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি যেমন গোপীদের অন্তরে প্রবেশ করেছিলো তেমনি গোপীদের পরমাত্মা আত্মারাম, আত্মারামেশ্বর এই তিনটি আত্মাই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সঙ্গী হয়েছিলো। জীবাত্মা আর প্রেতাত্মা স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কর্তব্য পালন করায় গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার গভীর তত্ত্বের সন্ধান খুঁজে পায়নি।

ভৈরবী মা বললেন— বাবা এবার দেখো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব লীলা নিয়ে যখন মানুষ এমন মুখ রোচক গল্প বানিয়ে মধুর রসকে কামরসে রূপান্তরিত করতে চায় তখন আমাদের ভৈরব চক্র নিয়ে কত নিন্দাইনা করে। বাবা, তুমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে দেখো আমার ভৈরব চক্রেও কোন কাম গন্ধ নেই।

গোবিন্দানন্দজী বললেন— মা, আপনি সিদ্ধা ভৈরবী। আপনার এখানে যারা আসবেন তাদের অনেকের স্থুল দেহই নেই এখানে কামভাবের খেলা কি করে হবে! এখানেও তো আত্মারই খেলা। আমার সঙ্গে দুজন ব্রহ্মচারী আছেন এরা বয়সে নবীন এবং অনভিজ্ঞ। আপনাদের এই ভৈরব লীলার তাৎপর্য তারা বুঝতে পারবে না তাই আপনি আমাদের উপস্থিতিতে এই চক্রের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখুন।

ভৈরবী বললেন– ঠিক আছে বাবা, তোমার যেমন ইচ্ছে তেমনি হবে। তোমার ব্রহ্মচারী দুজনের শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করা যাবে।

গোবিন্দানন্দজী বললেন— সেই ভালো। আমি ততক্ষণে আমার গুরুদেবের উপাসনার কাজ শেষ করে ফেলি। কুবের, তুমি ভৈরবী মা'র সঙ্গে যাও। খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ো।

ভৈরবীর ঘরের পাশেই একচালা ছোট্ট একটি ঘর রয়েছে। সেই ঘরেই চাটাই পেতে তার উপর ময়লা একটা পাতলা কাঁথা পেতে দেওয়া হলো। ব্রহ্মচারী রাতে কিছুই গ্রহণ করলেন না। কিন্তু কুবের ভৈরবীর ভোগের একটু অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করে ভৈরবীর দেওয়া বিছানায় শুয়ে পড়লো।

পথ শ্রমে কুবের ক্লান্ত। তারাপুরের বিষ্ণু মন্দিরেও কুবেরের ভালো ঘুম হয়নি। তাই পথশ্রম ও ঘুম দুই ই কুবেরকে কাবু করে ফেললো। শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লো কুবের।

কুবের কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলো জানেনা হঠাৎ নূপুরের আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেলো। চারিদিকে ঘুট ঘুটে অন্ধকার। দু-একটা জোনাকী খালি মাঠে এদিক সেদিক ছোটা ছুটি করছে। একটা প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো। ক'একটা শেয়াল সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো হুকা-হুয়া।

কুবের ঘুম জড়ানো চোখে তাকানোর চেষ্টা করে। কিছুই দেখতে পেলোনা। চোখ রগরিয়ে আবার তাকাতেই একটু স্পষ্ট দেখতে পেলো। দুটি মেয়ে নাচছে তাদের বিছানার চার পাশ ঘুরে।

ব্রহ্মচারী ঘুমে অচেতন। কুবের উঠে বসলো। বললো— তোমরা কে? আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছো কেন? ভৈরবী মা কি তোমাদের পাঠিয়েছেন?

মেয়ে দুটোর নাচ থেমে গেলো। একটি মেয়ে বললো—

ব্রহ্মচারীদের কি এভাবে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে আছে? রাতেই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। রাত দ্বিতীয় প্রহর শেষ হলেই ব্রহ্মচারীদের ঘুম থেকে উঠে সাধনা শুরু করতে হয়।

অপর মেয়েটি বললো জয়া, তুই জানিস না ও যে বলরামের অবতার লো! বলরাম খুব মদ খেতেন। তুমিও কি মদ খাও? যদি খাও তো এনে দিতে পারি।

কুবের প্রথমে ভেবেছিলো মেয়ে দুটো তার চেহারায় মুগ্ধ হয়ে মধ্যরাতে খারাপ উদ্দেশ্যই নিয়ে এসেছে এবার বুঝতে পারলো আসলে এরাও ভৈরবী। জিজ্ঞেস করলো—তোমাদের ভৈরবী মা মদ খান বুঝি?

বিজয়া বললো মা মদ, গাজা সব খান; তবে মদ ও গাজা শোধন করে মা ও বাবার কাছে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পান। মা প্রায় ত্রিশ বছর হলো অন্ন কিংবা রুটি গ্রহণ করেন না। মৃত মানুষের জ্বলন্ত দেহ থেকে যে রস বের হয় তাই খান। মা তারা মার সাযুয্য লাভ করেছেন তাই আমরা স্বেচ্ছায় ভৈরবীর সেবা করি।

ভৈরবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বক্রেশ্বরের পথে চললেন গোবিন্দানন্দজী। বক্রেশ্বর শক্তিপীঠ। মহাদেব যখন দেবী সতীর দেহ নিয়ে বিশ্ব পরিক্রমা করছিলেন তখন জগৎ রক্ষার জন্য ভগবান বিষ্ণু শিবকে তার নিজস্ব কাজে ফিরিয়ে আনতে সতীর দেহ সুদর্শন চক্র দিয়ে কেটে টুকরো করে দেন আবার কোন পুরাণের মতে ভগবান বিষ্ণু কীট রূপে সতীর দেহে প্রবেশ করে সতীর দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন। সতীর দেহ যে যে স্থানে পড়েছে সে সমস্ত স্থানই শক্তি পীঠরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দেবী ভাগবতের মতে সারা বিশ্বে প্রধান ১০৮টি শক্তি পীঠ রয়েছে।

বক্রেশ্বরেও দেবীর ভ্রূর মধ্যভাগ পতিত হয়েছিলো। এখানে দেবী মহিষ মর্দিনীরূপে বিরাজ করছেন। প্রতিটি শক্তি

পীঠেই রয়েছে আবার ভগবান শিবের আরাধনার স্থান। বক্রেশ্বরে শিব ঠাকুর বক্রনাথ রূপে পরিচিত। মহর্ষি অষ্টাবক্র শিবের আরাধনা করে এখানেই শিবের দর্শন লাভ করেছিলেন এবং অষ্টাবক্র অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। অষ্টাবক্র ঋষিই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শিবঠাকুর বক্রনাথ রূপেই জগতে পরিচিতি লাভ করেছেন। এই বক্রনাথ দ্বাদশ মহালিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেও ভক্ত অষ্টাবক্র নিজ সাধনা বলে এই স্থানকে অন্যতম প্রধান শৈবস্থানে পরিণত করেছেন।

বক্রেশ্বরের বক্রনাথের পুরোহিত পুলক মিশ্র গোবিন্দানন্দজীর পরিচিত। তারা দুজনেই এক গ্রামের ছেলে। পুলক মিশ্র উপবিত ধারণের পর শৈব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বক্রনাথের পুজোয় আত্ম-নিয়োগ করেছেন আর গোবিন্দানন্দজী যোশী মঠের সন্ন্যাসী অচ্যুতানন্দজীর কাছ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে হরিদ্বারে চলে যান বার বছর পর একবার মাত্র দেখা হয় দু-বন্ধুর সঙ্গে। দু-বন্ধুর মধ্যে ভাব বিনিময় হয়। শাস্ত্র আলোচনায় দু তিনদিন মুহূর্তের মতোই শেষ হয়ে যায়।

বক্রেশ্বরে চারটি উষ্ণ কুণ্ড রয়েছে। প্রতিটি কুণ্ডই পাথর দিয়ে বাঁধানো। দুটো কুণ্ড বেশ বড়। পনের বিশজন লোক এক সঙ্গে কুণ্ড দুটোতে স্নান করতে পারেন। শীতের সময় এখানে জমিদার ও রাজাদের আবির্ভাব ঘটে তাদের অনেকেই বক্রেশ্বরে নিজ নিজ খরচায় অথিতিশালা এবং নিজেদের থাকার মনোরম ঘর প্রস্তুত করিয়েছেন। সাধু সন্তদের থাকার জন্যও দুটো লম্বা দালান ঘর রয়েছে।

গোবিন্দানন্দজীর তৃতীয় বারের বক্রেশ্বর সফরে পুলক মিশ্র বন্ধুকে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলেন। দুপুর গড়িয়ে গেছে বন্ধু ও শিষ্যদের খাবারের ব্যবস্থা করতে তিনি আদেশ দিলেন। বক্রেশ্বরের দুটা কুণ্ডের জল প্রচণ্ড গরম। কাপড়ে চাউল বেঁধে

কিছুক্ষণ কুণ্ডের মধ্যে রেখে দিলে সুপাক হয়ে যায়। এই অন্নই অনেক ভক্ত দেবী মহিষমর্দিনী এবং শিব বক্রনাথের কাছে নিবেদন করেন।

কুবেরকে গোবিন্দানন্দজী নিজের সেবক রূপে নিযুক্ত করেছেন হাত মুখ ধোয়ার জল এনে দেওয়া, সিদ্ধির কলকে সাজিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন ছোট খাটো কাজ করে দেওয়ার দায়িত্ব কুবেরের।

গোবিন্দনন্দজী আসন পেতে বসার পর কুবের বড় পেতলের কমণ্ডলো দিয়ে এক কমণ্ডলো ঠাণ্ডা জল এনে দিলেন গোবিন্দানন্দজী হাত মুখ ধোয়ে ঠাকুরের আসন বসিয়ে সিদ্ধির কলকেতে টান দিয়ে পাশে উপবিষ্ট পুলক মিশ্রের হাতে তুলে দিলেন।

ব্রহ্মচারী শিব মন্দিরের সেবকের সঙ্গে গুরুদেবের খাবার তৈরীতে সহায়তা করছেন। কুবের আগুনের কুণ্ডের পাশে বসে গুরুর আদেশের অপেক্ষায় বসে আছে।

পুলক মিশ্র সন্ধ্যায় বক্রনাথের পূজো দিতে গিয়ে চমকে উঠেন। শিবলিঙ্গ নেই, রয়েছে গোবিন্দানন্দজীর সঙ্গে আসা নূতন ছেলেটি। পুলক মিশ্র চোখ ভালো করে মুছে আবার তাকিয়ে দেখেন এবার বক্রনাথ লিঙ্গ রয়েছেন।

পুলক মিশ্র রাত্রিতে বন্ধুকে নিরালায় ছেলেটির সম্পর্কে জানতে চাইলেন। গোবিন্দানন্দজী সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁর চোখে ছেলেটির ভবিষ্যত নিশ্চয়ই আয়নার মতো পরিস্কার।

পুলক মিশ্রের প্রশ্নে গোবিন্দনন্দজী উত্তর দিলেন—বন্ধু, ছেলেটি হয়তো ভবিষ্যতের অবতাররূপেই চিহ্নিত হতে পারে। এমন সব অলৌকিক লক্ষণ তার মধ্যে দেখতে পাই যে তাকে আমার সেবক নিযুক্ত করে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। কিন্তু, জীব জগতে সকল অবতারই মায়ার মোহে নিজেকে

বিস্মৃত হন। তাই তাকে সব বিষয়ে অভিজ্ঞ ও সচেতন করে তুলতে চাই। ভগবান যতবার অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন ততবারই লোক শিক্ষার্থে গুরুকরণ করেছেন।

বীরভূমের এক জমিদার এসেছেন বক্রেশ্বরে বক্রনাথের কাছে রোগ মুক্তির জন্য আবেদন জানাতে। জটাজুটধারী চারজন সন্ন্যাসীকে দেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দুজন সেবক সহ এসে প্রণাম করে কাছে বসলেন।

জমিদারের ডান পা প্রায় অচল হয়ে গেছে। ঘোড়ায় চড়তে পারেন না শুতে পারেন না। ভালোভাবে বসতে পারেন না।

গোবিন্দানন্দজীর সামনে মাথা নত করে জিজ্ঞেস করলেন -- বাবা, আমায় আপনি ভালো করে দিন। আজ চার বছর হলো এমন অবস্থা হয়েছে মৃত্যু এর চেয়ে ভালো ছিলো। আপনার কথা শুনেছি আজ দৈবক্রমে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আপনি দয়া করুন, বাবা, দয়া করুন।

কুবের পাশেই বসেছিলো। হঠাৎ বলে—উঠলো শরীরে শক্তি থাকলে মানুষ অনেক সময় কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জন্মদাতা এবং গর্ভ ধারিনীর প্রতিও তখন পশুর মতো আচরণ করতে চিন্তা করেনা। এই পা দিয়েই গর্ভ ধারিনীকে লাথি মারলেন। মা'র বুকের দুধ খেয়ে এই দেহ বড় হয়েছে। তার প্রতিদান কেমন করে দিলেন একবারও কি ভেবে দেখেছেন ?

কুবেরের কথা শুনে চমকে উঠে জমিদার। প্রায় দশ বছর আগে এক নর্তকীকে প্রাসাদে নিয়ে আসায় মা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছিলেম। বাঈজীকে চাবুক দিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছিলেন। জমিদার মাছ ধরে ফিরে এসে বাঈজীর কান্নায় জ্ঞান শূন্য হয়ে মাকে প্রচণ্ড জোরে লাথি মেরে ছিলেন। মা এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অভিমানে এবং দুঃখে পরদিন তিনি একজন বৃদ্ধ চাকরকে সঙ্গে নিয়ে কাশী চলে গিয়েছিলেন।

এবার জমিদার কুবেরের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললো—বাবা তুমি ঠিক বলেছো আমি মহাপাপী। আমি পাপ করেছি। তুমি আমায় পাপ থেকে উদ্ধার করো বাবা।

কুবের বললো আপনি কাশী গিয়ে আপনার মার সঙ্গে দেখা করে এক মাস মায়ের পদসেবা করুন তা হলেই রোগ মুক্ত হতে পারেন।

জমিদার রূপার টাকার একটি থাল গোবিন্দানন্দজীর পায়ের কাছে রেখে বললেন বাবা এই টাকা দিয়ে একদিন সাধুর ভাণ্ডারা দেবেন আর আশীর্বাদ করবেন ছেলেটির কথা যেন সত্যি হয়।

জমিদার চলে গেলে গোবিন্দানন্দজী কুবেরকে বললেন বাবা, মানুষকে তার নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করতে হয়। তোমার কথায় তার কর্মফল ভোগ করা এ জন্মে আর হলোনা। কিন্তু, আগামী জন্মে তাকে তার এই পাপের ফল ভোগ করতেই হবে।

পুলক মিশ্র বললেন ভাই, তোমার কাছ থেকে কিছু শাস্ত্রের কথা শুনতে বাসনা হয়েছে, যদি দয়া করে শোনাও তাহলে আমরা সকলেই আনন্দ পাবো।

গোবিন্দানন্দাজী সকলকে নিয়ে বক্রনাথ শিব মন্দিরের পাঠ মন্দিরে বসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন — জীব পাঁচ প্রকার। স্থুল জীব, তটস্থ জীব, বদ্ধ জীব মুক্ত জীব ও সুক্ষ্ম জীব। পাঁচটি আত্মা হলো জীবাত্মা, ভুতাত্মা, পরমাত্মা আত্মারাম ও আত্মা রামেশ্বর। আমাদের ভাবও পাঁচটি। শান্ত ভাব, দাস্যভাব, সখ্য ভাব, বাৎসল্যভাব এবং মধুর ভাব। আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রীয় হলো চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় হলো পাদ বাক্, পানী, পায়ু ও উপস্থ পাঁচটি প্রাণ হলো অ সমান, প্রাণ, উদান ও ব্যান। আমাদের দেহ পাঁচটি

উপাদান দিয়ে অর্থাৎ পঞ্চভূত পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু এবং আকাশ দিয়ে গঠিত।

আমাদের দেহের এই যে পাঁচটি আত্মা এই পাঁচটি আত্মার মধ্যে জীবাত্মার অবস্থান হলো গুহ্যমূলে, চতুর্দল পদ্মে। ভূতাত্মার বাসস্থান লিঙ্গমূলে ষড়দল পদ্মে। পরমাত্মার বাসস্থান নাভিমূলে দশদল পদ্মে। আত্মারামের বাসস্থান হৃদয় দেশে দ্বাদশদল পদ্মে, আত্মা রামেশ্বরের বাসস্থান কণ্ঠদেশে ষোড়শদল পদ্মে।

দীক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি তা বলছি। দীক্ষা হলো যে কাজ পাপ ক্ষয় করে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ ঘটায় তাই দীক্ষা। মালার উৎপত্তি সম্পর্কে হরিবংশ মহাপুরাণে যে কাহিনী রয়েছে তা বলছি।

আমরা সাধারণতঃ রুদ্রাক্ষ মালা বেল মালা ও তুলসী মালাই ধারণ করে থাকি। তুলসী মালা আর রুদ্রাক্ষ মালার উৎপত্তি কিরূপে হলো তাও বলছি।

অগ্রহায়ণ মাসে স্বাতী নক্ষত্রে একবার বৃষ্টিপাত হয়। সেই বৃষ্টি বিন্দু সমুদ্রে ও নদীতে বসবাসকারী কিছু ঝিনুক পান করে। যে সমস্ত ঝিনুক সেই বৃষ্টিবিন্দু ধারণ করেছিলো সে সমস্ত ঝিনুকে মুক্তা জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র স্নানকালে কিছু মুক্তা পেয়ে নারায়ণকে প্রদান করেন। নারায়ণ সেই মুক্তাগুলো লক্ষ্মীর হাতে দিলে লক্ষ্মী সেই মুক্তাগুলো সুতোয় বেঁধে মালা গেঁথে নারায়ণের গলায় পরিয়ে দেন নারায়ণ পুনরায় সেই মালা লক্ষ্মীদেবীকে দান করলেন। লক্ষ্মীদেবী কিছু মুক্তা দিয়ে নিজের গলায় মালা তৈরী করেন আর কিছু মুক্তা দিয়ে মালা গেঁথে চুলের খোপায় পরেন। এমন সময় তুলসী দেবী এসে মুক্তার মালা প্রার্থনা করলে লক্ষ্মীদেবী দিতে অস্বীকার করেন। এতে তুলসীর মনে কষ্ট হলে নারায়ণ বললেন - তুলসী, পরজনমে তোমার অংশে যে তুলসী গাছ জন্মাবে সে তুলসীর পাতা ছাড়া যেমন দেবপূজা সম্পন্ন হবে না তেমনি তুলসী মালা আমার ভক্ত-

রয়েছে ছোট ছোট চার পাঁচটি দোকান। এই দোকানে ভোগের সামগ্রী বিক্রী হয়।

চার মঠের শংকরাচার্য গণ এসে হাজির হবার পর থেকেই প্রতিদিন এখানে উৎসব শুরু হয়েছে। গোবিন্দানন্দজী যখন এসে হাজির হলেন তখন পুরোদমে উৎসব চলছে। শুধু গোবিন্দানন্দজী নয় আরো শতাধিক্ মহাত্মার আগমন ঘটেছে চার মঠের শংকরাচার্যদের সাহচৈর্য লাভ করার জন্য।

গোবিন্দানন্দজীর সঙ্গে সারদা মঠের শংকরাচার্যের যথেষ্ট হৃদ্যতা রয়েছে। দুজনে একই বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিলেন। হরিদ্বারে দেখা হয়েছিলো দুজনের। গোবিন্দানন্দজী যোশী মঠ থেকে ব্রহ্ম চৈর্য নিয়ে হলেন গোবিন্দানন্দ আর উনি হলেন নিত্য স্বরূপ। গোবিন্দানন্দজীর সন্ন্যাস নাম হলো গোবিন্দানন্দ গিরির আর নিত্য স্বরূপ হলেন নিত্য স্বরূপ তীর্থ।

নিত্য স্বরূপ তীর্থ প্রায় এক দশক পর গোবিন্দানন্দ গিরির সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দে আসন ছেড়ে উঠে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন। গোবিন্দানন্দ গিরির যোশী মঠের শংকরাচার্য হবার কোন সম্ভাবনাই নেই অথচ নিত্য স্বরূপ তীর্থ সারদা মঠের শংকরাচার্য হয়েছেন প্রায় তিন বছর হলো।

গোবিন্দানন্দজীর সেবায় কয়েক জনকে নিযুক্ত করা হয়েছে কেউ সেবা করছে, কেউ বাতাস করছে, কেউ সরবত নিয়ে এসেছেন, কেউ কলকে সাজতে বসেছেন।

প্রতিদিনই পালা করে ইষ্ট প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে। কোনদিন রামায়ণ, কোনদিন মহাভারত, কোনদিন উপনিষদ।

পরদিন অক্ষয় তৃতীয়া। নিত্য স্বরূপ তীর্থ মহারাজ গণনা করে দেখলেন বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অক্ষয় তৃতীয়া থাকবে। বন্ধুকে বললেন— এই শুভ সময়ের মধ্যে ব্রহ্মচৈর্যে দীক্ষা দেওয়ার প্রশস্থ সময়।

চারমঠের শংকরাচার্য এই শুভ মুহূর্তে কয়েকজনকে ব্রহ্মচৈর্যে দীক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্পের কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যনাথ ধামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মানুষের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেলো সন্ন্যাস গ্রহণ করার। দশ ক্রোশ দূর থেকেও কিশোর ও যুবকের দল এসে হাজির হলো পরমাত্মার সন্ধানে ব্রহ্মচৈর্যে দীক্ষা নিয়ে অমৃতের পথে যাত্রা করার জন্য

কুবের গোবিন্দানন্দজীকে বললো গুরুদেব আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার দীক্ষার সময় চার মঠের চার শংকরাচার্য উপস্থিত থাকছেন। আমার মতোই তারাও পরম ভাগ্যবান যারা কাল দীক্ষা গ্রহণ করবেন।

বিশ্বকর্মা নির্মিত বৈদ্যনাথ মন্দিরের অনুকর নেই পরবর্তী কালে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারই নাট মন্দিরে কিশোর ও যুবকদের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার আয়োজন করা হয়েছে।

পার্শ্ববর্তী রাজা, জমিদার এবং অনেক ব্যক্তির আগমণ ঘটেছে এই পবিত্র অনুষ্ঠান দেখার জন্য।

নাট মন্দিরে ভাবী ব্রহ্মচারীদের পবিত্র বস্ত্র পরে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। কিশোর ও যুবকরা চার শংকরাচার্য্যের দর্শন করেছে তারা যে শংকরাচার্য এবং যে মঠকে সাধনার ভিত্তি হিসেবে মনে করেছে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা, তাদের সেই মঠের শংকরাচার্যের কাছেই নিয়ে যাচ্ছেন ব্রহ্মচৈর্য্য দীক্ষা দানের জন্য।

যোশী মঠের গোবিন্দানন্দজীর কাছ থেকেই ব্রহ্মচৈর্য্য দীক্ষা নেবার জন্য কুবের কৃতসংকল্প ছিলো, কিন্তু, যোশী মঠের শংকরাচার্য স্বয়ং উপস্থিত থাকায় গোবিন্দানন্দজী যোশী মঠের শংকরাচার্য সত্যানন্দ গিরিকে অনুরোধ জানালেন অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে যেন তিনি কুবেরকেও কৃপা করেন।

যোশী মঠের শংকরাচার্য গত কালই কুবেরকে ভালো ভাবে লক্ষ্য করে ছিলেন। গোবিন্দানন্দজীর অনুরোধ শুনে সত্যানন্দ গিরি বললেন মহারাজজী, ইচ্ছে করলেই যেমন গুরু হওয়া যায় না তেমনি ইচ্ছে করলেই শিষ্যও করা যায় না। গুরু-শিষ্যের জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক থাকে। আর আপনার এই অনুগামী আমাদের মতো কোন মঠের মধ্যে আবদ্ধ থাকার জন্যও জন্মগ্রহণ করেনি। আপনি স্বয়ং সন্দিপণ ঋষির অবতার। আর এই কিশোরটি স্বয়ং বলরামের অবতার বলেই আমার অন্তরাত্মা বার বার বলে দিচ্ছেন। আপনি তার জন্মান্তরেরই গুরু। শুভ অক্ষয় তৃতিয়াতে আপনি তার কাছে অমৃতময় মহা বীজ মন্ত্র দান করুন। আমি দীক্ষা দানের পর তাকে কিছু উপদেশ দান করবো।

১৪৯০ খ্রীঃ বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষের মহা অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে যোশী মঠের শংকরাচার্য শ্রীশ্রীসত্যানন্দ গিরি মহারাজ এবং তেত্রিশ কোটি দেবগণকে সাক্ষী রেখে সমস্ত দেবগণের এবং সত্যানন্দ গিরির আশীর্বাদ প্রার্থনা করে গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজ কুবেরকে দশ অক্ষরের মহামন্ত্র দান করলেন। বললেন আজ থেকে তোমার নাম হলো নিত্যানন্দ। জীবকে ভবিষ্যতে তুমি তোমার কৃপা দ্বারা নিত্য শান্তি দিতে সক্ষম হবে বলেই তোমার নাম নিত্যানন্দ রাখলাম। ভগবান শ্রীহরি তোমার কল্যাণ করুন।

মহানাম কানে দেওয়া মাত্রই নিত্যানন্দের মনে হলো তার দেহ থেকে এক দিব্য পুরুষ বের হয়ে প্রথমে ধনুর্বান সহ মৃদু হাস্যে দাঁড়িয়ে সামনে উপবিষ্ট গুরুকে প্রণাম করলো তারপর সেই ধনুর্ধারী রূপ পরিবর্তন করে লাঙ্গলধারী এক দিব্য পুরুষে রূপান্তরিত হলো। সেই দেহ যেন ক্রমে ছোট হয়ে গেলো, লাঙ্গল ওধাও হয়ে গেলো ক্রমেই তার বর্তমান রূপ প্রকাশিত

হলো। সে দেখতে পেলো সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ মহাপুরুষগণ তার জয় গান করেছে আর সে দিব্যি বসে দেবগণ, ঋষিগণ এবং মহাপুরুষদের স্তবগান শুনে মৃদু মৃদু হাসছেন

চারদিকে সুমধুর বাদ্য বাজতে শুরু করলো। আকাশ থেকে অপ্সরগণ পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন আর হাজার হাজার মানুষ যেন অর্তস্বরে প্রার্থনা জানাতে লাগলো হে-প্রভু শান্তি চাই, শান্তি চাই, সমৃদ্ধি চাই মুক্তি, চাই।

নিত্যানন্দ দেখলেন তাঁর দেহ থেকে যেন দিব্য আলোর শিখা নেই আর্তনাদকারী হাজারো মানুষের দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং সেই দিব্য আলোর পরশ পাওয়া মাত্র হাজারো মানুষের আর্ত চিৎকার থেমে গেছে। তারা অনেকেই দিব্য দেহ ধারণ করে মহাপুরুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার স্তব গান করছে আর তিনি আগত সকলের উদ্দেশ্যেই বলছেন হরিনাম কীর্ত্তন করো। কলিতে হরিনাম ছাড়া আর কোন সাধন নেই। হরিনাম ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। হরিনাম ছাড়া আর কোন পথ নেই।

নিত্যানন্দ দেখতে পেলেন দেবগণ ও ঋষিগণের পর চন্দন, ফুলের মালা, আবির ও কুম কুম নিয়ে অসংখ্য যুবতী ও বঁধুরা এসেছে নিত্যানন্দ চিৎকার করে বলতে চাইলেন তোমরা আমায় স্পর্শ করো না। দূরে চলে যাও। আমার ব্রহ্মচৈর্য্য নষ্ট করলে তোমরা নরকগামী হবে।

নিত্যানন্দ দেখলেন তার এই কথা শুনে সমস্ত যুবতীরা অট্টহাসি হেসে উঠলো আবার পরক্ষণেই সকলে ছুটে এসে তার দেহের মধ্যে ঢুকে গেলো। নিত্যানন্দ এই আকস্মিকতায় পরম বিস্ময়ে যখন ভাবতে চেষ্টা করলেন তখনি দেখতে পেলেন তার দেহ থেকেই দিব্য নারী মূর্ত্তি। এই নারী মূর্ত্তি থেকে আবার অসংখ্য নারী মূর্ত্তির সৃষ্টি হলো। তারা সকলেই মাল্য ভূষিতা সুন্দরী এবং যুবতী।

পরক্ষণেই দেখতে পেলেন এক দিব্য শ্যামকান্ত কিশোর মৃদু হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে আসছে সঙ্গে এক অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী। সেই দিব্যদেহধারী কিশোর কিশোরী তার কাছে এসে বসলো। দিব্য শ্যামকান্তি কিশোর বললো আমায় চিনতে পারছো না ? আমি যে তোমার ছোট আদরের ভাই কানাইয়া। শরৎকালে, যমুনা পুলিনে এই কিশোরী রাধা রাণী এবং গোপীদের নিয়ে রাসলীলা করায় তুমি কি রাগই না করে ছিলে আমার উপর। তাই তো গোপীদের তোমার কাছে পাঠালাম তোমার সঙ্গে রাসলীলা করার জন্য। আমি করেছিলাম শারদ পূর্ণিমায় তুমি করো বসন্ত পূর্ণিমায় গোপীরা, দাদাকে তোমরা রাঙিয়ে দাও। আমরা চলি।

দিব্য কিশোর কিশোরীদের পরিচয় পেয়ে নিত্যানন্দের শরীর বার বার পুলকিত হতে থাকলো। তিনি বুঝতে পারলেন একই দেহে পুরুষ ও প্রকৃতির অংশ রয়েছে। প্রকৃতির অংশের আকর্ষণে প্রকৃতি আকৃষ্ট হয় আর পুরুষ আকর্ষণে পুরুষ আকৃষ্ট হয়। জীবদেহে প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী বলেই জীবকে প্রকৃতির বশীভূত থাকতে হয়।

রাসলীলা পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির নয়, রাসলীলা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার খেলা। তাই রাসলীলা গোলকের সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা। রাসলীলা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম নরলীলা। যে লীলায় নিত্য আনন্দ দান করে সেই লীলাই শ্রেষ্ঠ লীলা আর যেখানে মধুর রস সেখানেই নিত্য আনন্দ। তাই কুবেরের নামও রাখা হয়েছে নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দের সমাধী ভাঙ্গার পর দেখতে পেলেন হাজারো কণ্ঠে মানুষ হরিনাম কীর্ত্তণ করছে। চার শংকরাচার্য ধ্যানস্থ হয়ে সংকীর্ত্তনের মাধুর্য লীলা ভোগ করছেন। গুগ্গুলো ধুপের গন্ধে মন্দিরের আকাশ বাতাস সুগন্ধে ভরপুর।

নিত্যানন্দের সমাধী ভঙ্গের পর কীর্ত্তন শুনে উঠে দাঁড়ালো। গুরুদেবকে এবং চার শংকরাচার্যকে প্রণাম করে হাজারো কণ্ঠের সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিত্যানন্দও গান ধরলেন—হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ।

নিত্যানন্দের উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে অনেকে তাল মেলালেন। গ্রাম থেকে অনেক আবির আর কুমকুম এলো। বৈশাখ মাসেই যেন বসন্ত উৎসবের পূর্ণ বন্দনা শুরু হলো।

কলিতে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং সুভদ্রার স্বয়ং অবতার। তাহলে তিনি আবার কেমন করে বলরামের অবতার হবেন? নিজের মনেই সংশয় দেখা দেয় নিত্যানন্দের পরক্ষণেই তার মনে কে যেন বলে দেয় - নারায়ণ যদি এক অংশে হয় দশরথের চার পুত্র রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন রূপে জন্ম গ্রহণ করতে পারেন তাহলে বলরাম এক অংশে দ্ব-অবতার হতে পারবেন না কেন?

জগন্নাথ মহাপ্রভু ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে স্বপ্নে বলেছিলেন— জগন্নাথ অবতার রূপে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তিনি চার বর্ণের মানুষকে একত্রে বাঁধতে চান। সে জন্যই জগন্নাথ মন্দির সকলের জন্য ধর্ম নির্বিশেষে খোলা থাকবে

জগন্নাথ মন্দিরে তাই ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদ ছিলোনা। পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত দেখা দিলে এবং মুসলমানগণ দেব মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করা শুরু করলে মুসলমানদের জন্য জগন্নাথ মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

জগন্নাথের মন্দিরে বহু বার ভোগ নিবেদন করা হয়। জগন্নাথ মন্দিরে এবং পুরীতে একাদশীই নয়, কোন উপবাসই নেই। সেজন্য মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সময় থেকেই সেবাইত পাণ্ডাগণ খাওয়া দাওয়া করেই জগন্নাথের সেবা করেন। জগন্নাথের মহাপ্রসাদও সকল শ্রেণীর মানুষকে একই সারিতে

বসিয়েই পরিবেশন করা হয়।

ব্রাহ্মণদের প্রধান নটি গুণের মধ্যে অন্যতম গুণ হলো সর্ব জীবে সমভাব। আর সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও তাই। সন্ন্যাসীরা নিজেকে যেমন ব্রহ্মার অংশ বলে মনে করেন, জগতের সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন তাই সন্ন্যাসীদের কাছেও জাত পাতের বিচার নেই! কিন্তু, সমাজে সন্ন্যাসীদের বিশেষ মর্যাদা লাভের জন্য কলির সন্ন্যাসীগণ নিজেদের সমাজ থেকে আলাদা করে রাখেন।

চার শংকরাচার্য ভারত বর্ষের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মূল স্তম্ভ স্বরূপ। ভগবান্ শংকরাচার্য বৌদ্ধদের হাত থেকে বৈদিক ধর্মকে উদ্ধারের জন্য আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমন করে শুধু যে তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধ গুরুদের পরাজিত করে সশিষ্য তাদের হিন্দু ধর্মের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছিলেম তাই নয়, ভারতের ভৌগলিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চার স্থানে চারটি বিশাল মঠ স্থাপন করে চার সুযোগ্য শিষ্যকে চার মঠের গুরু পদে বসিয়েছিলেম এই চার মঠের চার অধ্যক্ষর উপাধীও হলো শংকরাচার্য। হরিদ্বারে যোষী বা জ্যোতিমঠ। সেই মঠের প্রথম আচার্য তথা শংকরাচার্য হয়েছিলেন কোটকাচার্য। সারদা মঠ দ্বারকায়। প্রথম আচার্য হয়েছিলেন হস্তামূলক। গোবর্দ্ধন মঠ পুরীতে। গোবর্দ্ধন মঠের প্রথম আচার্য পদ্মপাদ। শৃঙ্গেরী মঠ রামেশ্বরমে। শৃঙ্গেরী মঠের প্রথম শংকরাচার্য হলেন—সুরেশ্বর।

শৃঙ্গেরী মঠের অধিষ্টাতা দেবতা হলেন— আদিবরাহ। গোবদ্ধন মঠের জগন্নাথ; সারদা মঠের সিদ্ধেশ্বর। যোশী মঠের নারায়ণ। অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন— শৃঙ্গেরী মঠে কামাক্ষী। গোবর্দ্ধন মঠে বিমলা। আর জ্যোতি মঠে পুন্ন গিরি।

আদি শংকরাচার্য জানতেন মানুষ প্রকৃতির অধীন। ভগবান যখন অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে মর্তধামে লীলা করেন

তখন তিনিও প্রকৃতিকে নির্ভর করেই লীলা প্রকাশ করেন। তাই প্রত্যেক, সাধক-সাধিকারই শক্তির উপাসনা একান্ত প্রয়োজন। শংকরাচার্যও তাঁর চার মঠে চার দেবীকে স্থান দিয়েছেন সে কথা মনে রেখেই।

যোশী মঠের শংকরাচার্য নিত্যানন্দকে বুঝাতে চাইলেন — প্রকৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখা নয়, প্রকৃতির কৃপা লাভ হলেই ব্রহ্মদর্শন সম্ভব। প্রকৃতি যেহেতু আমাদের সমস্ত সত্তা জুড়েই রয়েছেন। প্রকৃতিই যেহেতু আমাদেয় সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ তাই প্রকৃতিকে জীব মাতৃরূপে কল্পনা করলেই আর কোন বিপদ থাকে না যতক্ষণ প্রকৃতিকে মাতৃরূপে কল্পনা করা সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ প্রকৃতির ভজনা করাই কর্তব্য। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পরও প্রকৃতির মায়ার মোহিত হয়ে অনেকে তাদের পূর্ব স্মৃতি ও সাধন ভজন বিস্মৃত হয়েছেন।

সত্যানন্দ গিরি বললেন — তোমাদের এমন একটি কাহিনী শোনাবো যা থেকে বুঝতে পারবে প্রকৃতির মায়া কেমন অমোঘ!

একদা ভগবান বিষ্ণু ও নারদ পরিক্রমায় বের হয়েছেন। নারদের মনে একটু অহংকার জন্মেছে যে তিনি মায়াকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্রাহ্মণ বেশে দুজন ঘুরতে ঘুরতে এমন এক স্থানে এসেছেন যেখানে কাছাকাছি কোথাও জল নেই। শুধু বালি আর বালি দেখা যাচ্ছে। নারদ বুঝতে পারলেন তারা নিশ্চয়ই কোন এক মরুভূমির কাছে এসে হাজির হয়েছেন। হাঁটতে হাঁটতে এবং গরমে জল তেষ্টাও পেয়েছে। কিন্তু, কাছে কোথাও জল দেখতে পাচ্ছেন না। এমন সময় ছোট্ট একটি গাছের ছায়া দেখে নারায়ণ হঠাৎ বসে পড়লেন। তিনি যেন অত্যন্ত ক্লান্ত এমন ভাব দেখালেন এবং বললেন নারদ, আমার ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে। তুমি আমার জন্য একটু জল নিয়ে এসো।

জলের কথা শুনেই নারদের জল পিপাসাও অনেক গুণ বেড়ে গেলো। তিনি তৎক্ষনাৎ জলের খোঁজে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর একটা সরোবর দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন এক পরমা সুন্দরী কন্যা কলসী কাঁখে সরোবরের দিকে এগিয়ে আসছেন।

নারদ সুন্দরীর সৌন্দর্যে যেমন মুগ্ধ হলেন ঠিক তেমনি খেয়াল হলো নারায়ণের জন্য জল নিয়ে যাবার মতো কোন পাত্র তার সঙ্গে নেই। ভাবলেন সুন্দরীর কাছ থেকে কলসীটি চেয়ে নিয়ে নারায়ণের জন্য জল নিয়ে যাবেন।

নারদ হঠাৎ দেখতে পেলেন সুন্দরী সরোবর থেকে জল ভরতে গিয়ে পাড় ভেঙ্গে সরোবরে পড়ে গেছে। পড়ার সময় বাঁচাও বলে একবার চিৎকার করে উঠেছে। তারপর ক্রমেই হাত পা ছুরতে ছুরতে জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে।

নারদ বুঝতে পারলেন যুবতী সাঁতার জানে না। তার সামনে একটি নারী মারা যাবে এ কেমন করে হয়। তিনি দ্রুত সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে যুবতীটিকে রক্ষা করলেন।

সরোবরের পাড়ে সুন্দরীকে নামানোর পর সুন্দরী যুবতীটি বললেন ভদ্র আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। শাস্ত্রে আছে যে পুরুষ নারীর ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেন কিংবা ভার গ্রহণ করেন তিনিই সেই নারীর পতি বা প্রভু। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করে পূর্ণজন্ম দিয়েছেন তাই আপনি প্রভু। আমি অবিবাহিতা ব্রাহ্মণ কন্যা। আপনাকে ব্রাহ্মণ বলেই মনে হচ্ছে। আপনি আমার হাত ধারণ করায় কোন পুরুষ আমায় বিয়ে করতে রাজী হবেন না। আপনি আমায় বিয়ে করতে রাজী না হলে পুনরায় সরোবরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা ব্যাতিত আমার কোন পথ থাকবে না। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করে আবার মৃত্যুর কারণ হবেন একথাও আমি বিশ্বাস

করিনা। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। আমি মারা গেলে আমার পিতাও আর বাঁচবেন না! সুতরাং আপনাকে ব্রহ্ম হত্যার অপরাধেও অপরাধী হতে হবে। আপনি যা ভালো বুঝেন তাই করুন।

নারদ এই আস্মিক ঘটনায় নারায়ণের কথা, জলের কথা, নিজের কথাও ভুলে গেছেন। ব্রহ্মহত্যা, নারী হত্যার সম্ভাব্য পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য নারদ যুবতীকে বিয়ে করতে রাজী হলেন।

যুবতীর সঙ্গে শাস্ত্র মতে বিবাহ হবার পর একাদিক্রমে ব্রাহ্মণরূপী নারদের সাতটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলো।

ব্রাহ্মণপত্নী প্রতি বছর বারুনী তিথিতে গঙ্গা স্নানের আবেদন জানায় ব্রাহ্মণরূপী নারদের কাছে। কিন্তু, ব্রাহ্মনের ভয় পাছে গঙ্গার স্রোতে ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হয়। তা হলে সে কি নিয়ে বাঁচবে।

সাতটি পুত্রই একটু বড় হলে ব্রাহ্মণীর কথায় বারুনী তিথিতে সাত পুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে ব্রাহ্মণরূপী নারদ গঙ্গা স্নানে গেলেন।

গঙ্গায় অসংখ্য নরনারী বারুণী তিথি উপলক্ষ্যে স্নান করছেন। ছেলেরাও অন্যান্যদের মতো গঙ্গায় স্নান করতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ রাজী হলেন না পাছে তারা গঙ্গার জলে ভেসে যায় এই ভয়ে। শেষে তিনি একটা মোটা দড়ি বের করে ছেলেদের বললেন তোমরা এই দড়ি ধরে স্নান করো আমি দড়ির এক মাথার ধরে রাখবো।

ব্রাহ্মণ দড়ির একমাথা শক্ত করে ধরে রাখলেন আর সাত ছেলে দড়ি ধরে গঙ্গা স্নানে নামলো। স্নান করতে করতে নদীতে কখন যে বান এসেছে তা ছেলেরা কিংবা ব্রাহ্মণ খেয়াল করেনি। বানের এক ঝটকায় ব্রাহ্মণের হাত থেকে দড়ি ছুটে

গেলো আর ব্রাহ্মণের সাত ছেলেই বানের জলে ভেসে গেলো। ছেলেদের এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে ব্রাহ্মণীরও বানের জলে ঝাঁপ দিলো

ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও পুত্রদের শোকে হাপোস নয়নে কাঁদতে লাগলেন। হঠাৎ নারায়ণের ডাকে নারদের চমক ভাঙলো। নারদ দেখতে পেলেন গাছের নীচে বিষ্ণু বসে আছেন। সেও বসে আছে। নদী, সন্তান, ব্রাহ্মণী এসবের কোন চিহ্নই নেই।

নারদ বুঝতে পারলেন বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হয়ে তিনি সংসার যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছেন। নারায়ণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন— প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন প্রকৃতির মায়াকে অতিক্রম করা আপনি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

সত্যানন্দজী বলতে থাকেন নিত্যানন্দ, আমরা অমৃতের সন্তান একথা সত্য কিন্তু, অমৃত যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্র অমৃতের স্পর্শে অমর হলেও অমৃতের কোন রূপান্তর ঘটে না। অমৃতের স্পর্শে বিষ অমৃতে পরিণত হয় বিষের ক্রিয়ায় অমৃতের গুণ নষ্ট হয় না। যারা ঈশ্বর দর্শন করেছেন তাদের ঈশ্বরের প্রতি আকুলতা বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ কম হলেই আবার ভাবের পতন ঘটে।

ভগবান বিষ্ণুর সারূপ্য ও সালোক্য লাভ করেও বৈকুণ্ঠে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর মন্দিরের দুই দ্বারী জয় বিজয়ের পতন ঘটেছিলো।

ভগবান রামচন্দ্র নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষের মতোই যন্ত্রনায় আর্তনাদ করছিলেন। পবন দেব এসে রামচন্দ্রের কানে কানে যখন বললেন -- শ্রীরাম আপনি স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার, আপনার বাহন গরুরের নাম শুনলেই নাগেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। আপনি মায়ার মোহে নিজেকে বিস্মৃত হয়েছেন। আপনি গরুরকে স্মরণ করুন, আপনার স্বরূপকে

বুঝতে চেষ্টা করুন।

পবন দেবের কথায় শ্রীরাম চন্দ্রের নিজের স্বরূপ জানতে পারলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র নিজের স্বরূপ জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই মায়া অন্তর্হিতা হলেন। শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ মাত্র গরুর এসে হাজির হলো। গরুরের ছায়া দেখা মাত্র নাগেরা শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে ছেড়ে পাতালে পালিয়ে গেলো।

শ্রীমদ্ ভাগবতে অবধুত অধ্যায়ে মহামতি শুকদেব অবধুতের চব্বিশজন গুরুর কথা উল্লেখ করেছেন। অবধুতের গুরুদেব মধ্যে কুকুর, সাপ, গাছ, দূর্বা প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত।

চার প্রকারের ভক্তের কথা শ্রী ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চার শ্রেণীর ভক্তদের কেউ অর্থের জন্য, কেউ যশের জন্য, কেউ ইহকাল ও পরকালের সুখের জন্য এবং কেউ মোক্ষলাভের জন্য সাধনা করে থাকেন।

যারা সুখ ভোগের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন তারা তমগুণি ভক্ত। যারা যপ্ তপ্ করে স্বর্গ ও মোক্ষলাভের বাসনা করেন তারা রজগুণী ভক্ত আর যারা ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে এবং ঈশ্বর প্রীতির জন্য ঈশ্বরের সেবা করেন, তারাই সত্বগুণী ভক্ত।

মহর্ষি কপিল মা দেবহুতিকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়ে ছিলেন সংক্ষেপে তোমায় বলছি শোন।

মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ হলো মানুষের চিত্ত। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হলে বন্ধনের কারণ ঘটে। চিত্ত আসক্তি শূন্য হলেই ঈশ্বর প্রেম জাগে। আমাদের নিত্যকর্ম এমনভাবে করতে হবে যাতে কখনো আসক্তি না আসে। আমরা ভগবানের ভজনা করি ভগবানের কৃপালাভের জন্য। ভগবানের দর্শন লাভের জন্য। তিনি কৃপা করলে মুহূর্তেই তার দর্শন লাভ হতে পারে আর তিনি কৃপা না করলে কোটি জন্মে তার দর্শন নাও মিলতে পারে।

জয় বিজয় অষ্ট প্রহর ভগবানের দর্শন ও স্পর্শ পাওয়া সত্বেও

রজঃগুণী হয়ে পড়েছিলেন যার জন্য দৈত্য কুলে তাদের জন্ম নিতে হয়েছিলো। মানুষ এখন ঈশ্বর দর্শন করার আগেই কিছু বিভূতি পেয়ে নিজেই ভগবান সেজে বসে।

আত্মা মায়াবলে যিনি ভুত সমূহের অন্তরে নিয়ন্তা হয়ে এবং বাইরে কাল রূপে অবস্থান করেন তিনিই ভগবান। কালকে তিনিই নিযুক্ত করেন। কাল হলো পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব। এই পঁচিশ তত্ব হলো— ১) পঞ্চমহাভুত ২) পঞ্চ তন্মাত্র, ৩) দশ ইন্দ্রিয় ৪) চার অন্তরেন্দ্রীয় ৫) কাল।

পঞ্চমহাভুত হলো— ক্ষিতি, অপ; তেজ, বায়ু ও আকাশ। পঞ্চ তন্মাত্র হলো— রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ। দশ ইন্দ্রিয় হলো— কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, পাদ, পায়ু, উপস্থ বাক্ ও পানি। আর চারটি অন্তরেন্দ্রীয় হলো— মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং চিত্ত। আর পঞ্চবিংশতি তত্ব হলো— কাল।

আমাদের দেহে ভগবান পাঁচ রূপে অবস্থান করেন। তাকে পঞ্চ আত্মা বলে অভিহিত করা হয়। এই পাঁচ আত্মার নাম হলো— জীবাত্মা, ভূতাত্মা, পরমাত্মা, আত্মারাম ও আত্মারামেশ্বর। জীবাত্মা দেহ পরিবর্তন করে নুতন দেহ ধারণ করে। ভূতাত্মা জীবদেহের পাপ পুণ্যের কর্মফল ভোগ করে। পরমাত্মা, আত্মারাম ও আত্মা রামেশ্বর তিন আত্মাই সুখে দুঃখে নির্বিকার থাকে। এই তিন আত্মার বিনাশ নেই। পরিবর্তনও নেই

ইন্দ্রিয় সমুহের গুনের দ্বারা জীবত্মা ও ভুতাত্মা প্রভাবিত হয়। কাজ করে। কিন্তু, তিন পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়ের গুনা-গুণ স্পূর্শ করতে পারেনা। ভগবানে আত্মসমর্পন করার জন্য সাধনার প্রয়োজন,। মুখে বললাম ভগবান তুমিই সব। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে নিজে কর্ত্তা সেজে থাকলাম তা হলে ঈশ্বর দর্শন কখনো হবেনা। আর শুধুমাত্র ঈশ্বর দর্শন করেই সাধনার শেষ হয়না। মনের মাঝে ঈশ্বরকে সর্বক্ষণের জন্য বসানোর জন্যই নিয়ত সাধনার প্রয়োজন।

নিত্যানন্দ, তোমার গুরুদেব তোমায় কি আদেশ করবেন জানিনা কিন্তু, তোমার তীর্থ ভ্রমণের অত্যন্ত প্রয়োজন। তুমি তোমার গুরুদেবের আশ্রমে বসে থাকলে ভবিষ্যতে জীব শিক্ষা দিতে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে পারো। গোবিন্দানন্দজীর কাছে আমার প্রার্থনা তিনি তোমায় তীর্থ দর্শনের অনুমতি দান করুন।

গোবিন্দানন্দজী বললেন — মহারাজ, আপনি অন্তর্যামী। নিত্যানন্দের ভবিষ্যতও আপনার নখ দর্পণে। নিত্যানন্দকে তীর্থ দর্শনের অনুমতি আমি আগেই দিয়ে রেখেছি। আপনি নিত্যানন্দকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন তা শুনতে পেয়ে আমরাও ধন্য হয়েছি। নিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণ করে জীব শিক্ষার নিমিত্ত নিজের স্বরূপকে জানতে চেষ্টা করুক আপনি তাকে এই আশীর্বাদ দান করুন।

চার শংকরাচার্যের মহামিলন ঘটছিলো বৈদ্যনাথ ধামে। সঙ্কর্ষণ তথা নিত্যানন্দের আকর্ষণেই।

মুসলমান শাসনে হিন্দু ও বৌদ্ধরা ধর্মরক্ষার প্রানপণ চেষ্টা চালিয়েও সফল হতে পারছে না। প্রতিদিনই বিভিন্ন রাজ্যে প্রধান প্রধান মন্দির এবং বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করার খবর আসছে। ভারতের প্রধান মন্দিরের অন্যতম সোমনাথ মন্দির, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থান। বৃন্দাবনের রাধা-গোবিন্দ মন্দির। কাশ্মীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। পুরীধামের জগন্নাথ বিগ্রহ ও বিনষ্ট করে দিয়েছে মুসলমানেরা। ভারতের অন্যতম বিখ্যাত মন্দির পুরীর জগন্নাথ মন্দির। জগন্নাথ কলিতে স্বয়ং অবতার হয়েছেন কলির জীব উদ্ধারের জন্য। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সময়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার ছিলো।

মুসলমান সম্প্রদায়েরও জগন্নাথ দর্শনে কোন বাঁধা ছিলো না। কিন্তু তবু যখন মুসলমানেরা জগন্নাথ বিগ্রহ ধ্বংস

করলো তখন মুসলমানদের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

নিত্যানন্দের মনে হয় রাজনীতিকরা সাধারণ মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করছেনা মানুষের ঈশ্বরের সন্তান। ভগবানের সন্তান, আল্লার সন্তান। এজন্যই ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ ও উন্মাদনা দেখা দিচ্ছে।

হিন্দুধর্মে দু-ধরণের উপাসক। সাকার ও নিরাকার উপাসক। নিরাকার উপাসকগণ ব্রহ্মের উপাসক, জ্ঞানের উপাসক, জ্ঞান জন্মালেই ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞানমিশ্র ভক্তিকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধাভক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। না বুঝে ভক্তি শ্রদ্ধা করলে তা কোন কারণবশতঃ বিনষ্ট হতে পারে। কিন্তু, জ্ঞানের মাধ্যমে যখন ভক্তি শ্রদ্ধা আসে তখন তাকে সহজে বিনষ্ট করা যায় না। নিত্যানন্দ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো মানুষকে ভালোবাসাই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এ কথাই সে মানুষকে শেখাতে চেষ্টা করবে।

পুণ্যধাম কাশী। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশ দিয়েই একসময় পতিত পাবনী গঙ্গা প্রবাহিত হতো। মহাদেবের মস্তক চুম্বন করে কলহাস্য গঙ্গা লক্ষ মানুষকে নিজের স্পর্শে পবিত্র করে চলে যেতো মৃদু মন্দ গান গেয়ে। কালের প্রবাহে গঙ্গা মন্দির থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে। মূল মন্দির মুসলমানেরা দখল করে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ায় আবার বিশ্বনাথের নতুন মন্দির স্থাপিত হয়েছে।

বিশ্বনাথ যিনি আশুতোষ নামে পরিচিত তিনিও মুসলমানদের রোষ থেকে রক্ষা পান নি। নিত্যানন্দ মনি কর্ণিকার ঘাটে স্নান করে ভিজে কাপড়েই এগিয়ে গেলো নূতন বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকে।

মুসলমান শাসন সত্বেও মনি কর্ণিকার ঘাটে পুণ্যার্থী হিন্দু-

দের স্নানের ভিড় বিন্দু মাত্র কমেনি। নিত্যানন্দ মনে মনে ভাবেন গঙ্গাদেবী তো শুধু হিন্দুদেরই নন। তিনি তো তার পবিত্র স্পর্শে, পরম করুণায় সকল শ্রেণীর ও ধর্মের মানুষেরই উপকার করে যাচ্ছেন।

গঙ্গাতে তো লক্ষ লক্ষ মুসলমানও স্নান করেছে। মুসলমানের স্পর্শে মন্দির অপবিত্র হয় গঙ্গার জল কি মুসলমানদের ছোঁয়ায় অপবিত্র হয় নি।

সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে গিয়ে নিজের অজান্তেই হেসে ওঠে নিত্যানন্দ। তথাকথিত ধর্মীয় নেতা এবং রাজনীতিবিদদের যদি শক্তি থাকতো তাহলে সূর্যের আলো এবং নদীর জল নিয়েও এরা বিভেদ করার প্রয়াস থেকে বিরত থাকতো না।

নবীন ব্রহ্মচারীকে দেখে অনেক স্নানার্থীই পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিলো। একজন নূতন একটি ধুতি এগিয়ে দিলো নিত্যানন্দের দিকে। বললো বাবা, তুমি এই কাপড়টা পরে আমায় আনন্দ দান করো।

নিত্যানন্দ মনে মনে ভাবলো কাশীতে স্বয়ং বিশ্বনাথ ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। অন্নপূর্ণা স্বামীর ভিক্ষুক বেশ দেখে বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রভু, আপনার এই বেশ কেন? আপনি কি চান?

বিশ্বনাথ বলেছিলেন দেবী, তুমি কথা দাও কাশীতে যারা বাস করবে তাদের কখনো যেন অন্নকষ্ট না হয়।

দেবী অন্নপূর্ণা শিবঠাকুরকে কথা দিয়েছিলেন কাশীতে একজনও অভুক্ত থাকবে না। কিন্তু নিত্যানন্দ তিন দিন কাশীর বিভিন্ন ঘরে ভিক্ষা নিতে গিয়ে দেখেছে অন্নপূর্ণা তার কথা রাখেন নি। বহু মানুষ তিন বেলা খাবার যোগাড় করতে পারে না। কলিকাল বলে তিনিও হয়তো নিদ্রামগ্ন।

শিবঠাকুরের কাশীতে যারা মরবে তাদের শিবলোক প্রাপ্তি

হবে। কাশীতে প্রচুর মুসলমান রয়েছে। এরা জন্মগ্রহণ করছে এবং মারা যাচ্ছে। শিবের কথা সত্য হলে মুসলমানদেরও তো শিবলোক প্রাপ্তির কথা। নিত্যানন্দ বললো ঠাকুর, মানুষকে সুমতি দাও।

চার শংকরাচার্য এবং দীক্ষা গুরু গোবিন্দানন্দজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিত্যানন্দ গয়ার পথে এগিয়ে চলে।

গয়া হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান। এখানে মানুষ শ্রীহরির পাদপদ্মে পিতৃ ও মাতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেন।

মানুষের পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করতে হয় প্রেতাত্মাকে। মৃত্যুর পর প্রেতাত্মাই কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন নরক ভোগ করে থাকে। ভগবান নারায়ণ গয়াসুরকে বর দিয়ে বলেছিলেন — এখানে মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করলে প্রেতাত্মার নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। যত বড় পাপীই হউক না কেন গয়ায় পিণ্ডদানের পর সেই পাপীর প্রেতাত্মারও মুক্তি লাভ হবে।

নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী। পরনে সাদা কপিন গায়ে সাদা কাপড়। কাঁধে সাদা কাপড়ের তৈরী ভিক্ষা পাত্র।

বিশাল ফল্গুনদী দেবী সীতার অভিশাপে চড়ায় পরিণত হয়েছে। পাণ্ডারা ফল্গুনদীর বুকে বালি সরিয়ে এখানে সেখানে জলকুণ্ড তৈরী করে রেখেছেন। যারা গয়াধামে পিণ্ড দিতে যায় তারা যে পাণ্ডার শরণ নেয় সেই পাণ্ডার কুণ্ডে তাদের স্নান করার ব্যবস্থা হয়। পাণ্ডারাই গয়া ও ফল্গুনদীতে পিণ্ডদান, অক্ষয় বটের কাছে পিণ্ডদান ও প্রেতশিলায় পিণ্ডদানের জন্য বড় একটি কুণ্ড রয়েছে। সেই কুণ্ডের ধারে বড় একটি পাকা বাঁধানো ঘাটও রয়েছে। সেখানে অসংখ্য মানুষ স্নান করছে।

নিত্যানন্দ গায়ের কপিন এবং ভিক্ষার পাত্র পাড়ে রেখে নারায়ণ বলে জলে নেমে পড়লেন। স্নান সেরে মনে মনে নারায়ণের স্তব সেরে পাড়ে উঠতেই একজন পাণ্ডা বললেন —

ব্রহ্মচারীজী, কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি এক ব্রহ্মচারী ফল্গু নদীতে স্নান সেরে পাড়ে উঠার পর তাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে গেছি প্রসাদ পাওয়ার জন্য। আমার একটি মাত্র পুত্র দীর্ঘ দিন যাবত অসুস্থ। কথা বলতে পারেনা, খেতেও চায়না। কঙ্কাল সার দেহ হয়ে গেছে। সেই ব্রহ্মচারী মাধুকরী খানিয়ে আমার ছেলেকে খাইয়ে দেবার পরই আমার ছেলের অসুখ ভালো হয়ে গেছে। স্বপ্নে যে ব্রহ্মচারীকে দেখেছিলাম আপনিই সেই ব্রহ্মচারী। আপনি দয়া করে আমার বাড়ীতে একবার পদধুলি দিয়ে আমার ছেলেকে রক্ষা করুন।

নিত্যানন্দ বললো—আপনার স্বপ্ন সত্য হবে কিনা জানিনা। আপনার বাড়ীতে আমি অবশ্যই যাবো। তার আগে আমি গয়ার তীর্থস্থানগুলো একবার দর্শন করে নিতে চাই।

পাণ্ডা বললেন—আমার নাম দামোদর পাণ্ডা। আমাকে গয়ার সকলেই চেনে। আপনি আমার বাড়ীতে মাধুকরী গ্রহণ করে বিকেলে তীর্থস্থান দেখতে বের হবেন। আমি আপনাকে টাঙ্গার ব্যবস্থা করে দেবো। আমার ছোট ভাই আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবে।

—পাণ্ডাজী, শুভস্য শীঘ্রম্ বলে একটা কথা আছে। আমি আগে তীর্থস্থান দর্শন করবো। ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মে ফুল দেবো, তারপর যাবো। আমার মনে হয় আপনি আমার হয় আপনি আমার সঙ্গে আসতে অমত করবেন না।

দামোদর পাণ্ডা স্বপ্নে দেখা ব্রহ্মচারীকে দেখতে পেয়ে মনে মনে এতই উত্তেজনা বোধ করছিলেন যে ভাবছিলেন ব্রহ্মচারীকে বাড়ী নিয়ে একদণ্ডের মধ্যেই ভোজন করিয়ে ছেলেকে প্রসাদ দেবেন। চার বছর যাবত তের বছরের সুন্দর, সুঠাম ছেলে বিছানায় পড়ে থাকতে থাকতে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দামোদর পাণ্ডার বংশ লোপ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ছেলের আকাঙ্খা করতে করতেই আরো চারটি মেয়ে হয়েছে। তাই নিত্যানন্দের

কথা শুনে সঙ্গেই সঙ্গেই বললেন – চলুন ব্রহ্মচারীজী আপনাকে আমি মোটামোটিভাবে ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি সকলেরই বিস্ময়, কৌতুহল এবং শ্রদ্ধা। দামোদার পাণ্ডা বিভিন্ন বিষয়ে নবীন সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দও একে একে উত্তর দিতে লাগলেন।

দামোদর পাণ্ডা বললেন মহারাজ, আপনি চ্যবন ঋষি সম্পর্কে কিছু বলুন।

শ্রীপাদ শুরু করলেন চ্যবন ঋষির কথা। চ্যবন ঋষি ছিলেন ভগবান ভৃগুর পুত্র।

উপনয়ন সংস্কারের পরই তিনি তপস্যা করতে বনে চলে যান এবং ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা শুরু করেন। হাজার হাজার বছর তপস্যা করায় যেমন দস্যু রত্নাকরের শরীর উই এর মাটিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো ভৃগুপুত্র চ্যবন ঋষির শরীরও তেমনি ভাবেই উই এর মাটিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। দূর থেকে মনে হতো যেন বিরাট এক উই এর ঢিপি।

ইক্ষাকু বংশীয় রাজা শর্যাতি কালক্রমে সেই পরিস্কার করে এক মনোরম উদ্যান ও সরোবর নির্মাণ করেন। উই এর ঢিপি বিনষ্ট করতে গেলে ইক্ষাকু বংশের কুল পুরোহিত ব্রহ্মর্ষি বশিষ্টদেব রাজাকে বললেন রাজন এই ঢিপির ভেতর এক মহাত্মা গভীর তপস্যায় মগ্ন রয়েছে এই ঢিপি যেন কেউ স্পর্শ না করেন।

মহারাজ শর্যাতি তার লোকজনদের তখন বিশেষভাবে সতর্ক করে দেন এবং কেউ যেন এই ঢিপি স্পর্শ না করে তার জন্য তাদের সাবধান করে দেন।

মহারাজ শর্যাতির পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিলো। নাম ছিলো সুকন্যা। সুকন্যা একদিন উদ্যানে বেড়াতে গেলে রক্ষিরা মাটির ঢিপি স্পর্শ করতে নিষেধ করে দেন। রাজকন্যা কৌতু-

হলী হয়ে টিপির কাছে গিয়ে দেখতে পান দুটো উজ্জ্বল চোখের মতো দেখা যাচ্ছে।

চ্যবন ঋষি রাজকন্যাকে কৌতুহলী হয়ে চোখের মধ্যে আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করতে দেখে তাকে সাবধান করে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু, তার ক্ষীণ কণ্ঠসর রাজকন্যাও তার সখীদের কল কোলাহলে শোনা গেলো না। রাজকন্যার মনে হলো মাটির নীচে যেন ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তখন রাজকন্যা কাটা দিয়ে উজ্জ্বল পদার্থ দুটোর গায়ে আঘাত করলে অস্ফুষ্ট ধ্বনি ভেসে আসে এবং উজ্জ্বল পদার্থ দুটো থেকে রক্ত পড়তে থাকে। রাজকন্যা ও সখীগণ ভীতা হয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। পরদিন শর্যাতির রাজত্বের সকল মানুষের পায়খানা প্রস্রাব হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার মানুষ রাজার কাছে এসে এর প্রতিকার প্রার্থনা করতে লাগলেন। রাজা গুরুদেব বশিষ্টের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বশিষ্ট তখন রাজকন্যার অন্যায় কাজের কথা বর্ণনা করলেন এবং শীগগীর উদ্যানে গিয়ে মহাপুরুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন।

মহারাজ নিজ কন্যা ও পাত্র-মিত্র সহ উদ্যানে উই এর টিপির কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে উই এর টিপির নীচ থেকে উত্তর এলো যদি রাজকন্যা স্বেচ্ছায় তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় তা হলেই রাজ্যবাসীর বিপদ কেটে যাবে।

রাজকন্যা সুকন্যা নিজের অপকর্মের জন্য খুবই দুঃখিত হয়েছিলো এখন রাজ্যবাসীর দুঃখের অবসানের জন্য এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তখনি অদেখা ঋষিকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেলো।

উই এর টিপি সরিয়ে অস্থিচর্মসার একজন কংকালরূপী ঋষিকে বের করে আনা হলো। তিনি তার নাম বললেন। অস্থিচর্মসার এবং রাজকন্যা কর্তৃক অন্ধ হয়ে যাওয়া চ্যবন ঋষির

সঙ্গেই মহারাজ তার মেয়ের বিয়ে দিলেন।

ঋষির কথা মতো সেই উদ্যানেই একটি পর্ণকুটির তৈরী করে দেওয়া হলো এবং রাজ কন্যা রাজবেশ ত্যাগ করে ঋষি কন্যার বেশ ধারণ করে স্বামী সেবায় নিয়োজিত হলো।

দৈবক্রমে সেই সরোবরে রাজ কন্যা স্নান করার সময় আকাশ মার্গে ভ্রমনরত অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের নজরে পড়ে যান। মানবীর এই অপার্থিব রূপে মুগ্ধ হয়ে অশ্বিনী কুমারদ্বয় রাজকন্যার সামনে প্রকট হয়ে রাজকন্যাকে স্ত্রীরূপে প্রার্থনা করেন।

রাজকন্যা তখন অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের কাছে সব কথা খুলে বলেন। অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হয়। তারা রাজকন্যাকে বলেন যে তার স্বামী শুধু দৃষ্টি শক্তিই ফিরে পাবেন না তাদেরই মতোই দেব শরীর লাভ করবেন।

তার স্বামী এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয় এক সঙ্গে জলে ডুব দেবেন সরোবর থেকে উঠলে পর, যদি রাজকন্যা তার স্বামীকে সঠিক ভাবে চিনতে পারেন। তা না হলে সে স্বামীকে ফিরে পাবে না এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয়কেই বিয়ে করতে হবে।

দেবগনের প্রস্তাবে পতিব্রতা সুকন্যা রাজী হয়েগেলেন। তিনি বুঝতে পারেন রসিকতা করেই দেবতাদ্বয় শর্ত রেখেছেন। সতীর পক্ষে নিজ পতিকে চিনে নিতে কোন অসুবিধে হয়না। তবু বললেন— স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে তার কাছ থেকে অনুমতি পেলে আমার পরীক্ষা দিতে আপত্তি নেই।

পতিব্রতা সুকন্যা পতিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রস্তাবের কথা জানালেন। চ্যবন ঋষি অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের কথা শুনে আনন্দিত হলেন। তিনি দেবতাদের প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং তাদের কথা মতোই সরোবরে ডুব দিলেন।

চ্যবন ঋষির সঙ্গে সেই দেবতাদ্বয়ও সরোবরে ডুব দিলেন। যখন সরোবর থেকে উঠলেন তখন তিন জনের এক

পোষক' এক চেহারা এবং এক আকৃতি। তবুও দেবতাদ্বয় ঠকে গেলেন। সতী সুকন্যা নিজ পতিকে চিনে নিলেন।

দেবতাদ্বয় তখন চ্যবন ঋষির কাছে প্রার্থনা জানালেন তারাও যাতে যজ্ঞের হবি দেবগণের সঙ্গে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে। চ্যবন ঋষি রাজী হলেন এবং শ্বশুর রাজা শর্যাতীকে যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন।

যজ্ঞে অশ্বিনী কুমারদের হবির ভাগ দেওয়ায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে পুরোহিত চ্যবন ঋষির প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন। চ্যবন ঋষি তপস্যা বলে এতই বলীয়ান হয়েছিলেন যে দেবরাজ ইন্দ্র এবং বজ্রকে স্তব্ধ করে শূণ্যে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। ইন্দ্র চ্যবন ঋষির তপস্যার পরিচয় পেয়ে দেবগণের সঙ্গে অশ্বিনী কুমারদের যজ্ঞের ভাগ দিতে রাজী হলেন।

দামোদর পাণ্ডা জিজ্ঞেস করলেন, আমার ছেলে ভালো হবে তো? —আপনার ছেলে তো ভালই আছে। রক্ত মাংসে শক্তি নেই। শক্তি রয়েছে অস্থি ও মজ্জায়। আপনার ছেলে চার বছরে যে নাম সুধা পান করেছে তাতে স্থুল জগতের খাদ্য খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি সঞ্চয় হয়েছে। আপনি উষ্ণ জলের ব্যবস্থা করুন। আপনার ছেলে স্নান করে আমায় সঙ্গে উপাসনা সেরে আমাদের সঙ্গেই ভোজন করবে।

স্নানের জন্য উষ্ণ গরম জলের ব্যবস্থা হলে নিত্যানন্দ ছেলেটিকে হাতে স্পর্শ করলেন। কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন—নমোঃ নারায়ণায়।

ছেলেটি চোখ মেলে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলো— নমোঃ নারায়ণায়।

নিত্যানন্দ বললেন ঋষিবর, আপনি পূর্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ নিজে ভাব সমাধীতে মগ্ন থাকলেও আপনার মা বাবা বড়ই কষ্ট ভোগ করছেন। আপনি কৃপা করে স্নান সেরে আমাদের সঙ্গে ভোজনে বসে আমাদের কৃতার্থ করুন।

শিবচরণ বললো —প্রভু আপনি বৃথা আমায় লজ্জা দিচ্ছেন। আমি জানি আপনি কে। আপনি আসবেন আমি জানতাম। শুনেছিলাম কলি যুগে স্বয়ং কৃষ্ণ ও বলরাম বলভদ্র এবং জগন্নাথ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এখন দেখছি বলভদ্রের স্বয়ং অবতার নিত্যানন্দ রূপেও আবির্ভূত হয়েছেন কলির জীব উদ্ধার করতে। আপনি আমায় সেই মহামন্ত্র দান করুন যে মহামন্ত্র আপনি সন্দীপন ঋষির কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

—আমি এখন ব্রহ্মচারী। তীর্থ দর্শনে বের হয়েছি। আমার কাউকেই মহামন্ত্র দানের অধিকার নেই। তবে নাম সকলেই সকলকে শোনাতে পারে। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে রাধারাণী ব্রজবাসীকে কৃষ্ণ নাম শুনিয়েছিলেন। রাধাভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রাণা আর বৃন্দাভাবে তিনি নাম প্রচারিকা। তুমি আমার সঙ্গে গাও – 'ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণের নামরে। যে জন আমার কৃষ্ণ ভজে সে হয় মোর প্রাণ রে'

দুপুরে দামোদর পাণ্ডার বাড়ীতে সমস্বরে কৃষ্ণ নামের রোল উঠায় আস পাশের মানুষ ছুটে এলেন এবং যারা এলেন তারাও নিত্যানন্দের মতো দুহাত ভুলে কৃষ্ণ কীর্ত্তন গাইতে শুরু করলেন।

দামোদর পাণ্ডার বাড়ী মুহুর্তে উৎসব মুখর হয়ে উঠলো। দামোদরের স্ত্রী রত্নাদেবী একা সামান্য কিছু রান্না করেছিলেন ঠাকুরের কাছে ভোগ লাগানোর জন্য। নিত্যানন্দ বললেন—গোঁসাই আপনার বাড়ীতে যারা এসেছে তারা সকলেই কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে ছুটে এসেছে। দুপুরে তারা কি আপনার বাড়ীতে প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না ?

দামোদর পাণ্ডা বললেন—মহারাজ, আমি আমার ছেলের পরিচয় পেয়েছি। শুধু একটি কঙ্কাল এমনভাবে নাচতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বুঝতে পেরেছি নাম সত্য,

নামী সত্য। পাণ্ডাগিরি করেও মনে এতদিন বিশ্বাস জাগেনি। আজ জেগেছে। আমার বাড়ীতে কৃপা করে যারা এসেছেন তারা সবাই প্রসাদ পাবেন। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

তীর্থরাজ প্রয়াগ। সর্বতীর্থে স্নান করলে যে ফল লাভ হয় এক তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নান করলেই সেই ফল লাভ হয়। নিত্যানন্দ তাই ঠিক করলেন আগে প্রয়াগ দর্শন করবেন। ত্রিবেনীর জলে স্নান করে একমাস প্রয়োগে বাস করবেন তারপর হরিদ্বার যাবেন।

নিত্যানন্দ একাকী পথ চলেছেন। খবরা খবর দেওয়া নেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে সরাইখানা ও চটির ব্যবস্থা রয়েছে। এক একটি চটি কিংবা সরাইখানার দূরত্ব প্রায় পাঁচ ক্রোশ। এক একটি চটে কিংবা সরাই খানার কাছেই রয়েছে ছোট্ট সিপাহ-শালা। এরাই ঘোড়ায় চড়ে এক চটি থেকে আর এক চটিতে খবর পৌছে দেয়।

নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী চার হাত একটা বেতের দণ্ড সঙ্গে নিয়েছেন। বনপথ চলার এক মাত্র সম্বল এই দণ্ড বা লাঠি।

একবার জনপদ পার হলেই জঙ্গল। জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, বানর এবং সাপের বড় উপদ্রপ। ডাকাতের দলও বনের মাঝে লুকিয়ে থাকে পাথিকের সর্বস্ব কেড়ে নেবার জন্য। আবার কোন কোন সরাই খানার মালিক কিংবা সিপাহশালারদের কেউ কেউ ডাকাতের সঙ্গে জড়িত থাকে।

নিত্যানন্দের চোর ডাকাতের ভয় নেই। সঙ্গে টাকা কড়িও নেই। পোষাক পরিচ্ছদও নেই। নিত্যানন্দ আপন মনেই মৃদু শব্দে গান গায়ে বনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলছেন। যে গ্রামটি নিত্যানন্দ দিনের প্রথম সময়ে পাড় হয়ে এসেছে গ্রামের লোক নিত্যানন্দকে বন্য পশু ও ডাকাতের হাত থেকে সাবধান থাকতে বলে দিয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে

থাকতে মনের কোমলতা একদম হারিয়ে ফেলেছে।

নিত্যানন্দ হঠাৎ অশ্বের খুর ধ্বনি শুনতে পেলেন। বনের নিরবতাকে খান খান ক'রে ধুলা উড়িয়ে এগিয়ে আসছে কয়েকজন অশ্বারোহী। নিত্যানন্দের কাছাকাছি এসে একে একে অশ্বারোহী সৈনিকরা থেমে গেলো।

নিত্যানন্দকে প্রথম অশ্বারোহী সৈনিকটি জিজ্ঞেস করলো— কোত্থেকে আসা হয়েছে? কোথায় যাবে?

নিত্যানন্দ উত্তর করলেন — অনেক দূর থেকে এসেছি। প্রয়াগ তীর্থ দর্শন করতে যাচ্ছি।

—প্রয়াগে গিয়ে কি হবে? তোমাদের ভগবান তোমায় দর্শন দেবে। বড়লোক বানিয়ে দেবে? তার চাইতে আমাদের সঙ্গে চলো। তোমার যে শরীর এই শরীর সাধু সন্ন্যাসীর উপযুক্ত নয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার উপযুক্ত।

— সুস্থ দেহ সকল কাজেরই উপযুক্ত। অসুস্থ ও রুগ্ন দেহ কোন কাজের নয়। আপনারা আপনাদের সময় নষ্ট না করে দয়া করে এগিয়ে যান। শুধু বলে দিন বন অতিক্রম করতে আমার কতটা সময় লাগবে।

নিত্যানন্দের কথা শুনে অট্টহাসি হেসে ওঠে সৈনিকটি। বলে সাধু, আমাদের কাছে কাফের বিধর্মী বলে পরিচিত। কাফের হত্যা করলে আমাদের বেহেস্তের রাস্তা পরিষ্কার হয় বলে শুনেছি। এই নির্জন বন ভূমিতে তোমার রক্তে মাটি ভিজিয়ে দিলে কোন কাফের তা জানতে পারবেনা। কিন্তু, বেহেস্তে আমার জন্য আল্লার দোয়া অপেক্ষা করবে।

—বিধর্মী খুন করলে স্বর্গবাস হয় এমন কোন কথা কোন ধর্ম গুরু বলতে পারেন বলে মনে হয় না। বিধর্মী অর্থের বিকৃত ব্যাখ্যা তোমাদের মৌলবীরা করছেন। বিধর্মী কথার মূল অর্থ হলো যে ধর্ম্ম মানে না। ধর্মকে শ্রদ্ধা করে না, ভালো বাসেনা।

এক কথায় বিধর্মী হলো অধার্মিক। আমাদের ধর্ম বলা হয়েছে বিধর্মীর ভেতর যে শয়তান লুকিয়ে আছে তার বিনাশ ঘটাও। বিধর্মীকে খুন করে নয়, অধার্মিকে খুন করে নয়, তার ভেতরকার অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে ভক্তদের আলোকের পথে অধার্মিক-কে ধর্ম পথে নিয়ে আসার জন্যই সাধু মহাত্মার আবির্ভাব। সে জন্যই গুরু করণ করা প্রয়োজন। আমরা সকলেই অপূর্ণ, একমাত্র তিনিই পূর্ণ। আল্লার যেমন কোন রূপ নেই, তেমনি ঈশ্বরেরও কোন রূপ নেই। ঈশ্বরকে আরাধনার সুবিধার জন্য হিন্দুরা নিজেদের পছন্দ মতো রূপ কল্পনা করে ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। ভেতরে যখন জ্ঞানের বিকাশ ঘটে তখন আর মূর্তি পুজার প্রয়োজন হয় না। আমার দিকে তাকিয়ে দেখো, তোমার আর আমার মধ্যে কত মিল রয়েছে। আমাদের ভাষা আলাদা, কৃষ্টি আলাদা, পেশা আলাদা, ধর্ম আলাধা। কিন্তু, আমরা মানুষ। এই আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানুষ মানুষকে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

এক সৈনিক বললো—সাধু, তুমিতো বেশ মজার কথা বলছো! অন্য কোন হিন্দু সাধু হলে এই নির্জন বনে মুসলমান সৈনিকদের তরবারীর সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতো। অথচ তোমাকে তেমন ভয় পেতে দেখছিনা। তুমি কি মৃত্যুকে ভয় করো না?

—মানুষ মানুষ সৃষ্টিও করতে পারেনা, পালন করতেও পারে না। ধ্বংসও করতে পারেনা ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিত একটি গাছের পাতাও পড়েনা। তোমরা আমার এই দেহকে ধ্বংস করতে পারো, তোমার এই দেহও স্বাভাবিক ভাবেই হউক কিংবা অস্বাভাবিক ভাবেই হউক একদিন ধ্বংস হবেই। কিন্তু, তোমার ভেতর যে পরমাত্মা রয়েছে তার কখনো বিনাশ নেই। সেই পরমাত্মা কখনো অপবিত্র হয় না। তাই আমিও আমার এই অনিত্য দেহ নিয়ে মোটেও ভাবিনা। ভাই ধর্ম

ছাড়া জীবনে সব বৃথা। সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যাও।

সৈনিকটি বললো— সাধু তোমার কথা আমাদের খুবই ভালো লাগছে। সামনে যে চটি আছে সেখানে যে কয়েকজন সিপাহী রয়েছে তারা হিন্দু বিদ্বেষী। আমার মনে হয় তোমায় একা পেয়ে তারা কিছুতেই তোমাকে প্রয়াগ দর্শনের সুযোগ দেবে না। তুমি বরং আমাদের সঙ্গে চলো অন্য রাস্তা দিয়ে তোমাকে প্রয়াগের পথে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে দেবো।

—ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। এই যে বললাম ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া একটা গাছের পাতাও পড়েনা? আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই হয়েছে বলে ধরে নেবো।

—তাই যদি হয় আমি যে আমার ঘোড়ায় করে তোমাকে প্রয়াগের পথে এগিয়ে দেবার কথা বলছি সেটাও কি ঈশ্বরের হতে ইচ্ছা পারে না?

—নিশ্চয়ই হতে পারে। তাই যদি হয় ধরে নিতে হবে ভগবান শ্রীহরি আমার প্রয়াগ দর্শনকে ত্বরান্বিত করতেই আপনাদের পাঠিয়েছেন।

—তাহলে আমার ঘোড়ায় আসুন। সামনে যে চটি পড়বে সেখানে আপনার রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দেবো। ভয় পাবেন না আপনাকে জোর করে ইসলামের খিদমতগার বানাবো না।

—সে ভয় আমার নেই, চলুন।

নিত্যানন্দ জীবনে কখনো ঘোড়ায় চড়েনি। ঘোড়ায় বসতে খুব অসুবিধে হচ্ছিলো। অসুবিধে হচ্ছিলো সৈনিকটিরও কিন্তু দক্ষ ঘোরসোওয়ার হওয়ার সুবাদেই বেলা শেষে নিত্যানন্দকে নিয়ে চটিতে হাজির হলো।

চটির সিপাহী বদল হয়েছে। নিত্যানন্দকে যারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো তারা এই চটির ভার গ্রহণ করেছে আর পরনো যারা ছিলো তারা নতুন চটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। নিত্যান-

নন্দকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেই থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। নিত্যানন্দ একাহারী। সূর্যাস্তের আগেই ফল-মূল খেয়ে যখন রাতে ধ্যান করছিলেন তখন সিপাহীরা এসে ঢুকলো। বললো — সাধুর অসুবিধা করলাম না তো?

—না না। তোমরা তো আমার বন্ধুর কাজ করেছো। হেঁটে আসলে আমার দু-দিন লেগে যেতো।

—কাল আপনাকে আমি আরও কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসবো। এখন আমাদের আপনাদের ঈশ্বরে কথা শোনান।

—ঈশ্বর-আল্লাতে ভাই কোন ভেদ নেই। ভেদ আমাদের মানুষের মনে। তুমি মুসলমান। তোমার দৃষ্টিতে আমি কাফের, বিধর্মী। কিন্তু, তোমার মন তোমাকে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে দেয় নি। তুমি যে একজন তীর্থযাত্রীকে তীর্থে যাবার ব্যাপারে সাহায্য করেছো এটাই বড় ধর্ম। আমরা শত চেষ্টা করলেও একজন মানুষ তৈরী করতে পারবো না। তাই আমাদের ধ্বংসেরও অধিকার নেই আমাদের ধর্মে যারা যুদ্ধ করে, দেশরক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকে তাদের ক্ষত্রিয় বলা হয়। সে হিসেবে তুমিও আমার কাছে ক্ষত্রিয়। দেশরক্ষা কিংবা দেশ জয় জনগণের কল্যানের জন্যই করা হয়। বিনা রক্তপাতে দেশ জয়ের মহত্ব অনেক। ভারতে কত রাজা এসেছে, কিন্তু সম্রাট অশোককে কেউ ভুলতে পারবে না। অশোক অহিংসার তরবারী হাতে বিশ্বজয় করেছিলেন। সৈনিকরা নিত্যানন্দকে আরো কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেল।

নিত্যানন্দ তীর্থে এসে প্রথমে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলেন। তারপর গেলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। শ্রীরাম বনবাসে যাত্রার সময় প্রথমে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এক রাত আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

পৌষ পার্বন উপলক্ষ্যে ত্রিবেনীতে পুণ্য স্নানের উদ্দেশ্যে বহু

দূর থেকে যেমন ভক্তের সমাগম হয় তেমনি বহু পূর্ণার্থী আসেন প্রয়াগে মাঘ ব্রত পালনের জন্য। পৌষ পার্বন থেকে শুরু করে এক মাস প্রয়াগে প্রাতঃ স্নান করলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

হিন্দুরাজা ও জমিদারগণ এই উপলক্ষে সাধু ও তীর্থযত্রীদের কম্বল, তাবু এবং অন্যান্য উপকরণ দান করে থাকেন। যারা একাকী তীর্থ ক্ষেত্রে আসেন তাদের থাকার জন্যও হিন্দু রাজগণ বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকেন। তীর্থ ক্ষেত্রে আসার পথে মুসলমান সৈনিক এবং ডাকাত দলের দ্বারা কোন কোন সময় তীর্থ যাত্রীগণ সর্বশান্ত হয়ে পড়েন। এমন কি যাত্রীদের সহায়তা করতেও হিন্দু রাজগণ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাদের ফিরে যাবার পাথের এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

নিত্যানন্দ ঠিক করলেন এই একমাস জেগে নারায়ণের নাম করে কাটিয়ে দেবেন। দুপুরে যদি সুযোগ হয় তাহলে একটু ঘুমিয়ে নেবেন নয়তো এই একমাস লক্ষ্মণের মতোই নিদ্রাদেবীকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। লক্ষ্মণ যদি চৌদ্দ বছর নিদ্রাদেবীকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন তাহলে সে একমাস পারবে না কেন?

বিভিন্ন পাতা দিয়ে ছোট্ট একটা চালা তৈরী করে নিত্যানন্দ জপের স্থান ঠিক করলেন। প্রত্যেকদিন রাতের শেষ প্রহরে ত্রিবেণীতে স্নান সেরে চালায় ফিরে এসে ধ্যানে বসতেন। বেলা এক প্রহর অবধি জপ ধ্যান চলতো।

নিত্যানন্দ অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করে এই মাঘ ব্রত পালন করবেন ঠিক করলেন। প্রথম দিন বিকেলে এক ভক্ত প্রণাম করে বড় একটি আপেল এনে দিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় দিন থেকে ফলের পাহাড় জমতে থাকলো। ধ্যানের সময় কে যে কখন ফল দিয়ে যাচ্ছে তা নিত্যানন্দ জানতে পারলেন না। দিনের

ইসলামিক শাসনে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন না তাই বেশ বদল করেছেন। আমরা কুরুক্ষেত্রে যাচ্ছি আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চান তাহলে চলুন।

কুরুক্ষেত্রও পরম তীর্থস্থান। এই স্থানে যে মারা যায় ইন্দ্রের বরে তাদের স্বর্গবাস হয়। তাই কুরু পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রকেই তাদের যুদ্ধ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

কিছুদূর গিয়ে ভাঙ্গা একটি মন্দির। মন্দিরের উপর বিশাল বটগাছ উঠেছে। বট গাছের অসংখ্য শেকড়ে মন্দিরটি জীর্ণ দশায় পড়েও মাটিতে পড়েনি। মন্দিরের ভেতর একটি বড় পাথরের মূর্তি। মূর্তিটিরও ভগ্ন দশা। হাতে একটি গদা। একটি বানর বললো এটি বলরামের মন্দির। রাজা দুর্যোধন তৈরী করিয়েছিলেন। বিগ্রহটি মুসলমানদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় হিন্দুরা এটি ত্যাগ করেছেন।

বলরামের মূর্তি ভাঙ্গার কথা শুনেই নিত্যানন্দের মধ্যে বলরামের আবেশ হয়। তিনি হুংকার করে বলেন — ওদের এতোবড় সাহস! এক্ষুনি লাঙ্গলে হস্তিনাপুর যমুনায় ফেলে দেবো। ওরা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। ওদের আয়ু মাত্র দেড় হাজার বছর। দেড় হাজার বছর পর মুসলমানেরা যাদবদের মতোই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় ধ্বংস হবে।

কুরুক্ষেত্র দর্শন করে দুর্যোধন যে সরোবরে আত্মগোপন করেছিলেন সেখানে গেলেন। নিত্যানন্দ বানরদের বললেন প্রভু, আপনারা কে আমি এখনো পরিচয় পাইনি। আপনাদের সঙ্গে চলতে গেলে আপনাদের বানর বেশ আমাদের অসুবিধায় ফেলতে পারে। যদি অসুবিধা না হয় আপনারা মানুষের বেশ ধারণ করে আমার তীর্থ দর্শনে সাহায্য করুন।

নিত্যানন্দের কথা মতো তারা দুজনেই সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন। এক সন্ন্যাসী বললেন— প্রভু, আমি হনুমান আর ইনি বিভিষণ। আপনি তীর্থে চলেছেন দেখে আমরা আপনাকে

শেষে যে ফল অবশিষ্ট থাকতো সেই সব ফল ভোর রাতে স্নান সেরে সকল দেব দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে নদীর তীরে এক স্থানে জমা রেখে আসতেন।

নিত্যানন্দের ইচ্ছে ছিলো প্রয়াগ দর্শনে করে হরিদ্বার লক্ষণ ঝোলা, ব্যাস গুহা, ব্রহ্মাতীর্থ এবং বদরিকাশ্রম হয়ে বৃন্দাবন যাবেন। কিন্তু প্রয়াগে একমাস কাটানোর পর মনে হলো আগে শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীরাম চন্দ্রের জন্মস্থান দর্শন করে তারপর অন্যতীর্থে গমন করবেন।

প্রয়াগ থেকে নিত্যানন্দ প্রথমে হস্তিনাপুর এলেন। হস্তিনাপুরেই রয়েছে পাণ্ডাদের শেষ সময়ের অসংখ্য স্মৃতি। হস্তিনাপুরের পুরানো ইট, পাথর যেন তাকে দেখে বলে উঠেছে — জয় রাম, জয় রাম।

হস্তিনাপুরে মহারাজ যুধিষ্ঠির মুনি ঋষিদের থাকার জন্য ময় দানবকে দিয়ে একটি মনোরম মন্দির গড়ে তুলেছিলেন। তৈরী করেছিলেন এক মনোরম উদ্যান। সেই উদ্যান এখন হিংস্র সাপের বাসভবন। নিত্যানন্দ সেই উদ্যানের ধুলি গায়ে মেখে নারায়ণ, নারায়ণ বলে উচ্চস্বরে কিছুক্ষণ রোদন করলেন। কাছে কোন লোক থাকলে নিশ্চয়ই নিত্যানন্দকে উন্মাদ বলে মনে করতো। নিত্যানন্দ দেখতে পেলেন দুটো বানর গুটি গুটি তার দিকে এগিয়ে আসছে। নিত্যানন্দ তাদেরও প্রণাম জানালেন।

বানর দুটো পরিস্কার মানুষের ভাষায় জিজ্ঞেস করলো— বলভদ্র আপনার অতীতের কথা মনে পড়েছে বুঝি?

— না ভাই, আমি ভাবছি যে স্থানে দুর্বাশা ধৌম্য নারদ ঋষি প্রভৃতির পদধুলি পড়েছে আজ সেখানে সাপ বৃশ্চিক বিরাজ করছেন।

— আপনি একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন এই সাপ ও বৃশ্চিকেরা সকলেই এক একজন মহাপুরুষ পবিত্র স্থানে

সঙ্গ দিতে এলাম। আমাদের ইচ্ছে প্রভু শ্রীরাম চন্দ্রের জন্মস্থান দেখে তারপর মথুরায় যাই। আপনার কী আদেশ?

— আপনারা আমার প্রণাম গ্রহন করুন। আপনারা দুজনেই পরম ভাগবত। দুজনেই অমর। দুজনেই ত্রিকালজ্ঞ,। আপনারা আমায় যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাবো।

শ্রীরাম চন্দ্রের জন্মস্থান দর্শন করলে হলে গভীর রাতে সেখানে যেতে হবে। যেখানে আপনাদের জন্ম হয়েছিলো. যেখানে রাজা দশরথের রাজপ্রাসাদ ছিলো সেখানে একটি মসজিদ গড়ে তোলা হয়েছে। প্রভু শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষণের বিগ্রহে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আসুন, আমরা এগিয়ে যাই।

নিত্যানন্দ ওদের সঙ্গে রাত এক প্রহরের পর মসজিদের এলাকায় ঢুকলেন। কষ্টি পাথরের কারুকার্য খচিত থাম গুলো ছাড়া শ্রীরাম মন্দিরকে সনাক্ত করার কোন পথ নেই। নিত্যানন্দ সেখানকার মাটি গায়ে মেখে শ্রীরামের শোকে অনেকক্ষণ কাঁদলেন।

হনুমান বললেন— লক্ষণ ঠাকুর, চলুন আমরা সরযুতে স্নান করতে যাই। মুসলমানেরা একটু পরেই ভোরের নামাজ পড়তে আসবে।

— চলুন।

সরযু নদীতে স্নান করে সরযু নদীর পাড় ধরে তিনজন এসে উপস্থিত হলেন গুহক চণ্ডালের বাড়ী।

ইট পাথরের কোন চিহ্নই নেই। রয়েছে একটি আদিবাসী গ্রাম। হনুমান বললেন— প্রভু গুহক চণ্ডাল ছিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র রাজা, দশরথ হরিণ শিকারে গিয়ে ভুল বশতঃ অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু মুনিকে তীরবিদ্ধ করেন। তারপর সিন্ধু মুনির পরামর্শে তার দেহ অন্ধ পিতার কাছে পৌছে দিলেন।

অন্ধ মুনি রাজা দশরথকে অভিশাপ দেন— পুত্রশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হবে।

রাজা দশরথ অপুত্রক ছিলেন। অন্ধ মুনির শাপ শুনে খুশীই হলেন। পুত্রশোকে অন্ধ মুনি ও তার স্ত্রী দুজনেই প্রাণ ত্যাগ করলেন। রাজা তিন জনের সৎকার করে ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কুল পুরোহিত বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন।

বশিষ্ঠ তখন বাড়ী ছিলেন না তার বড় ছেলে তুলসী পাতায় তিনবার রাম নাম লিখিয়ে দশরথের প্রায়শ্চত্য করান! বশিষ্ঠ সন্ধ্যায় ফিরে এসে পুত্রের এই কাজের কথা শুনে তাকে চণ্ডালরূপে জন্ম গ্রহণ করার অভিশাপ দেন। তার অপরাধ তিনি তিনবার দশরথকে রাম নাম লিখিয়েছেন। বশিষ্ঠের বরেই ত্রেতায় শ্রীরামের দর্শন লাভ করে গুহক চণ্ডাল চণ্ডাল জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করেন। ঐ যে একজন আদিবাসী সর্দার এগিয়ে আসছে তিনি গুহক চণ্ডালের অবতার। আপনার স্পর্শে ও মুক্তি লাভ করবে।

আদিবাসী সর্দারকে জড়িয়ে ধরে নিত্যানন্দ জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকেন। নিত্যানন্দের বাহ্যজ্ঞানক্রমে লুপ্ত হয়ে আসে। হনুমান আদিবাসী সর্দারকে বললেন— সর্দার, প্রভু ত্রেতা যুগের লীলা দর্শন করছেন। যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরে আসে ততক্ষণ আপনারা শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকুন।

কিছুক্ষণ পর নিত্যানন্দের জ্ঞান ফিরে আসে। নিত্যানন্দের জ্ঞান ফিরতেই আদিবাসী পল্লীতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জ্ঞান ভুলে গিয়ে গ্রামের সকলেই আনন্দে মেতে উঠেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সকলকেই কৃপা করেন।

উপজাতি সর্দারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিত্যানন্দ এগিয়ে চলেন দ্বারকার দিকে। সঙ্গে হনুমান ও বিভিষণ। দ্বারকায় পৌঁছে সমুদ্রে স্নান করেন। শ্রীকৃষ্ণ নির্মিত দ্বারকাকেই

সমুদ্র গ্রাস করায় আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

প্রভাস তীর্থে এসে নিত্যানন্দের আবার বলরামের আবেশ হয়। ব্রাহ্মণরূপী বিভিষণ ও হনুমান অনেকক্ষণ চেষ্টা করতে থাকেন নিত্যানন্দের চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য। তারা দেখতে পান নিত্যানন্দের হাত পা যেন ক্রমেই শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। মনে হলো হাত ও পায়ের অর্ধেক অংশ শরীর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখের আকৃতিও কেমন যেন বিকৃত হয়ে পড়েছে।

হনুমান ও বিভিষণ এবার বুঝতে পারলেন প্রভাস তীর্থে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা শুনতে শুনতে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের শরীর কুর্মাকৃতি হয়েছিলো শুধু তাই নয়, দ্বারে সুভদ্রা দ্বাররক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

দেবর্ষি নারদ যখন সুভদ্রা হরণ পর্ব সত্যভামাও রুক্মিনী সহ শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে শোনাচ্ছিলেন তখন সুভদ্রার দেহও লজ্জায় কুর্মাকৃতি হয়েছিলো।

দেবর্ষি নারদ সহ সকলেই এই অভাবনীয় ব্যাপারে বিস্মিত এবং কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়লো। দেবর্ষি নারদ পুনরায় বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তন শুরু করলে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা পূর্বাবস্থায় ফিয়ে আসেন।

দেবর্ষি নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বিকৃত আকার ধারণের কারণ জিজ্ঞেস করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন কলি যুগে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা রূপে স্বয়ং পুরীতে এই আকৃতিতেই তারা প্রকাশিত হবেন।

নিত্যানন্দের পূর্ব কথা স্মরণ হওয়াতে প্রভাস তীর্থে দ্বাপর যুগে যে অবস্থা হয়েছিলো সে অবস্থাই নিত্যানন্দের হয়েছে।

বিভিষণ ও হনুমান তখন শ্রীবিষ্ণুর চব্বিশ অবতারের মহিমা কীর্ত্তন শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিত্যানন্দ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

নিত্যানন্দ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন ভাগবতগণ, আমি কি কোন অন্যায় করে ফেলেছি !

হনুমান হাত জোর করে বললেন গোঁসাই প্রভাস তীর্থে অত্যন্ত গোপনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শ্রী ব্যাসদেব মহাশয়ের কৃপায় আমরা সে তথ্য জানতে পেরেছিলাম। আজ আপনার কৃপায় দ্বাপর যুগের গুহ্য লীলা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে নিজেদের ধন্য করলাম।

শৈশব কালেই বৃন্দাবন দর্শনের আশা জেগেছিলো। বহু দিনের সাধ পূর্ণ হলো। বৃন্দাবনে দ্বাদশ বন ও উপবন রয়েছে একবার শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি ঝোপ ঝাড় আর কাটা গাছে ভরপুর।

যমুনা নদীতে স্নান করে প্রথমেই নিত্যানন্দ মদন গোপাল মন্দির দর্শন করতে গেলেন। মদন গোপাল মন্দির বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ মন্দির। রাজপুত রাজগণ সকলেই নিজের সাধ্য মতো সাহায্য দিয়ে মন্দিরকে ঐশ্বর্য্যময় করে তুলেছেন। সাত তলা মন্দির। লাল পাথরে নির্মিত। চারিদিকে সু-উচ্চ প্রাচীর। বিরাট ফটকের দ্বার।

বৃন্দাবন কৃষি প্রধান এলাকা। কৃষি জীবিদেরই বাস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি দর্শন করতে ভারতে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর তীর্থ যাত্রীরা আসেন। মদন গোপাল মন্দির দর্শন করেন। কেউ কেউ কষ্ট করে দ্বাদশ বন, চব্বিশ উপবন ঘুরে দেখতে চেষ্টা করেন।

নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে পৌঁছানোর পর হনুমান ও বিভিষণ বিদায় নিয়েছেন। বলেছেন শ্রীপর্বতে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।

একা হয়ে নিত্যানন্দ যেন আরো বেশী করে ব্রজলীলার মাধুর্য উপলব্ধির সুযোগ পেলেন।

বৃন্দাবনের সামান্য দূরে দ্বাপর যুগে বিরাট তাল বন ছিলো। দ্বাদশ বনের প্রায় প্রত্যেকটি তাল গাছে গাছে মৌমা-

ছিরা বাসা বাঁধতো। বৃন্দাবনে মধুর লোভে দূর-স্থান থেকে ছুটে আসতো মধু আহরণকারীর দল। নিত্যানন্দ তাকিয়ে দেখলেন মাঝে মাঝে কোন বাড়ীতে তাল গাছের উঁচু শির দেখা গেলেও কোথাও বাগানের চিহ্ন মাত্র নেই। তাল বন ধ্বংস হয়ে গেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে কালীয় নাগকে দমন করেছিলেন তার পাশেই ছিলো বিশাল কালীদহ হ্রদ। এখন হ্রদের চিহ্ন মাত্রও নেই। কোথায় কালীয় নাগকে দমন করেছিলেন? নিত্যানন্দ যখন মনে মনে একথা ভাবছিলেন তখনই দেখতে পেলেন শ'গজ দূরে এক গাছের নীচে বিশালকায় এক সাপ ফনা উঁচু করে হিস হিস করছে আর গাছের পাখী গুলো ভয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে।

নিত্যানন্দ বুঝতে পারলেন দ্বাপর যুগে ঐখানেই ছিলো কালীদহ সাগর। আজ হ্রদের চিহ্ন না থাকলেও পানায় ভরা ছোট্ট একটু জলাশয় এখনো কালীদহের অস্তিত্ব বহন করে চলেছে। নিত্যানন্দ দু-হাত তুলে প্রণাম জানালেন কালী নাগের উদ্দেশ্যে।

গোপ বালকেরা এখনো গোবর্দ্ধন পর্বতের আশ-পাশ এলাকায় গো চারনে যায়। গোবর্দ্ধন পাহাড়ের উপর পুণ্যার্থীগণ যায় না। পুণ্যার্থীগণ গোবর্দ্ধন পবতকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে অক্ষয় গোলক বাসের কামনায় গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করেন।

নিত্যানন্দ দেখলেন মাঝে মাঝেই গরুর পাল গোবর্দ্ধন পাহাড়ে কাঁটা ঝোপকে উপেক্ষা করেই উপরে উঠে যাচ্ছে রাখাল বালকগণও বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে পাহাড়ে বার বারই উঠা নামা করছে।

এক ভক্ত মাটির অপরিসর রাস্তায় দাগ কেটে আভূমি প্রণত: হয়ে আবার মাথার পাশে দাগ দিয়ে শামুকের মতো গোব-

র্দ্ধন পরিক্রমার সুচনা করেছেন। গোবর্দ্ধন সাতবার প্রদক্ষিণ করতেই হয় তো ঐ ভক্তের সারা জীবন কেটে যাবে। হয়তো সাতবার পরিক্রমার সুযোগও না পেতে পারেন। আবার রাধারাণীর কৃপা হলে এক মুহুর্ত্তেই সাতবার পরিক্রমার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। বৃন্দাবনে রাধারাণীর কৃপা না হলে কিছুই হয় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী ভূতলে অবতীর্ণ হবেন। তাই ভূতলকেও গোলকের মতো নয়নাভিরাম করে তুলতে বৃন্দাবন, যমুনানদী ও গোবর্দ্ধন পর্বতকে মর্ত্তে অবতরণের ব্যবস্থা করা হলো।

দ্রোনাচল পর্বতের পুত্ররূপে শাল্মলী দ্বীপে গোবর্দ্ধন পর্বত প্রকটিত হলেন। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহর্ষি পুলস্ত্য গোবর্দ্ধন পর্বতকে কাশী ধামে নিয়ে আসার জন্য দ্রোন পর্বতের কাছে আবেদন জানালেন।

মুনির শাপ ভয়ে ভীত দ্রোন পর্বত পুত্রকে মুনির হাতে সমর্পন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পুলস্ত্য মুনি গোবর্দ্ধনকে কাশী ধামে নিয়ে যাবেন শুনে গোবর্দ্ধন তার দেহকে আট যোজন (৬৪ মাইল) লম্বা পাঁচ যোজন (৪০ মাইল) প্রস্থ ও দুই যোজন (১৬ মাইল) উঁচু করেন। মুনিবরকে বলেন মুনি যদি তাকে নিয়ে যেতে পারেন তবে তার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, কোথাও নামাতে পারবেন না। যেখানে নামাবেন সেখানেই গোবর্দ্ধন থেকে যাবেন।

পুলস্ত্য মুনি বিশাল গোবর্দ্ধনকে হাতের উপর উঠিয়ে অনায়াসে কাশীর পথে চলতে লাগলেন।

ক্রমে মুনিবর এসে হাজির হলেন ব্রজমণ্ডলে। ভগবান শ্রীহরির ইচ্ছেতেই সূর্য তখন পাটে বসেছে। মুনিবর সন্ধ্যার সময় আগত দেখে গোবর্দ্ধন পর্বতকে নামিয়ে রেখে সন্ধ্যা-

আহ্নিক সেরে নিলেন। তার পর গোবর্দ্ধনকে 'ওঠাতে চেষ্টা করলে গোবর্দ্ধন মুনির প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। পুলস্ত্য মুনি বুঝতে পারলেন গোবর্দ্ধনের কাশীতে যাবার ইচ্ছে নেই। মুনিবর তখন ভগ্ন হৃদয়ে কাশীধামে ফিরে এলেন আর গোবর্দ্ধন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শনের বাসনায় ব্রজমণ্ডলে থেকে গেলেন।

নিত্যানন্দ মনঃশ্চক্ষে দেখতে পেলেন যে সমস্ত গোপ বালক ও গো-পাল গোবর্দ্ধনের উপর চড়ে বেড়াচ্ছে তারা সকলেই এক একজন মহাঋষি এবং গো-লোকের গোপ বালকবৃন্দ। এরা গোবর্দ্ধন পাহাড়ে চড়ে বেড়ানোর ছলে গোবর্দ্ধনের সঙ্গে খেলা করছেন। নিত্যানন্দ গোবর্দ্ধন, গোপবালক এবং গরুর পালকে প্রণাম জানিয়ে গোবর্দ্ধন পরিক্রমা শুরু করেন। ক্রমাগত তিন দিন তিন রাত্রিতে গোবর্দ্ধনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন।

গোবর্দ্ধন পাহাড়ের সামান্য দূরেই মানসগঙ্গা এবং চক্রতীর্থ। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা-মাতা শ্রীনন্দ ও যশোদার একবার গঙ্গা স্নানের খুব ইচ্ছে হয়। গঙ্গা স্নানের জন্য শ্রীনন্দ যশোদা এবং কয়েকজন বৃন্দাবনবাসী গঙ্গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

বৃন্দাবনকে ধন্য করেছেন যমুনানদী। গঙ্গা বৃন্দাবন থেকে প্রায় এক সপ্তাহের পথ। পথে যেমন গভীর অরণ্য রয়েছে, পশুর আক্রমনের ভয় রয়েছে তেমনি রয়েছে দস্যুদের উপদ্রব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণাময় ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করতে তিনি সদা তৎপর। পালক পিতা মাতা ও বৃন্দাবনবাসীর পথশ্রমকে লাঘব করতে তিনি গঙ্গা দেবীকে আহ্বান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান মাত্র গঙ্গা দেবী মকর বাহিনী হয়ে নন্দ ও যশোদাকে দর্শন দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতাকে বললেন দেখুন, আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে গঙ্গা দেবী স্বয়ং বৃন্দাবনে এসে হাজির হয়েছেন। আপনারা এখানেই স্নান করে গঙ্গা স্নানের অক্ষয় পূণ্য লাভ করুন।

নিত্যানন্দ গোবর্দ্ধন পরিক্রমার সময় কখনো কখনো প্রেমরসে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েছেন। কোন কোন রাখাল বালক নিত্যানন্দের এই অবস্থা দেখে হেসে উঠেছে। আবার কোন কোন গো বালক নিজে গামছা দিয়ে নিত্যানন্দের গায়ের ধূলো ঝেড়ে দিয়েছে।

নিত্যানন্দ প্রথমে মানস গঙ্গায় স্নান করলেন। তারপর চক্রতীর্থে গিয়ে সেখানেও স্নান করে চক্রেশ্বরকে দর্শন করে একটা নিম গাছের নীচে বসলেন। এক গোপী এসে তাকে গব্য ঘি মাখানো রুটি আর তরকারী নিত্যানন্দকে খেতে দিলেন। বিশুদ্ধ ঘি এর গন্ধে স্থানটা ভরপুর হয়ে উঠলো। রুটিগুলোও যেন এইমাত্র আগুনের আঁচ থেকে নামানো হয়েছে। নিত্যানন্দ বুঝতে পারলেন বৃন্দাবনে অহরহ রাধারাণী ও গোপীদের খেলা চলে। এও হয়তো রাধারাণীরই অহৈতুকী কৃপা। গোপী বেশে ক্ষুধার্ত ব্রহ্মচারীকে আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

নিত্যানন্দ নমো নারায়ণ বলে মুখে রুটি তরকারী দিলেন। তারপর বৃন্দাবন লীলার কথা স্মরণ করেই খেতে শুরু করলেন। খাওয়া প্রায় শেষ এমন সময় নমো নারায়ণায় সম্বোধন শুনে চোখ মেলে তাকিয়েই দেখলেন বৈদ্যনাথধামে দেখা নির্মল ভারতী হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন উত্তরে নিত্যানন্দও বললেন নমোঃ নারায়ণায়।

বৈদ্যনাথধামেই নির্ম্মল ভারতী শৃঙ্গেরী মঠের শংকরাচার্যের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তিনিও শৃঙ্গেরী মঠে ফিরে তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। নির্মল ভারতীর সঙ্গে কিশোর কুবেরের সৌহার্দ স্থাপিত হয়েছিলো কয়েক দণ্ডের মধ্যেই। তারপর কুবের সম্পর্কে সব শংকরাচার্যই যখন বিরাট আশার কথা ব্যক্ত করলেন তখন ব্রহ্মচারী নির্মল চৈতন্য মনে মনে কিশোর কুবেরের প্রতি শ্রদ্ধায় নতজানু হয়েছিলেন।

নিত্যানন্দ খাবারের পাত্রটি একটা পাথরের উপর রেখে

নির্মল ভারতীকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। কয়েক মাসের ব্যবধানে দু-জনের বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটলেও অন্তরের দিক থেকে একজন নির্মল আর একজন আনন্দ পূর্ণ হয়ে গেছেন।

নিত্যানন্দ বললেন—মহারাজ রাধারাণীর প্রসাদ। যদি আপত্তি না থাকে তা হলে গ্রহণ করুন।

নির্মল ভারতী বললেন ব্রহ্মচারীজী, আমি সন্ন্যাসী হলেও দ্বৈতা-দ্বৈতা মতে বিশ্বাসী। রাধারাণীই আমার কাছে শক্তি, ব্রহ্ম। প্রসাদ দাও।

—আমার দক্ষিণে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিলো। ভেবে ছিলাম দক্ষিণ শেষ করে তারপর হরিদ্বার সহ অন্যান্য তীর্থে যাবো। আপনাকে পেয়ে খুবই ভালো হলো। আপনি যখন আশ্রমে ফিরবেন আপনার সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

—এ যাত্রায় আমিও বৃন্দাবন থেকেই আশ্রমে ফিরবো। তারপর তোমার সঙ্গেই না হয় পুনরায় ভ্রমণে বের হওয়া যাবে। চলো বিশ্রাম ঘাটে গিয়ে বিশ্রাম করবে।

— চলুন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ কংসকে বধ করে সেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেটাই বিশ্রান্তি ঘাট বা বিশ্রাম ঘাট বলে প্রসিদ্ধ। পুরাণের মতে সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত মানুষ এখানে বিশ্রাম নিয়ে ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্তিলাভ করেন।

বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময়ে চব্বিশটি ঘাট চব্বিশটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিলো। মথুরার আকৃতি খানিকটা পদ্মের মতো। পদ্মাকৃতি মথুরার কর্ণিকাতে শ্রীকেশব পূর্ব দিকে শ্রীবিশ্রান্তি দেব পশ্চিম দিকে গোবর্ধনবাসী শ্রীহরি, উত্তরে শ্রীগোবিন্দ। দক্ষিণে শ্রীবরাহদেব বিরাজিত আছেন।

ব্রজ মণ্ডলের আট দিকে ভগবান বিষ্ণু চব্বিশরূপে বিরাজিত। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ। প্রয়োগ শ্রীমাধব। মন্দারে

শ্রীমধুসূদন বিষ্ণু কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ। মায়াপুরে শ্রীহরি। আনন্দারণ্যে শ্রীবাসুদেব। মথুরাতে শ্রীকেশব দেব।

নির্মল ভারতী বলতে থাকেন – নিত্যানন্দজী চব্বিশ ঘাট, দ্বাদশ বন ও চব্বিশ উপবন ভ্রমণ করে তোমায় নিয়ে দক্ষিণে যাত্রা করবো। দক্ষিণের তীর্থ স্থান তোমায় দেখিয়ে দিয়ে তোমার সংগেই হরিদ্বার ঋষিকেশ যাবো। তারপর যদি বৃন্দাদেবী কৃপা করেন বৃন্দাবনে আবার আসবো।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালে বৃন্দাবনে রাসলীলা সংগঠিত করেছিলেন। রাসলীলার গুহ্য কথা নারদ ঋষির মুখে বলরাম জানতে পেরে তার মনে সাধ জেগেছিলো রাসলীলা করার।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায়। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতরা। গোপীদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের মন থেকে বিরহ ব্যাথা উপশমের জন্য বসন্তকালে বলরাম রাসলীলা করেছিলেন। গোপীরা সেই রাসলীলার অপার্থিব আনন্দ লাভ করেননি। তাদের শ্রীকৃষ্ণ বিরহের শোক আরো দ্বিগুণ মাত্রায় বর্দ্ধিত হয়েছিলো।

কোন কোন গোপী যারা বলরামকেই তাদের প্রাণনাথ বলে জানতেন শুধু তারাই প্রেমরসে পরিপূর্ণ হলেন।

নিত্যানন্দ এবং নির্ম্মল ভারতী বৃন্দাবনের তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে সেই রাসস্থলিত উপনিত হলেন। তার মধ্যে বলরামের আবেশ হলো। নিত্যানন্দ বৃন্দাবনের অপার্থিব লীলা তার মানস পটে উদয় হলো। তিনি দেখতে পেলেন মদিরাপানে তার বিশাল চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু। তাকে ঘিরে শত শহস্র গোপীগণ নাচে গানে মত্ত। তাদের কারো গায়ে কাপড় নেই। কারো পরনের কাপড় পর্যন্ত খুলে গেছে। কারো খোঁপা থেকে ফুলের বেনী ঝরে পড়েছে। কারো শরীর ঘামে সিক্ত হয়ে উঠেছে। কারো চোখের কাজলে মুখে কালীর দাগ পড়েছে। কিন্তু

গোপীরাও আনন্দ রস পান করতে করতে আনন্দ ঘন বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। সকলেই বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেও মায়ার প্রভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সাথে সাথে নাচ গান করে চলেছেন।

নির্মল ভারতী বার বার ডেকে সাড়া না পেয়ে নিত্যানন্দের গায়ে ধাক্কা দিলেন। নিত্যানন্দের মানস পট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত বলরামের রাস উৎসব। নিত্যানন্দ মনে বিমর্ষ হলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন দৈবকীর ঘরে কংসের কারাগারে। তখন ভাদ্র মাস কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমি তিথি। গভীর রাত্রি। তখন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। কারা-রক্ষিরা ছিলো গভীর ঘুমে অচেতন।

শিশু ভূমিষ্ট হবার পরই দৈবকী এবং বসুদেব দেখতে পেলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বসুদেব ও দৈবকীর সন্তান-ভাব দূর হয়ে গেলো। ভক্তি ভরে নারায়ণকে প্রণাম জানালেন। নারায়ণ বললেন তোমরা আমায় গকুলে নন্দরাজের ঘরে রেখে এসো। যশোদার সদ্যজাত শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে কারাগারে ফিরে এসো।

নারায়ণের কথানুযায়ী বসুদেব সদ্যজাত শিশুকে যশোদার পাশে রেখে যশোদার শিশু কন্যাকে নিয়ে ফিরে এলেন। প্রহরীরা জেগে উঠলো. প্রকৃতি শান্ত হলো শিশুর কান্না শোনা গেলো কংস এসে অষ্টম গর্ভজাত সন্তানকে কন্যা দেখে প্রথমে বধ করতে না চাইলেও পরে দৈবমায়া মনে করে যেই আছড়ে মারতে যাবেন এমনি শিশুরূপী মায়া অদৃশ্য হয়ে গেলো। যাবার সময় বলে গেলো তাকে যে বধ করবে সে গকুলে বড় হচ্ছে।

কংস দৈত্যদের আদেশ দিলেন গকুলের সদ্যজাত সব শিশুদের হত্যা করার জন্য। প্রথমেই পাঠালেন পুতনা নামক

রাক্ষসীকে। পুতনা স্তনে বিষ মেখে পরমা সুন্দরী মেয়ের বেশ ধরে শিশুদের বিষাক্ত স্তন পান করিয়ে বহু শিশুকে হত্যা করে। পরে শ্রীকৃষ্ণকে, হত্যা করতে এসে নিজেই নিহত হলো।

শুধু গকুলের নয় মহারাজের বাড়িও কঁটা ঝাঁপে পরিণত হয়েছে,। মাঝে মাঝে উট সেখানে গিয়ে কাঁটা গাছের পাতা খায়। গ্রাম বাসিরা শুনেছে কাঁটা ঝোঁপের কাছেই নন্দ মহারাজের বাড়ী। ওখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছুদিন যশোদার কোলে শিশুরূপে লীলা করেছেন।

নন্দ মহারাজের বাড়ী ও শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত স্থান কাঁটা গাছের ঝোঁপে অনাদরে ঢাকা পড়ে রয়েছে দেখে কান্না পেলো নিত্যানন্দের। তিনি নির্মল ভারতীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ভাই, ভগবানের শ্রীচরণ স্পর্শে যে স্থান পবিত্র হয়েছিলো সে স্থান কাঁটা ঝোঁপে ঢাকা পড়ে গেছে! এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিনা। তুমি একটা দা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসো আমি এই স্থানটা পরিস্কার করবো।

নির্মল ভারতীর হৃদয় ও নিত্যানন্দের আলিঙ্গনে ফুলের মতো কোমল হয়ে গিয়ে ছিলো। তার চোখেও জল এলো। তিনি বললেন নিত্যানন্দজী, দিল্লীতে মুসলমান রাজত্ব চলছে। মুসলমানদের আক্রমনে মথুরা ও বৃন্দাবনে শতাধিক মন্দির ধ্বংস হয়েছে। এই স্থানটিও তাদের দ্বারা যাতে অপবিত্র না হয় সে জন্যই প্রকৃতি নিজেই এই স্থানকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। তুমি হতাশ হয়োনা। চলো এই স্থানকে প্রণাম জানিয়ে আমরা এগিয়ে চলি।

সূর্য মাথার উপরে। প্রচণ্ড গরম। ক্ষুধায় শরীর কাতর। নির্মল ভারতি বললেন — নিত্যানন্দজী চলুন কোন মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করি।

—ভারতীজী গকুল এবং বৃন্দাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলায় পরম পবিত্র হয়েছে। এখানে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে তারাও পরম ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী। এখানকার অপার্থিব লীলা দেখার জন্য কত সিদ্ধ পুরুষও দেবগণ বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। এখানকার প্রতিটি ঘরই দেব মন্দির। গোপীদের হাতের খাবার মহাপ্রসাদ। চলুন কোন বাড়ীতে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করি।

—আমি সন্ন্যাসী তুমি ব্রহ্মচারী। আমাদের পক্ষে কোন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে খাবার এমন কি ভিক্ষা গ্রহণও উচিত নয়। স্ত্রীলোকের মুখ দর্শনও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়।

—আপনি যাদের স্ত্রীলোক ভাবছেন তারা প্রত্যেকেই সাক্ষাৎ গোপীর অংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। যে ফল মূল গ্রহণ করছেন সে ও তো প্রকৃতিরই দান। আমাদের দেহও প্রকৃতির উপাদান দিয়ে গঠিত। চলুন আমরা গোপীদের কাছ থেকেই ভিক্ষা গ্রহণ করি।

একটা টাঙ্গা আসছিলো। সন্ন্যাসী দেখে টাঙ্গা থেমে গেলো। এই টাঙ্গায় কয়েক জন মহিলা। একজন নেমে প্রণাম জানিয়ে বললো—প্রণাম। আমরা মদন গোপাল দর্শনে গিয়েছিলাম। ফিরতে সন্ন্যাসী দেখে মনে হলো আমাদের পূজো সার্থক হয়েছে। আপনারা যদি দুপুরে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন তাহলে আমরা আরো খুশি হবো।

নির্মল ভারতী বললেন— মা আমাদের মধ্যে এতক্ষণ যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো তারই প্রকাশ ঘটলো আপনাদের ভাষায়। আমি সন্ন্যাসী। আমি মদন গোপাল মন্দিরেই যাবো ভাবছি। আমার প্রিয় ব্রহ্মচারী ভাই চাইছিলো আপনাদের সেবা। আপনারা ব্রহ্মচারী মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে যান।

নিত্যানন্দ নির্মল ভারতীর কথায় মনে ব্যথা পেলেন। সাধারণ মানুষকে বুঝানো কষ্টকর। একজন সন্ন্যাসীকে কেন প্রকৃতি বিষয় বুঝাতে পারলেন না সে ব্যথাই তাকে পীড়া দিতে লাগালা।

নিত্যানন্দ বললেন -- মহারাজ আমরা তো দক্ষিণে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আপনি কি আমায় ছেড়ে চলে যাবেন?

—আমি আরো সাতদিন বৃন্দাবনে থাকবো। তারপর তুমি যদি দক্ষিণে যেতে চাও তোমাকে নিয়ে যাবো। তুমি যেখানেই থাকো আর আমি যেখানেই থাকি রাত এক প্রহরের পর ইচ্ছে করলে মদন গোপাল মন্দিরে আমাদের দেখা হতে পারে। আমি চলি। নারায়ণ তোমায় মঙ্গল করুন।

ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের আওয়াজ এলো -- মহারাজ, আপনিও আমাদের সঙ্গে টাঙ্গায় চলুন। টাঙ্গায় গেলে খুব একটা সময় লাগাবেনা।

নিত্যানন্দ চালকের পাশের আসনে গিয়ে বসলেন। তার মনের আশা—তিনি গোপী ভবনে গোপীদের সঙ্গে একরাত কাটিয়ে তাদের কাছ থেকে কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা করে আনবেন।

একটি বড় দালান বাড়ীর সামনে এসে টাঙ্গা থামলো। চারজন মহিলা টাঙ্গা থেকে নামলেন। তিনজন কুমারী। একজন বিবাহিতা। চারজনই সুন্দরী হলেও বিবাহিতা মহিলা খুবই সুন্দরী। পাতলা কাপড়ে ঘোমটা দেওয়া। মুখের অর্দ্ধেক অংশ কাপড়ের আড়ালে ঢাকা।

নিত্যানন্দ দালান বাড়ীর সামনে গিয়ে মহিলাগণ নামলেন। চালক আদাব জানিয়ে টাঙ্গা নিয়ে চলে গেলো। নিত্যানন্দ বুঝতে পারলেন বাড়ীর মালিক বেশ সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি।

দুজন মহিলার হাতে কাপড়ে ঢাকা দুটো বড় প্রসাদের থালা। থালা দুটো রূপোর তৈরী।

পাঁচিলে ঘেরা বিশাল বাড়ীতে পরিচারক পরিচারিকার ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। অবগুন্ঠিতা মহিলা মাথার ঘুমটা ফেলে ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দকে হাত জোর করে প্রণাম জানিয়ে বললো —ব্রহ্মচারীজী আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনার থাকার ঘর দেখিয়ে দিই।

নিত্যানন্দ দেখলেন সামান্য দূরে আলাদা ঠাকুর ঘর। এক জন পরিচারিকা ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে মহিলার সামনে এসে প্রনাম জানিয়ে বললো— মা, ঠাকুরুণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করে এসেছি।

নিত্যানন্দ জিজ্ঞেস করলেন কোন্ ঠাকুর? মহিলা উত্তর করলো— কৃষ্ণ কানাইয়া।

তিন চারটে কক্ষ পার হয়ে খুব সুন্দর একটি কক্ষের সামনে এসে বললো ব্রহ্মচারীজী এই আপনার বিশ্রামের ঘর। আপনি হাত মুখ ধোয়ে বিশ্রাম নিন। আমরা আপনার খাবারের আয়োজন করি।

নিত্যানন্দ ঘরে ঢুকে দেখলেন দেওয়ালে পটুয়াদের আঁকা বিভিন্ন দেব দেবীর ছবি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট কিশোর রূপ। বৃন্দাবনে ও গকুলে কিশোর কিশোরী ভজনই শ্রেষ্ঠ ভজন।

খুব দামী পালঙ্কে সুন্দর করে বিছানা পাতা। যেন তার আগমনের কথা আগে জানতে পেরেই সুন্দর করে বিছানা রাখা হয়েছে বিছানার কাছেই বিরাট একটি হরিণের চামড়া।

পরিচারিকা নিত্যানন্দকে বললো ব্রহ্মচারীজী বিছানার উপর হরিণের চামড়া ও কম্বল বিছিয়ে দেবো? আর যদি কোন সংস্কার না থাকে তা হলে এই বিছানায় বিশ্রাম নিতে পারেন। এই বিছানায় আমরা নিজেরা কেউ বসিনা। সাধু সন্ত এলে এই ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

কাঁসের বড় একটা পাত্রে জল নিয়ে হাজির হলো এক পরিচারিকা। বললো— মা, ব্রহ্মচারীর পা ধোয়ার জল এনেছি। আপনি আদেশ করলে পা ধুইয়ে দিতে পারি।

নিত্যানন্দ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন— না, না, আপনাদের আমার পা ধুইয়ে দিতে হবে না। বরং স্থান দেখিয়ে দিলে আমি নিজেই গিয়ে ধুয়ে আসতে পারি।

গৃহকর্ত্রী বললো—আমার নাম চন্দ্রাবলী। স্বামী আমায় চন্দ্রা বলেই ডাকেন। আপনি সাধু মানুষ। আপনার পদসেবা করলে আমাদের পূণ্য হবে। আপনার আপত্তি কেন? পরের উপকার করাইতো আপনাদের ধর্ম। লবঙ্গ, তুমি একটা পাত্র নিয়ে এসো। আমি ব্রহ্মচারীজীর পা ধুইয়ে দেবো।

নিত্যানন্দ দেখলেন চন্দ্রার কাজে বাঁধা দিয়ে তার মনে কষ্ট হবে। সাধুর সেবায় পুন্য হয় একথা সবাই জানে। বৃন্দাবনে রাধারাণীর কৃপা না হলে কৃষ্ণ দর্শন হবে না। নিত্যানন্দ চুপ করে রইলেন। চন্দ্রা বড় একটা পেতলের পাত্রে নিত্যানন্দের পা দুটো ধরে গোলাপ জলে পা ধুইয়ে দিলো। নূতন একটা গামছা দিয়ে দুটো পা মুছিয়ে দিয়ে বলল আপনি খাটের উপর আরাম করুন। আমি এক্ষুণি আসছি। লবঙ্গ তুমি ব্রহ্মচারীজী একটু সেবা করো।

নিত্যানন্দ বাঁধা দিলেও লবঙ্গ বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে নিত্যানন্দের পা দুটো টিপে দিতে লাগলো নিত্যানন্দ মনে মনে বললেন - হে কৃষ্ণ তুমি আমায় নিয়ে একি লীলা শুরু করেছো

কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রা পাথরের একটা বড় গ্লাসে গরম দুধ এনে দিয়ে বললো - ব্রহ্মচারীজী, এই দুধ টুকু সেবা করুন। আপনার সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে

—সাধু সন্তের ভোজন বিলাসী হতে নেই দিনে একবার

আহারই সাধু সন্তের পক্ষে যথেষ্ট।

—আপনি যুবক আপনার শরীর ঠিক না থাকলে মন ঠিক থাকবে না মন ঠিক না থাকলে সাধন ভজন হবে না। সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত দেহ ঠিক রাখতে হবে। সিদ্ধিলাভ হয়ে গেলে নামের প্রভাবেই দেহ মন পুষ্টি থাকে। ঠিক বলিনি ব্রহ্মচারীজী ?

—আপনি ঠিকই বলেছেন। ঈশ্বর দর্শনের আগে দেহ ও মনকে সুস্থ রাখা একান্ত দরকার।

—লবঙ্গ, তুমি গিয়ে রান্নার ব্যাপারটা দেখো। আমি কিছুক্ষণ সাধু বাবার সেবা করি।

—আপনারা আমায় সংকোচে ফেলে দিলেন।

সাধুদের আবার সংকোচ আছে নাকি। আপনারাই-তো বলেন — ঘৃণা, লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। সকল জীবে যদি সমদর্শন না হয় তা হলে ঈশ্বর দর্শন হবে না

—আপনি তো শাস্ত্র ভালোই জানেন।

—এ যে বৃন্দাবন। রাধারাণীর কৃপায় সকলেই শাস্ত্র জানে। সন্ন্যাসীদের তো কাঠের নারী বিগ্রহ দর্শনও নিষিদ্ধ, তাই না ?

—তাই তো শুনেছি।

—রাধারাণী কি পুরুষ ?

তিনিই তো হ্লাদিনী শক্তি।

—শক্তি মানেই প্রকৃতি। প্রকৃতিতে ঘৃণা করলে রাধারাণীকেও ঘৃণা করা হয়। সন্ন্যাসীরা যে ফল মূল, বাতাস, জল, আলো সবকিছু গ্রহণ করেন তাও তো প্রকৃতিরই দান। প্রকৃতির গর্ভেই তো সকলে জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃতির কোলে বড় হয়েছে প্রকৃতির কৃপায় বেঁচে আছে। আমার স্বামী মোগল দরবারে এক হাজারী মনসবদার। মাসে একবার

একদিনের জন্য আমার এখানে আসেন। আবার যুদ্ধে গেলে এক বছরেও দেখা হয় না। এভাবেই আমাদের আট বছরের বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে গেছে। এক মহাপুরুষ বলেছেন সাধু সেবা করতে। সাধু সেবা করলে নাকি আমার সন্তান হবে। তাই যখনি সাধুর দেখা পাই তখনি বাড়ীতে নিয়ে আসি। আপনাকে কৃপা করে তিন রাত্রি এই বাড়ীতে থেকে আমাদের কৃপা করতে হবে।

—কৃষ্ণ যদি রাখেন তাহলে থাকতেই হবে।

লবঙ্গ এসে বললো— মা, রান্না হয়ে গেছে। সাধুবাবাকে খাবার দেব?

—হ্যাঁ। আসন পেতে দাও, তারপর ভোগ সাজিয়ে নিয়ে এসো। বড় রূপোর থালায় ঘি ভাজা রুটি, তরকারী, দই এবং মিষ্টি।

রাতে নিত্যানন্দ আর ভোগ গ্রহণ করেন নি। চন্দ্রা রাত দ্বিতীয় প্রহরে খুব পরিপাটি করে সেজে গায়ে সুগন্ধি মেখে নিত্যানন্দের খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো। নিত্যানন্দ রাত দ্বিতীয় প্রহরে ঘুমিয়ে পড়েন। চতুর্থ প্রহরের প্রথম দিকে ঘুম থেকে উঠে ধ্যান করতে বসেন।

চন্দ্রা তেলের প্রদীপটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে খাটের পাশে বসে নিত্যানন্দের পা দুটো টিপতে শুরু করলো।

নিত্যানন্দের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। অপরূপ সাজে সজ্জিতা চন্দ্রাকে ঘুমন্ত চোখে নিত্যানন্দের মনে হলো স্বয়ং দ্বাপরের চন্দ্রাবলীই যেন এসে পদ সেবা করছে।

নিত্যানন্দ উঠে বসলেন। বললেন— আপনি এত রাতে কেন এমন কষ্ট করছেন। আপনি আপনার কামরায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।

আপনি ঘুমোন আপনার সেবা থেকে আমায় বঞ্চিত

করবেন না। শাস্ত্রে আছে কোন স্ত্রী ঋতুবৃত্তি হয়ে সন্তান কামনা করলে সে আশা পূর্ণ করতে হয়। না হলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটে না। আমার ঋতু রক্ষা করে আপনি আপনার ধর্ম রক্ষা করুন।

চন্দ্রাদেবী, যুগের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। দ্বাপর যুগে কৌরব বংশ রক্ষা করতে চিত্র ও বিচিত্র বিয্যের বিধবা পত্নিদ্বয়ের ব্যাস দেবের সঙ্গে মিলন হয়েছিলো। ব্যাস দেবের ঔরসেই ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম হয়েছিলো। এখন কলি যুগ। কলি যুগের নিয়ম অনুসারে স্বামী বর্তমান থাকতে স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন স্ত্রী পর পুরুষের সঙ্গে মিলিত হলে নরকবাসী হতে হয়। আপনার স্বামী বাড়ী নেই। স্বভাবতই আপনি কোন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হলে স্বামীর চোখে ধুলো দিতে পারলেও ধর্মের চোখে কুলটা বলে গণ্য হবেন। আপনি বংশ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হবেন না। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবো আপনার যেন গুণবান পুত্রের জন্ম হয়। আগামী মাসেই আপনার স্বামী বাড়ী আসছেন। আপনার স্বামীই আপনার ঋতু রক্ষা করবেন এবং আপনার পুত্র সন্তান হবে। এবার যান। চন্দ্রা নিত্যানন্দের দুটি পা মাথায় ঠেকিয়ে বলে আপনার কথা সত্য হউক।

নির্মল ভারতীর সঙ্গে নিত্যানন্দ তীর্থ দর্শনে বের হলেন। কপিল মুনির আশ্রম, মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, ত্রিতস্তক, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ হয়ে পুলহ মুনির আশ্রমে এলেন। আশ্রমের পাশ দিয়েই কল কল শব্দে প্রবাহিত হচ্ছে কৌশিকী নদী। নিত্যানন্দ এবং নির্মল ভারতী কৌশিকী নদীতে প্রাণ ভরে স্নান করলেন।

পুলহ মুনির আশ্রম এক সময় ভারত বিখ্যাত ছিলো। প্রতিদিন শত শত মুনি পুত্র ও মুনি কন্যা সমবেত কণ্ঠে সামবেদ

গান করে গুরুর মুখে বেদ পাঠ শুনতো। আজ আর সেই ঐতিহ্য ভারতের কোন আশ্রমেই অবশিষ্ট নেই। মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে বিভিন্ন আশ্রমে বিভিন্ন সময় দৈত্য এবং রাক্ষসেরা অত্যাচার চালাতো। বেদ পাঠ, যাগ-যজ্ঞ বন্ধ করে দিতো। এখন মুসলমানের ভয়ে বহু আশ্রমেই প্রকাশ্যে বেদং পাঠ এবং বেদ গান বন্ধ হয়ে গেছে।

অনেক আশ্রম থেকেই তাল পাতায় লেখা বিভিন্ন ধর্মী গ্রন্থ মুসলমানেরা ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। এ ভাবেই ধ্বংস হয়ে গেছে হাজার বছর ধরে মুনি ঋষিদের লব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার।

আশ্রমবাসীরা পরম সমাদরে নিত্যামন্দ এবং নির্মল ভারতীকে ভোজন করালেন। দুদিন পুলহ মুনির আশ্রমে কাটিয়ে পরশুরাম তীর্থে এলেন। গোমতী-গণ্ডকি তীর্থে স্নান করে পরশুরাম মাতৃহত্যা জনিত পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন।

নিত্যানন্দ এবং নির্মল ভারতীও গোমতী-গণ্ডকি নদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করে পরশুরাম তীর্থে কিছুদিন দুজনে তপস্যা করে কাটালেন।

একদিন বিকেলে তপস্যা শেষে গুহায় ফিরবেন এমন সময় দুজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলো। পরশুরাম তীর্থে কয়েকজন সন্ন্যাসী রয়েছেন। তারা কেউ তিন যুগ, কেউ এক যুগ ধরে এই তীর্থে তপস্যা করেছেন। বয়সের ভারে চোখগুলো চামড়ার নীচে ঢাকা পড়ে গেছে

নিত্যাতন্দ ও নির্মল ভারতী এক সাধুকে প্রণাম করলেন। সাধু বাবা দুহাত দিয়ে দুচোখের চামড়া সরিয়ে তাকিয়ে উত্তর করলেন — নমো নারায়নায়! আপনাদের দর্শনে আনন্দ সাগরে

আমার মন হাবু ডুবু খাচ্ছে। দেখলাম বলরাম একজন যদু বংশীয় সাধুকে নিয়ে তীর্থে এসেছেন। বলরাম খুব বেশী করে তীর্থ করছেন। বলরামকে দেখে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হলো। দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ তিন যুগে যেমন শ্যামল বর্ণ ধারণ করে লীলা করেছেন কলি যুগে. তিনি গৌররূপ ধারণ করেছেন। আর বলরাম হয়েছেন শ্যামবর্ণ। কী অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো?

নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণদ্বয়কে হাত জোর করে সাধু বাবার কাছে বসতে অনুরোধ করলেন। সাধু বাবা বললেন, বাবা, আমি তোমাদের সবাইকে চিনতে পেরেছি। তোমরাও নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পেরেছো?

ব্রাহ্মণদ্বয় বললেন— আমরা আপনাকে চিনতে পেরেছি। ঐ সাধু দুজনের কাছে আপনার পরিচয় প্রকাশ করুন। মায়ার প্রভাবে তাদের পূর্ব জন্ম স্মরণ নেই।

বৃদ্ধ সাধু বললেন – বাবা, আমি সেই সন্দীপন ঋষি। রাম ও কৃষ্ণ সহ অনেক যদু বংশীয় যুবক আমার আশ্রমে বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেছিল।

নিত্যানন্দ হাত জোর করে বললেন— ঠাকুর, আপনাকে দর্শনের জন্যই পরশুরাম তীর্থে এসেছি। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন কলির প্রভাব থেকে জীবকে যেন মুক্ত রাখতে পারি।

— তোমার ইচ্ছে তো অপুর্ণ হবার কথা নয়। তোমার লীলা তুমি করবে, সে লীলায় বাঁধা সৃষ্টি করে এমন সাধ্য কার আছে? তোমাদের জয় হউক।

এক দ্বিজ বললেন – নিত্যানন্দ ঠাকুর, আমরা শ্রীপর্বতে যাবো ভাবছি। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

— শ্রীপর্বতে যাবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। আপনাদের পেয়ে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। চলুন আমরা আজই যাত্রা করি।

— তোমরা দুজনে আমাদের দুজনের হাত ধরে চোখ বন্ধ করে থাকো। শ্রীপর্বত এখান থেকে যেমন বহু দূর তেমনি যাবার পথে প্রচণ্ড অসুবিধে রয়েছে। আমরা দুজনে তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবো।

নিত্যানন্দ আর নির্মল ভারতী ব্রাহ্মণ বেশী হনুমানের কথা মতো দুজনে দুজনের হাত ধরে চোখ বন্ধ করেন।

ভক্ত হনুমান এক লাফে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় গিয়ে ছিলেন। আর একবার শক্তি শেলের আঘাতে মৃতপ্রায় লক্ষণকে বাঁচানোর জন্য লঙ্কা থেকে হিমালয় এসেছিলেন। সামান্য সময়ের মধ্যে বিভিষণ শূন্যে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারেন। মুহুর্তের মধ্যেই তারা শ্রীপর্বতে এলেন।

লক্ষণ বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে শেখা মন্ত্রের প্রভাবে চৌদ্দ বছর না খেয়ে, চৌদ্দ বছর না ঘুমিয়ে ছিলেন। রাম লক্ষণ বনে নিদ্রা গেলে লক্ষণ পাহাড়া দিতেন। সীতা হরণের পর রামচন্দ্র নিদ্রা গেলে রাম চন্দ্রকে পাহাড়া দিতেন। সেই লক্ষণের অবতার নিত্যানন্দের তাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম যেন আয়ত্বাধীন। যখন নিত্যানন্দের ঘুমানোর ইচ্ছে না হয় তখন আর নিদ্রা দেবী সাহস করে নিত্যানন্দের কাছে আসতে পারেন না।

শ্রীপর্বতে গিয়ে তাঁরা যখন পৌঁছলেন তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর শুরু হয়েছে। চারিদিকেই অন্ধকারের রাজত্ব।

হিমশীতল বাতাস। নির্মল ভারতীর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। শ্বাস প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। বললেন — শ্রীপর্বতে আমার ভাগ্যে কি আনন্দ লাভ হবে না?

হনুমান সাদা পদ্ম ফুলের মতো দেখতে একটা ফুল এনে দিয়ে বললেন – সাধারণ মানুষ এখানে বাঁচতে পারে না। তোমার যেমন শ্বাস কষ্ট হচ্ছে তেমনি শীতে শরীর জমে যাচ্ছে। এই ফুলের গন্ধ নাকে গেলেই তোমার সকল অসুবিধা দূর হয়ে যাবে।

কাছেই ঝর্ণার কল কল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নিত্যানন্দ অন্ধকারেও পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন ঝরণায় দেব কন্যারা স্নান করছেন।

হনুমান জিজ্ঞেস করলেন— নিত্যানন্দ ঠাকুর কিছু দেখতে পাচ্ছো ?

— হ্যাঁ। অনেক দেব কন্যা ঝরণায় স্নান করছে।

— হ্যাঁ। ওদের স্নান হয়ে গেলেই আমরা যাবো। স্নান সেরে ধ্যান করতে হবে।

বরফের দেশ। গাছপালা খুবই কম। গাছের পাতায় পাতায় বরফের ভারি আস্তরণ। স্নান সেরে সকলেই ধ্যানে বসেছেন। চারিদিকে বেজে চলেছে বিভিন্ন সুমধুর সঙ্গীত। প্রকৃতি পরমপুরুষের পুজো করছেন।

রাত ভোর হলো। চার জনেই ধ্যান বন্ধ করে হিমালয়ের বরফের আস্তরণ থেকে ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে আসা জীবের পরম কল্যাণকারী সুর্যরূপী ভগবান বিষ্ণুর স্তব পাঠ করলেন।

এক ব্রাহ্মণ ও এক ব্রাহ্মণী এগিয়ে এলেন। হনুমান এবং বিভিষণ অনেক চেষ্টা করেও মনের মাঝে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর প্রকৃতরূপ আঁকতে পারলেন না।

হনুমান বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন— ঠাকুর আপনার আশ্রম কোথায় ? আপনি কি এখানে নূতন এসেছেন ?

— আমি এখানে অনেক দিন ধরেই আছি। বলতে পারো যুগের পর যুগ ধরে।

— আপনাদের তো কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়েনা।

— মনে পড়েনা কি গো। আমরা তো তোমাদের অন্তরে সর্বদাই আছি। চলো আমাদের আশ্রমে। সেখানে চার ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে ব্রাহ্মণ সেবার সৌভাগ্য লাভ করি। ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং গুরুর সেবা অতি পুণ্য দায়ক।

হনুমান ও বিভিষণের মনে অহংকার ছিলো তারা ত্রিলোকদর্শী

এখন এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর স্বরূপ জানতে না পেরে বুঝতে পারলেন ভগবানের ইচ্ছে ব্যাতিরেকে কারো পক্ষেই কোন কিছু বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মণী বিভিন্ন ধরনের তরকারী রান্না করলেন। গরম গরম রুটি আর বিভিন্ন তরকারী দিয়ে থালা সাজিয়ে চার অতিথি এবং ঘরের ব্রাহ্মণকে খেতে দিলেন।

চারজন অতিথিই আবাক্ হয়ে গেলেন লোকালয়ের প্রচলিত সুস্বাদু খাবার পেয়ে। চার জনেই তৃপ্তি ভরে খেলেন। হনুমানের একবার ইচ্ছে হলো তিনি দ্বাপর যুগে লক্ষ্মীদেবীকে যেভাবে বিপাকে ফেলে দিয়েছিলেন এখানেও ব্রাহ্মণীকে বিপাকে ফেলে প্রকৃত পরিচয় জেনে নেবেন। কিন্তু, কয়েকটা রুটি খাবার পরই হনুমানের ঢেকুর উঠতে লাগলো। হনুমান মনে মনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মা, আপনি নিশ্চয়ই অন্নপুর্ণা! এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই মহাদেব। আমাদের সকলেরই প্রণাম গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণী মৃদু হেসে বললেন বাবা তোমরা তো আমাদের জ্ঞানী ছেলে। তোমাদের অন্তরে সত্য জাগ্রত হউক। তৃপ্তি ভরে খাও। তোমাদের পেয়ে আমরা দুজনও খুবই আনন্দিত হয়েছি।

শ্রীপর্বত থেকেই হনুমান ও বিভিষণ নিত্যানন্দ ও নির্মল ভারতীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। শ্রীপর্বত থেকে গেলেন বদরিকাশ্রম নর নারায়ণ ঋষির আশ্রম। তারপর ব্যাস জন্মভূমি নন্দী গ্রামে এলেন। হরিদ্বারের কাছে ব্যাস গুহায় নাকি ব্যাসদেবের দর্শন পায় ভাগ্যবানেরা। নিত্যানন্দ ব্যাস গুহায় ব্যাস দেবের দেখা না পেলেও নন্দী গ্রামে ব্যাসদেবের দেখা পেলেন।

ব্যাসদেব আবির্ভুত হয়েছিলেন বেদ প্রচার ও বেদ বিন্যাসের জন্য। নন্দীগ্রামে ব্যাসদেবের বাসভূমিতে ব্রাহ্মণ বেশী ব্যাসদেব নিত্যানন্দ ও নির্মল ভারতীকে সাতদিন সাতরাত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে

শ্রীমদ ভাগবতের পূণ্য কথা সুমিষ্ট স্বরে গান করে শোনালেন। নিত্যানন্দের মনে হলো কোটি পরমাত্মা এই সাত দিন ভাগবত কীর্তন শুনেছেন। ব্যাসদেব বললেন নিত্যানন্দ, বদরিকাশ্রম ভগবান শ্রীহরির অবতার নর-নারায়ণ ঋষির সাধন ক্ষেত্র। নারায়ণ ঋষিকে চিনতে না পেরে ইন্দ্র, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপসরাকে পাঠিয়েছিলেন সেবার দ্বারা নারায়ণ ঋষিকে সাধনা থেকে সরিয়ে আনার জন্য।

রম্ভা ও মেনকার সেবার জন্য নারায়ণ ঋষি তার উরু চিড়ে বের করেন এক অপরূপা সুন্দরীকে। উরু থেকে সৃষ্টি করেছেন বলে তার নাম রাখা হয়েছে উর্বশী। এই উর্বশীই পরবর্তী কালে সর্গের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে পরিচিতা হয়েছেন।

নর-নারায়ণ ঋষির আশ্রমে চারদিন কাটিয়ে তারপর তারা দাক্ষিণাত্য যাত্রা করলেন তারপর গেলেন নৈমিষারণ্য যেখানে সুতমুনি ষাট হাজার ঋষির কাছে পুরাণকথা বর্ণনা করেছিলেন। বদরিকাশ্রম থেকেই ব্যাসদেব বিদায় নিলেন।

নিত্যানন্দ নির্মল ভারতীকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন ভারততীর্থ ভ্রমনে। কাশীধাম, কামকুষ্টপুরী, কাঞ্চিপুরী, কাবেরী, হরিক্ষেত্র, ঋষভ পর্বত, মলয় পর্বত কাবেরী পুরী, শ্রীরঙ্গনাথ, তাম্রপর্নী, যমুনা, উত্তরা, কন্যকানগর, অনন্তপুর, পঞ্চ অপ্সরা সরোবর রেবা মহেশ্বরীপুরী মল্লতীর্থ এবং প্রতিচী হয়ে পুনরায় বৃন্দাবন ফিরে এলেন।

মলয় পর্বতে অগস্ত্য মুনির আশ্রম থেকেই নিত্যানন্দের সঙ্গে নির্মল ভারতীর বিচ্ছেদ ঘটে। নির্মল ভারতী শৃঙ্গেরী মঠে ফিরে যাবার জন্য মনঃস্থির করেন আর নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্রে ফিরে আসেন।

আহা! বৃন্দাবনের মাহাত্ম ভক্ত ছাড়া বুঝার সাধ্য কার আছে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকে মাধুর্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য গো-লোকের গোপ গোপীরা বৃন্দাবনের জন্য

নিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় দ্বাপরে মুনিকন্যাগণ, ঋষি কন্যাগণ এমন কি দেবকন্যা ও দেবদেবীগণ পবিত্র ব্রজধামে আভির্ভূতা হয়েছিলেন। বৃন্দাবনের লতা-গুল্ম, পশু পাখী কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃন্দাবনের প্রতিটি ধূলিকনাই পরম পবিত্র ও ভাগ্যবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ লীলা তারা দর্শনের সুযোগ পেয়েছেন।

গোপী ভাবকে শ্রেষ্ঠ ভাব বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সুখ ও আনন্দ বিধানই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোমল পাদ-পদ্মে যাতে চলতে গিয়ে ব্যাথা না লাগে সেজন্য গোপীরা তাদের স্তনের উপর পা দিয়ে পথ চলতে ভগবানকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

নিত্যানন্দ যমুনার ঘাটে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছেন। আর অস্ফুটস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে বিলাপ করেছেন।

যমুনার ঘাটে স্নান করতে আসা গোপীরা নিত্যানন্দের আয়ত চোখ দুটোয় জলের ধারা দেখে তাদের মনেও বিরহ ব্যাথা জাগছে। একজন আর একজনকে অনুচ্চস্বরে বলছেন—সখী, বিদেশী ব্রহ্মচারীর মনে না জানি কোন বিরহ ব্যাথার উদয় হয়েছে! তাই আয়ত চোখ দুটোয় জলের প্লাবন দেখা দিয়েছে। চলো না সখী আমরা ব্রহ্মচারীকে গিয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করি?

আর একজন বলেছেন — সখী, ব্রহ্মচারীর সাদা পোষাক আর সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোষাক। কিন্তু, এই ব্রহ্মচারীর নীল পোষাক দেখে সংশয় জাগছে এ ব্রহ্মচারী কোন পথের পথিক?

আর একজন যিনি বয়সে নবীনা, চেহারায় সর্বাপেক্ষা সুন্দরী যার পরনেও নীল শাড়ী সে বলছে — সখী, তোরা বুঝতে পারছিস না - সে যে আমার পথের পথিক গো! সে যে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল।

প্রথমা সখী বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো— তুই আবার কখন কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়েছিস? কৃষ্ণ কি কখনো নারীর ব্যাথা বুঝে? রাধাকে কতইনা দুঃখ দিয়েছে। সে যে কঠিন হৃদয়।

এবার নবীনার চোখে জল এলো। বললো সখী, রাধারাণী তার অপার্থিব প্রেম মাধুর্যে বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমকে প্রেমময় করে দিয়ে গেছেন। আমি নীল শাড়ী পরলেই আমার সামনে নীল যমুনা, বৃন্দাবন আর স্থাবর জঙ্গমের সব কিছুরই কেমন যেন অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যায়। কখনো কখনো হাজারো পায়ের নূপুরের সুমধুর রাগিনী ভেসে আসে কখনো কখনো বাঁশির সুমিষ্ট সুর শুনতে পাই। মনে হয় যমুনার ঘাটে ছুটে আসি। আমার অন্তর যার জন্য কাঁদে হয়তো তার দেখা পেতে পারি। ঐ ব্রহ্মচারীকে দেখে আমার হৃদশে যে আনন্দের বন্যা দেখা দিয়েছে তা হয়তো কিছু পরেই কান্নার রূপ নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে। সে যে কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক গো! চলো সখী তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাই।

নিত্যানন্দের মনে বলরাম ভাবের উদয় হলো। তিনি দেখতে পেলেন যমুনায় অনেক রাখাল বালকের সঙ্গে কৃষ্ণ যমুনায় জল কেলী করছেন। তখন গোধুলি বেলা। সকল রাখালের গায়ে গোধুলির ধুলি লেগে আছে। সারাদিনের ক্লান্তিতেও তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তারা সকলেই উন্মাত্তের মতো যমুনার জল উথাল পাতাল করছে।

শ্রীকৃষ্ণ বার বার ডাকছেন— বলরাম দাদা, তুমিও এসো। তুমি পাড়ে বসে থাকলে খেলা যে জমবে না এসো, এসো।

নিত্যানন্দ আর স্থির থাকতে পারলেন না। কাপড় চোপর নিয়েই যমুনায় দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গোপীরা অকস্মাৎ অচেনা পথিককে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বিস্মিত হয়ে-

ছিলো। এবার অনেকেই পথিকের কাণ্ড দেখে হেসে উঠলো। তাদের কারো কাখের কলসি পড়ে গিয়ে ভেঙে পড়লো। কেউ কলসি নামিয়ে নিত্যানন্দের জল খেলা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগলো।

একজন গোপী রসিকতা করে নবীনা গোপীকে বললো—সখী, ব্রহ্মচারী দেখতে সুন্দর। চোখ দুটোর দিকে চাইলে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আমাদের তো তোর মতো রূপ নেই। তোর সঙ্গেই ব্রহ্মচারীর মানাতো ভালো। যা না, একা এতক্ষণ জলে ঝাপটা ঝাপটি করছে। তুই যোগ দিলে দারুণ মজা হবে।

বৃন্দাবনে এবার বর্ষা ভালো হয়েছে। নদীতে কোথাও কোথাও সাঁতার জল। গোপীরা দেখলো— সাধুটি এতক্ষণ জলে ঝাঁপটা ঝাঁপটি করে এবার যেন চুপ হয়ে আসছে। তার দেহ জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে।

নবীনা আতঙ্কিত হয়ে বললো— সখী, ব্রহ্মচারী জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছেন। শীগগীর এসো, নইলে ও স্রোতের জলে ভেসে যাবে।

গোপীরা সকলে মিলে নদীতে তখনি ঝাঁপিয়ে পড়ে নিত্যানন্দকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু, নিত্যানন্দ যেন বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করে আছে। সাত আটজন গোপী মিলে তাকে ঘাটের কাছে টেনে আনলেও কিছুতেই পাড়ে তুলতে পারছে না। সকলেই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো ব্রহ্মচারীর শ্বাসপ্রশ্বাসও বইছে না।

নবীনা নিত্যানন্দের মাথার দিকে ধরেছিলো। তার মনে হলো দশ মন লোহা যেন তাকে চাপ দিচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। ঘাটের কাছে নিত্যানন্দের মাথা কোলে নিয়ে বসে পড়লো।

যমুনার ঘাটে লোকজনজমে গেলো। অচেনা ব্রহ্মচারীকে দেখতে আশ পাশ থেকে ছুটে এলেন সাধু সন্তের দল। ব্রহ্মচারীর সুঠাম দেহ। অপূর্ব মুখশ্রী। সকলেই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

কোন কোন গোপী নিত্যানন্দের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। একজন বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে এলো। লোকজন অধীর আগ্রহে যত শীঘ্র সম্ভব ব্রহ্মচারীকে সুস্থ দেখার জন্য মনে মনে রাধারাণীর নিকট প্রার্থনা জানাতে লাগলো।

সন্ধ্যা হয় হয়। যে সমস্ত গোপীরা নিত্যানন্দকে নদী থেকে টেনে তুলেছিলো তারা ভিজে কাপড়ে নিত্যানান্দর পাশে বসে আছে। আত্মীয় স্বজনেরা তাদের পোষাক বদলে আসতে বললেও মুহুর্তের জন্যও কেউ ব্রহ্মচারীকে ছেড়ে নড়তে চাইলো না।

বৈদ্য নাড়ি টিপে দেখলেন। নাকের কাছে শুকনো তুলো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। নাড়ির স্পন্দনও পাওয়া যাচ্ছে না। মৃত্যুর পর মানুষের যেসব লক্ষণ দেখা যায় তাও দেখা যাচ্ছে না। বৈদ্য কিছু করতেও পারছেননা আবার তাকে মৃত বলে ঘোষণাও করতে পারছেন না।

যমুনা রাতের ঘন আঁধারে ঢাকা পড়তে শুরু করেছে। ঘরে ঘরে উলুধ্বনি ও কাঁশর ঘন্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে মুসলমানদের মুখে মাগরিবের নামাজের ধ্বনি।

বৈদ্য লোকজনদের পরামর্শ দিলেন রাতে এখানে ব্রহ্মচারীকে ফেলে না রেখে কাছের ধর্মশালায় নিয়ে যাবার জন্য। কেউ পরামর্শ দিলো মদন গোপাল মন্দিরের নাট মন্দিরে নিয়ে কাওয়ার জন্য। মদন গোপালের কৃপাতেই ব্রহ্মমচারীর জ্ঞান ফিরে আসতে পারে।

নবীনা গোপী বললো ব্রহ্মচারীকে মদন গোপাল মন্দিরে নিয়ে চলুন। সেখানেই তার জ্ঞান ফিরতে পারে

ব্রহ্মচারীকে মদন গোপাল মন্দিরের নাট মন্দিরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হলো। দেবদাসীরা ব্রহ্মচারীর জীবন ফিরিয়ে আনতে মন প্রাণ মদন গোপালকে সমর্পণ করে গান শুরু করলো।

মুহুর্ত মধ্যেই চেতনা ফিরে এলো নিত্যানন্দের। মন্দিরের দেবদাসীদের মুখে রাধারাণীর বিরহগান শুনে তার মনে বিরহ ব্যাথা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিলো। তিনি হা-কৃষ্ণ হা-কৃষ্ণ বলে উদ্যাম নৃত্য শুরু করলেন তার দুচোখ বেয়ে প্রেমের ধারা বইতে শুরু করলো। সকলেই নিত্যানন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে বিলাপ শুরু করলেন। মদন গোপাল মন্দিরে মাধবেন্দ্রপুরী এবং ঈশ্বরপুরী আরতি দেখতে এসেছিলেন। তারা নবীন ব্রহ্মচারীর শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার লক্ষ্য করে ঘন ঘন পুলকিত হতে লাগলেন। প্রথমে মাধবেন্দ্রপুরী এবং পরে ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করলেন। মাধবেন্দ্রপুরী বললেন বন্ধু, কৃষ্ণতো এখন ব্রজে নেই। নবদ্বীপে রাধা ভাবে বিরাজ করেছেন। কৃষ্ণের দর্শন প্রার্থী হলে নদীয়ায় ঘুরে এসো। নিত্যানন্দ একথা শুনে পুলকিত হলেন। বললেন বলে দিন কি করে যাব।

মাধবেন্দ্রপুরী বললেন — বন্ধু, আমার এক শিষ্য আছেন শান্তিপুরে, তুমি তার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারো।

ঈশ্বরপুরী বললেন প্রভু নিমাই নামে নবদ্বীপের এক পণ্ডিত আমার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে আমি যে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ করেছি তা কোন মানুষের হতে পারে না। নিমাই এখন গৌর চাঁদ রূপে নদীয়া আলোকিত করেছেন। নদীয়ার সেই গৌর চাঁদই কৃষ্ণ বলে আমার মনে হয়। আপনি নদীয়ায় পদার্পণ করুন।

নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র পুরীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম

জানালেন বললেন গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান বলে দিয়ে আপনি আমার গুরুর মতো কাজ করেছেন। আপনাকে প্রণাম।

শ্রীনিত্যানন্দ কুড়ি বৎসর বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করেছেন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তিনি যেভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি পর্যায়ক্রমে বৈদ্যনাথ বক্রেশ্বর, প্রয়াগ, মথুরা বৃন্দাবন, হস্তিনাপুর, দ্বারকা সিদ্ধপুর, মানসতীর্থ শিবকাঞ্চি কুরুক্ষেত্র, পৃথুদক, বিন্দুসরোবর প্রভাস, গয়া, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিশ্রোতা, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা পুলহ মুনির আশ্রম, গোমতি, গণ্ডকি শোন, মহেন্দ্র পর্বত, হরিদ্বার, পুম্পা ভীমরসি, রেম্বাতীর্থ, শ্রীপর্বত, বেঙ্কটনাথ, কামকোঠরি, পুরী, কাঞ্চি, কাবেরী, শ্রীরঙ্গনাথ, হরিক্ষেত্র ঋষভ পর্বত, তাম্রপর্ণি, মলয় পর্বত, বদরিকাশ্রম, ব্যাসের আলয়, কন্যকানগর, দক্ষিণ সাগর। শ্রীঅবন্তিপুর, পঞ্চ অপ্সরা সরোবর, গোকর্ণাখ্য, মহিস্মতিপুরী, সুর্পারক, প্রতিচী প্রভৃতি স্থান ঘুরে বিভিন্ন অবতারের লীলা কাহিনী শ্রবণ করেছেন।

মাধবেন্দ্র পুরী এবং ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে বৃন্দাবনের গৌর সুন্দরের কথা শুনে বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপ আসার পথে আবার তিনি কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করে এলেন। তিনি গেলেন সেতু বন্ধ রামেশ্বর বিজয়নগর, অবন্তি, ভীমগড়, নৃসিংহ, দেবপুরী, ত্রিমল্ল কূর্মনাথ, নীলাচল, পুরী মায়াপুর প্রভৃতি স্থানে।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দের জৈষ্ঠমাস। নবদ্বীপে আম পাঁকতে শুরু করেছে। শ্রীপাদ কখনো নাচতে নাচতে, কখনো গাইতে গাইতে গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে নবদ্বীপের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পথ যেন আর শেষ হয় না। যে গৌরচাঁদকে মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে বর্ণনা করেছেন সেই চিন্ময় বস্তুটিকে দর্শনের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত নিত্যানন্দের মন ব্যাকুল হয়ে রইলো।

শ্রীবাস অঙ্গনে অনেকে সমবেত হয়েছেন। বেলা এক প্রহর হয়েছে। গৌর সুন্দর গতকাল শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীবাসের বিষ্ণু মন্দিরে সিংহাসনে বসে অপার্থিব লীলা প্রকটিত করেছিলেন সেই মাধুর্য রসেই এখনো শ্রীবাস, মুরারী, গদাধর প্রভৃতি বহু ভক্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছেন। এমন সময় গৌর সুন্দরকে পুনরায় আসতে দেখে তাদের আনন্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পেলো। প্রেমরসে প্রতেকেই ভরপুর। গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলে কেউ কেউ হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন

গৌর সুন্দরকে শ্রীবাস কারুকার্য খচিত কাঠের আসন এগিয়ে দিলেন। গৌর সুন্দর আসনে না বসে বলতে লাগলেন—ভাই সকল আনন্দ করো, আনন্দ করো। আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি স্বয়ং বলভদ্র মানুষের বেশ ধারণ করে আমাদের নবদ্বীপে এসে হাজির হয়েছেন। তার বিশাল শরীর, মাথায় নীল বস্ত্র। পরনে নীল বস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা। মুখে হরিনাম হরিনাম জপতে জপতেই আমাদের বাড়ীর উঠানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন - এটাই কি বিশ্বম্ভরের বাড়ী? একবার নয় দশবার। আমার একান্ত বিশ্বাস তিনি নবদ্বীপে অবশ্যই এসেছেন। তোমরা খুঁজে দেখো কার বাড়ীতে তিনি পায়ের দূলো দিয়েছেন। আমাদের তিনি বলেছেন—আজ আমাদের মিলন হবে। তাই সকাল হতেই তোমাদের খবর দিতে ছুটে এলাম।

গৌর সুন্দরের কথা শুনে শ্রীবাস, মুকুন্দ, নারায়ণ, এবং মুরারী এই চারজন সেই অবতারকে নবদ্বীপে খুঁজতে বের হলেন। সেই বলরামের অবতার নবদ্বীপ বাসীকে ধন্য করতে এসে হাজির হয়েছেন। ভক্তের আকুল আহ্বানেই ভগবান অবতরণ করেন। কোন আলৌকিক স্থান থেকে নয়, আনন্দ ঘন মূর্তিরূপে আনন্দে হৃদয়কে পূর্ণ করে দিতে।

চারজনে মিলে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে খোঁজ করলেন।

কোথাও গৌর সুন্দরের বর্ণনার সেই সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন না। বেলা তৃতীয় প্রহরে চারজন ফিরে এলেন বিষন্ন মনে। শ্রীবাস ভাবছেন — গৌর সুন্দরের স্বপ্ন মিথ্যে হতে পারেনা। হয়তো কোন গুহ্য কারণেই আমরা সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম না।

গৌর সুন্দর চারজনের শূন্য হৃদয়ে ফিরে আসায় ব্যাথিত হলেন। বললেন—আমারই ভুল হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে আমারও সঙ্গে অবতারকে খোঁজতে যাওয়া উচিত ছিলো। চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই। আবার খুঁজি। দেখা নিশ্চয়ই পাইব।

নবদ্বীপের কাছে এসে নিত্যানন্দের মনে অদ্ভুতভাবের উদয় হলো। নব পরিণিতা যেমন স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হবার আগে বিভিন্ন আশংকায় ভোগেন নিত্যানন্দের সেরূপ অবস্থা হলো।

তিনি মনে মনে ভাবলেন— প্রভু যদি আমায় গ্রহণ না করেন? প্রভু যদি আমায় কাছে টেনে না নেন? প্রভু যদি আমায় সেবার সুযোগ না দেন?

নিত্যানন্দের মনে এমন অনেক ভাবের উদয় হওয়ায় প্রথমে তিনি যেমন বিদ্যুৎ বেগে প্রভু দর্শনের আশা নিয়ে ছুটে এসেছিলেন নবদ্বীপের মাটিতে পা দিয়ে তেমনি আশংকাভাবে নিমজ্জিত হয়ে প্রথমেই গৌর সুন্দরের বাড়ী না গিয়ে অন্য কোন নবদ্বীপবাসীর গৃহে অতিথি হওয়া শ্রেষ্ঠ মনে করলেন।

সন্ন্যাসীগণ সাধারণ গেরুয়া পরে থাকেন। ব্রহ্মার রূপ অনেকটা গৈরিক বলেই জ্ঞানী ভক্তগণ গেরুয়া পোষাক পরিধান করেন। গৈরিক রঙ ত্যাগ ও সত্যের প্রতিক।

নিত্যানন্দ গোবিন্দানন্দজীর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি। ব্রহ্মচারীর পোষাক পরিচ্ছদ সাদা। বৃন্দাবনে বাসের ফলে তার ভেতরে যে কৃষ্ণ

প্রেমের উদয় হয়েছে সে কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়েই তিনি ব্রহ্মচারী হওয়া সত্বেও সাদা পোষাক পরিত্যাগ করে নীল বস্ত্র পরতে শুরু করেন।

নীল ধুতি এবং নীল বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করে নিত্যানন্দ যখন নন্দন আচার্যের বাড়ীতে হাজির হলেন তখন নন্দন আচার্য স্নানে যাবার উদ্যোগ করছিলেন।

নিত্যানন্দ তখনো কৃষ্ণ ভাবনায় বিভোর। নেশাগ্রস্থ মদ্যপের মতোই নিত্যানন্দের দেহ তার আয়ত্বের বাইরে থাকায় কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে দুলছিলো। বিশাল চোখ দুটো ছিলো ঢুলু ঢুলু। মুখে অনবরত উচ্চারিত হচ্ছিল -- হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ মধুর ধ্বনি।

নন্দন আচার্য নিত্যানন্দকে দেখে বুঝতে পারলেন আগত অদ্ভুত পোষাক পরিহিত যুবকের মধ্যে অষ্ট সাত্বিকভাব বিরাজ করছে। তাই তিনি স্নান যাত্রা স্থগিত রেখে পরম সমাদরে অতিথি ঘরের খাটে নিয়ে নিত্যানন্দকে বসালেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতেরা নন্দন আচার্যের বাড়ীতেও সন্ন্যাসীর খোঁজে এসেছিলেন। কিন্তু, নন্দন আচার্য আগন্তুক যুবককে উচ্চ কোটির সাধক মনে করায় এবং তার পরনে গেরুয়া না থাকায় শ্রীবাসকে বলে দিয়েছিলেন যে তার বাড়িতে কোন সন্ন্যাসী আসেন নি।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভাবে ভাবিত হয়ে যখন নন্দন আচার্যের বাড়ী ছুটে চলেছেন তখন শ্রীনিবাস বললেন — প্রভু, নন্দন পণ্ডিতের বাড়ীতে কোন সন্ন্যাসী আসেন নি।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিদিন ভোর হবার আগেই ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নিতেন। তারপর বিভিন্ন সুগন্ধি ফুল দিয়ে দুটো মালা গাথতেন। একটা বিগ্রহের জন্য। আর একটা স্বামীর জন্য।

স্বামী দুপুরে স্নান সেরে এলে স্বামীর গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করতেন। তারপর স্বামীকে খাবার দিতেন।

শ্রীবাস, নারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি গৌর পার্ষদগণ গৌরচন্দ্রকে দেখার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। দুপুরের খাওয়া শেষ হওয়া মাত্রই গৌর সুন্দরের বাড়ী হাজির হতেন তারা। দুপুরে খাওয়ার পর তাই গৌর সুন্দরের আর বিশ্রাম নেওয়া হতো না। তিনি বিশ্রাম নেওয়া পছন্দও করতেন না। আগত পার্ষদদের নিয়ে বসে ইষ্ট প্রসঙ্গ করতেন।

নিত্যানন্দকে যখন শেষ বেলায় খুঁজতে বের হলেন তখনো তার গলায় বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওয়া সুগন্ধি ফুলের মালা শোভা পাচ্ছিলো। পরনে সাদা ধুতি। গায়ে ঘি বর্ণের চাঁদর।

নিত্যানন্দ নন্দন আচার্যের সঙ্গে বসে ভাগবত আলোচনা করছিলেন। ভক্তের প্রসঙ্গ আসতেই তার চোখ আনন্দে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

গৌরাঙ্গ নাগর বেশে সাঙ্গীসহ নন্দন আচার্যের বাড়ী মুহূর্তের মধ্যে বৃন্দাবনে পরিণত হলো। মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে গৌর সুন্দরকে স্বাগত জানালেন।

নিত্যানন্দও গৌরাঙ্গের চার চোখের মিলন হলো। পরমাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। একজনের গৃহীর বেশ আর একজনের অদ্ভুত বেশ। নিত্যানন্দের চোখে ভেসে উঠলো কৃষ্ণ লীলার মাধুর্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে হোলী খেলছেন। আর বলরাম দূর থেকে তৃষ্ণার্ত নয়নে ভাবছেন হায়! আমি যদি গৌরাঙ্গ না হয়ে কৃষ্ণাঙ্গ হতাম। নিমাই শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ কীর্তন করতে বললেন। শ্রীবাস কৃষ্ণকীর্তন শুরু করতেই নিত্যানন্দের মধ্যে কৃষ্ণ বিরহ দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিলো। তিনি হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ বলে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও নিত্যানন্দের নৃত্য বন্ধ হলো না। নিমাই স্বয়ং তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন।

নিমাই এর স্পর্শ পাওয়া মাত্র নিত্যানন্দের নৃত্য বন্ধ হলো কিন্তু তিনি জ্ঞান হারালেন।

জৈষ্ঠ্য মাসের গরমে সকলেই ঘর্মাক্ত কলেবর। নিমাই নিত্যানন্দের অচৈতন্য দেহ কোলে করে বসে আছেন। দেহে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। প্রভুর দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা পড়তে লাগলো। আকাশে দু-চার দিন ধরে মেঘের আনা গোনা চলছে। দুই প্রভুর ঘর্মাক্ত কলেবর দেখে তারা আর স্থির থাকতে পারলেন না। নন্দন আচার্যের বাড়ী থেকেই শুরু হলো বৃষ্টির ধারা।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বড়রাও গরম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বৃষ্টিতে ভিজে চাতক পাখীর মতোই আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো।

দুই প্রভু হাত ধরা ধরি করে বাইরে এলেন। বৃষ্টিতে দু-হাত তুলে সকলে সমস্বরে গান ধরলেন—হরি হরয়ে নমোঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। জয় গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন।

প্রভু বলছেন— আপনাকে পেয়ে আমার এত দিনের তৃষ্ণার্ত হৃদয় শান্ত হলো।' আমার জীবন ধন্য হলো। নবদ্বীপ বাসী ধন্য হলো।

প্রভুর মুখে স্তুতি শুনে লজ্জিত হলেন নিত্যানন্দ। বললেন — ভাই, আমি বৃন্দাবনে ঈশ্বরপুরী মহারাজের কাছে শুনেছি শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের প্রেম মাধুর্য লীলা সম্বরণ করে নবদ্বীপে নাম মাধুর্য্য লীলা শুরু করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের খোঁজে সারা তীর্থ ঘুরে বেড়িয়েছি। দেখা পাইনি। মনে শান্তি পাইনি আপনার শীতল স্পর্শে আমার শ্রীকৃষ্ণ বিরহের জ্বালা মুহুর্তে নিভে গেছে। মনে হচ্ছে আপনিই তিনি জন্ম জন্মান্তরে জীব আপনাকেই খুঁজে বেড়ায় আমিও এতকাল ঘুরেছি।

নৃত্য বন্ধ হলো। বৃষ্টিও বন্ধ হলো। প্রভু নিত্যানন্দকে বললেন শ্রীপাদ, কাল পূর্ণিমা তিথি। ব্যাস পূজা কোথায় করবেন? নিত্যানন্দের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন এত বড় সাত্বিক ব্রাহ্মণ থাকতে আর কোথায় যাবো?

প্রভু শ্রীবাসের দিকে তাকালেন। বললেন— পণ্ডিতের তাতে কি অসুবিধে হবে? তার চেয়ে অন্য কোন স্থানে করাই ভালো।

শ্রীবাস পণ্ডিত বুঝতে পারলেন—প্রভু তাকে পরীক্ষা করছেন মাত্র। তিনি যেখানে হাজির থাকবেন সেখানে অসুবিধার প্রশ্নই নেই। বললেন— সবাই কাল আমার বাড়ী চলুন। শ্রীপাদ আজ রাত্রিতে আমার বাড়ীতেই মাধুকরী গ্রহণ করবেন।

নিত্যানন্দ ব্রহ্মচর্য ধারণ করেছেন প্রায় বিশ বছর হলো। ব্রহ্মচারীর দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে তিনি সারা ভারতের অধিকাংশ তীর্থ ঘুরে বেড়িয়েছেন। রাতে শ্রীবাসের অতিথিশালায় শোয়ে তার বার বার মনে হতে লাগলো দণ্ড কমণ্ডলু তার জন্যে নয়। না হলে গুরু গোবিদানন্দ গিরি তাকে কবেই সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। যাকে এত দিন খোঁজা তারই যখন দেখা পেয়েছেন তখন দণ্ড কমণ্ডলুর বোঝা বহন করে আর কি হবে! তিনি খাটিয়া থেকে নেমে দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে বাইরে এলেন। মাথায় উপর নির্মল জ্যোৎস্না। চাঁদের চারিদিকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে অলক মেঘ। নিত্যানন্দের দিকে চেয়ে যেন চতুর্দশীর চাঁদ প্রশান্তির হাসি হাসছে।

নিত্যানন্দ কাঠের কমণ্ডলু ছুড়ে ফেলে দিলেন। বাঁশের দণ্ডটি ভেঙ্গে দু-টুকরো করে ছুড়ে দিয়ে প্রশান্ত মনে খাটিয়ায় এসে শুয়ে পড়লেন।

শ্রীবাস খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেন। উঠানের পাশে দণ্ড

কমণ্ডলু ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে নিত্যানন্দের কাছে এলেন।

খাটিয়ায় নিত্যানন্দের দেহ অসার হয়ে পড়ে আছে। শ্রীবাস মুরারীকে পাঠালেন প্রভুকে নিয়ে আসার জন্য।

প্রভু আসার আগেই নিত্যানন্দ বিছানায় উঠে বসেছেন। বিরবির করে কি যেন বলছেন। প্রভু নিত্যানন্দের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন – শ্রীপাদ, গঙ্গা স্নানের সময় হয়েছে। চলুন স্নান সেরে আসি তারপর রয়েছে ব্যাস পুজো। আপনি কৃপা না করলে ব্যাস পুজো সম্পন্ন হবে না।

নিত্যানন্দ সহজ অবস্থায় ফিরে এলেন। প্রভু সহ সকলেই গেলেন গঙ্গা স্নানে। স্নানে যাবার সময় প্রভু শ্রীপাদের ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলুটি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। নিজেই ঐগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন।

সকলেই মহানন্দে গঙ্গা স্নান থেকে ফিরে আসলেন। শ্রীবাস ব্যাস পুজোয় বসলেন। পুজো শেষে নিত্যানন্দকে বলছেন শ্রীপাদ মালা ধরুন। ব্যাস দেবের বিগ্রহে মালা পরিয়ে দিন।

নিত্যানন্দ মালা হাতে নিলেন। পুজোর প্রতি নিত্যানন্দের মন নেই। নিত্যানন্দের মন প্রভুকে খোঁজ করছে। একদিকে ব্যাস পুজো হচ্ছিল আর একদিকে প্রভু ভক্তদের নিয়ে কীর্ত্তনানন্দে মেতে উঠেছিলেন। নিত্যানন্দও তাই নিজেকে কীর্ত্তনে হারিয়ে ফেলে ছিলেন।

শ্রীবাস নিত্যানন্দকে বললেন শ্রীপাদ, ব্যাস দেবায় নমোঃ বলে মালাটি ব্যাস দেবকে অর্পণ করে তার কাছ থেকে কৃষ্ণ ভক্তি প্রার্থনা করুন।

নিত্যানন্দ শ্রীবাসের কোন কথাই শুনতে পাচ্ছিলেন না। তার অন্তর কীর্ত্তনানন্দে পরিপুর্ণ। তিনি এবার প্রভুকে পাশে দেখে ব্যাসায় নমোঃ বলে প্রভুর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর গলায় মালা পরিয়ে দেবার পর প্রভুর

অদ্ভুত ভাবান্তর হলো। তিনি ষড়ভুজ মূর্তি ধারন করলেন। শ্রীহরির যে গুহ্যরূপ সহস্র বছর ধরে তপস্যা করেও দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করা যায় না নিত্যানন্দের কৃপায় গৌর পার্ষদগণ সেই সুদূলর্ভ দৃশ্য দর্শন করে চিরকালের জন্য শ্রীহরির সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

শ্রীবাসের বাড়ীতে সকলেই মাধুকরী গ্রহণ করলেন সেদিন নিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। পরদিন সকাল বেলা প্রভু নিজে এসে শ্রীপাদকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

উঠান থেকেই প্রভু উচ্চস্বরে শচীমাকে ডাকলেন। বললেন দেখো মা, দাদাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

শচীমাতার বুক আনন্দে ভরে উঠলো। তিনি বাইরে ছুটে আসলেন। প্রভু বললেন মা, ইনি আমার দাদা বিশ্বরূপ। তোমার মনে আর কোন কষ্ট থাকবে না।

শচী মা অপলক দৃষ্টিতে শ্রীপাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে মাতৃস্নেহে শ্রীপাদকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন বাবা, নিমাই আমার পাগল ছেলে। তুমি সর্বদা তাকে রক্ষা করো।

নিত্যানন্দ বিহীন প্রভু এতদিন যেন লীলা মাধুর্য রসের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। এখন নিত্যানন্দকে পেয়ে সে মাধুর্য রসের বন্যায় তিনি ভাসতে লাগলেন। আর পার্ষদগণও তাদের জীবনকে মাধুর্য রসে পরিপূর্ণ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

প্রভুর ঘন ঘন ভাব সমাধি হচ্ছে। ভাব সমাধিতে বসেই তিনি শান্তিপুর থেকে সস্ত্রীক অদ্বৈত আচার্যকে আসতে বললেন।

অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপে প্রভুর প্রেম মাধুর্য প্রচারের খবর শুনেছেন। নবীন ব্রহ্মচারীকে দেখার কৌতুহলও তার মনে জেগেছে এই দুটি আশা নিয়েই প্রথমে তিনি পরম ভাগ্যবান নন্দন আচার্যের বাড়ী এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

শ্রীবাস অঙ্গন প্রভুর লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রভু

ভাব সমাধিতে বসে নন্দন আচার্যের বাড়ি লোক পাঠালেন। শ্রীঅদ্বৈতকে আনার জন্য। অদ্বৈত বুঝতে পারলেন ভগবানের কাছে কোন কিছুই গোপণ থাকে না।

শ্রীবাসঅঙ্গনে এসে প্রভু দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদকেও দর্শন করলেন। প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীপাদকে ষড়ভুজ মুর্তি দেখিয়েছেন শুনে তারও সে রূপ দেখার ইচ্ছে হলো। কিন্তু, তিনি সে সৌভাগ্য লাভ না করায় মনের দুঃখে শ্রীপাদকে বললেন — শ্রীপাদ, আপনি ভাগ্যবান তাই প্রভুর স্বরূপ দর্শন হয়েছে। আমার সময় হয়নি তাই প্রভু কৃপা করেননি।

নিত্যানন্দ বললেন সেকি! আপনি তো স্বয়ং শিবের অবতার! আপনার আকর্ষণেইতো প্রভু বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

প্রভুর লীলা মহিমা কে বুঝতে পারে? যিনি জীবের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি নিজের নাম যশ প্রচারে ব্রতী হন না। তাই তিনি কখনো নিত্যানন্দকে, কখনে অদ্বৈতকে অবতার রূপে মানুষের কাছে প্রচার করছেন।

নিত্যানন্দ মা শচীরাণীর আদেশ মতো ছায়ার মতোই প্রভুকে রক্ষা করে চলেছেন। প্রভুব যখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না তখন তিনি তার শ্রী অঙ্গে যেন কোন রূপ আঘাত না লাগে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সেদিকেই লক্ষ্য রাখছেন।

প্রভুর অনুগামীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রীপাদ, অদ্বৈত প্রভু, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারী, মুকুন্দ, গঙ্গাদাস, চন্দ্র শেখর, ভবানন্দ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম আচার্য, মাধব, সারঙ্গ প্রভৃতি ভক্তগণ খাওয়া দাওয়া ছেড়ে প্রভুর পাশেই অষ্ট প্রহর পড়ে আছেন।

প্রভু প্রতিদিন জীবকে প্রেমদান করে চলেছেন। শ্রীধর যবন হরিদাস প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শে ধন্য হয়েছেন। মুকুন্দকেও তিনি কৃপা করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিদিনের এই অপার্থিব

লীলা দর্শন করছেন আর ভাবছেন আমার কি পরম সৌভাগ্য! আমি একাধারেই রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের কৃপা-লাভে নিজের জন্ম সার্থক করলাম

প্রভু কল্পতরু সেজেছেন। প্রভুর কাছে যে-ই কৃপা ও ভক্তি প্রার্থনা করছেন তাকেই তিনি অকাতরে প্রেম ভক্তি বিতরণ করছেন মুরারী হনুমানের অবতার। মুরারী শ্রীপাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি শ্রীপাদকে বলছেন— শ্রীপাদ, আমার তো প্রভু দর্শন হলো না! শ্রীপাদ মুরারীকে প্রভুর কাছে নিয়ে গেলেন।

প্রভু মুরারীর মনোবাসনা পূর্ণ করতেই বললেন— মুরারী তুমি আমার দিকে তাকাও। দেখো আমি কে।

শ্রীপাদ আর মুরারী সবিস্ময়ে দেখলেন শ্রীবাসের বিষ্ণু খট্টায় প্রভুর পরিবর্তে শ্রীরাম চন্দ্র ও সীতাদেবী বসে আছেন। লক্ষণ ছত্র ধারণ করে রয়েছেন আর ভরত, শত্রুঘ্ন দু দিকে দাঁড়িয়ে চামড় ব্যঞ্জন করছেন। শ্রীপাদের দেহ থেকে একটা জ্যোতি লক্ষণের মুর্তির সঙ্গে মিশে গেলো মুরারী অচৈতন্য হলেন।

হরিদাস প্রভুর কৃপা পেয়েছেন। গদাধরের প্রিয় মুকুন্দ বাইরে বসে কাঁদছেন। প্রভু কল্পতরু সেজেছেন। সকলেই প্রভুর কাছ থেকে যার যার ইপ্সিত বর পেয়ে গেছেন। মুকুন্দের একান্ত বাসনা প্রভু নিজে থেকে তাকে ডেকে নিন। প্রভু তাকে ডাকছেন না।

শ্রীপাদ মুকুন্দের মনো বেদনা বুঝতে পারলেন, প্রভুকে বলছেন— প্রভু তুমি জীবের অগতির গতি। তুমি সকলকেই কৃপা করছে। মুকুন্দ তোমার পরম ভক্ত। সু-গায়ক, তুমি তাকে কৃপা করো।

শ্রীবাসও প্রভুর কাছে মুকুন্দের জন্য প্রার্থনা জানালেন।

প্রভু শ্রীপাদকে কিছু বলেন নি। শ্রীবাস অনুরোধ করতেই প্রভু বললেন — যাদের চিত্ত শান্ত নয় তারা আমার দর্শন পায় না। মুকুন্দের চঞ্চল মতি। মুকুন্দের দর্শন হবে না।

মুকুন্দ প্রভুর কঠোর বাক্য শুনেও দুঃখিত হলেন না। শ্রীপাদের দিকে চেয়ে সজল নয়নে বললেন — এ জন্মে দর্শন না পাই কোটি জন্মের পর তো প্রভুর দর্শন পাবো! তাতেই আমি খুশি। — মুকুন্দের চোখে জল এলো।

নিত্যানন্দ মুকুন্দকে আনন্দে আলিঙ্গন করলেন। নিত্যানন্দ যাকে কোল দেন প্রভু কি তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন! প্রভুর চোখ দিয়েও আনন্দাশ্রু পড়তে লাগলো। প্রভু মুকুন্দকে ডেকে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। সকলে জয় গৌর জয় গৌর ধ্বনিতে শ্রীবাস অঙ্গন মুখরিত করে তুললেন।

প্রভু নিত্যানন্দ এবং প্রভু স্বয়ং কীর্ত্তন করতে লাগলেন শ্রীবাস অঙ্গনে মুকুন্দ গান ধরলেন আর প্রভু নিত্যানন্দ এবং শ্রীবাস, মুরারী, গদাধর প্রভৃতি সকলে তাকে সঙ্গ দিতে লাগালেন। রাত্রি তৃতিয় প্রহরে প্রভু চললাম বলে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ সকলেই প্রভুর চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। সকলেই কীর্ত্তন করতে লাগলেন। রাত্রি ভোর হয়ে গেলো। রাত চতুর্থ প্রহরে কীর্ত্তনের শব্দ প্রভুর কানে পৌঁছলো। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভুর চোখের মিলন হলো। দুজন দুজনের ভাষা বুঝলেন। দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করলেন। ভক্তরা জয় গৌর — নিতাই বলে জয় ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

শ্রীপাদের শ্রীবাস অঙ্গনেই থাকার ব্যবস্থা হলো। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনীকে নিত্যানন্দ মা বলে ডাকেন। একদিন প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে এসেছেন। সকলেই প্রভুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমন সময় নিত্যানন্দ বায়না ধরলেন তিনি মালিনীর স্তন্য দুগ্ধ পান করবেন।

ভক্তরা অবাক্। মালিনী অবাক্। এর মধ্যেই সবাই নিত্যানন্দের স্বভাবের পরিচয় পেয়েছেন। স্বভাব নিতান্তই পাঁচ বছরের বালকের মতো। মালিনী বৃদ্ধা। স্তনের দুধ বহু বছর আগেই শুকিয়ে গেছে।

শ্রীপাদ স্তন্য পানের ইচ্ছে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধা মালিনীর শুষ্ক স্তনে দুধের সঞ্চার হয়েছে। স্তন থেকে দুধ পড়ে মালিনীর বুক ভেসে যাচ্ছে।

মালিনী দুহাত প্রসারিত করে নিত্যানন্দকে ডাকলেন। বত্রিশ বৎসরের বিশাল দেহী নিত্যানন্দ বৃদ্ধা মালিনীর স্তন পান করতে লাগলেন। গৌর সুন্দর মৃদু হাসতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন— লীলাময়ের লীলা বুঝার সাধ্য তাদের নেই লীলাময় তাদের যেমন বলবেন তেমনি চলতে হবে।

হরিদাস ও নিত্যানন্দ দুজনেই ব্রহ্মচারী। দুজনেই নবদ্বীপে নবাগত। দুজনেই ভক্তি রসের আকর। উপরন্তু প্রভু ভক্তি রসের সমুদ্রে দুজনকেই পরিপূর্ণভাবে স্নান করিয়েছেন। এই দুজনের দ্বারাই জীবে ভক্তি রসের সঞ্চার সম্ভব তাই গৌর সুন্দর দুজনকেই নবদ্বীপে হরিনাম প্রচারের ভার দিলেন। জন্মসূত্রে শ্রীপাদ ব্রাহ্মণ আর হরিদাস মুসলমান, দুজনেই কৃষ্ণভক্ত।

নিত্যানন্দ শ্রীবাস অঙ্গনে থাকেন। তৃতীয় প্রহরেই ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন। চতুর্থ প্রহরে যখন পাখীরা গাছে গাছে প্রভাতী সুরে গান গাইতে শুরু করে, যখন মসজিদে ফজরের নামাজের ধ্বনি ভেসে আসে তখন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ করতাল নিয়ে নগরে বের হন। প্রতি ঘরের দরজার সামনে উচ্চস্বরে নাম করেন। গৃহিনীরা তুলসী তলায় প্রণাম জানিয়ে ছুটে আসেন কীর্তন শুনতে। অনিচ্ছা সত্বেও ঘুম ঘুম চোখে বিরক্তি নিয়ে দরজায় এসে হাজির হন গৃহ কর্তা। নিত্যানন্দের অপূর্ব মুখশ্রী দেখে আর রাগ করতে

পারেন না। স্ত্রীকে বলেন — ব্রহ্মচারী বাবাকে ভিক্ষা দাও। নিত্যানন্দ বলেন—ভিক্ষা নয়গো। হরিনাম করো। তাহলেই তোমাদের আমায় ভিক্ষা দেওয়া হবে। নবীন ব্রহ্মচারীর মুখে নূতন কথা শুনে গৃহ কর্তা ও গৃহিনী মুগ্ধ হন। তারা পর দিনের পুণ্য প্রভাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। প্রতিদিন ভোরে ইষ্ট দর্শনের আগে নিত্যানন্দকে দর্শন করে অধিক আনন্দ লাভ করেন। শুধু নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ গৌর-নিতাই এর কাণ্ডকে বাচালতা বলে প্রচার করেন।

নদীয়ার নগর কোটাল হলেন জগাই ও মাধাই নামক দুভাই। দুজনে জাতিতে ব্রাহ্মণ। এরা মুসলমান শাসকদের খুশী করতে এবং হিন্দুদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করতে পূজা আর্চার যেমন নাম শুনতে পারতো না। তেমনি মদ খেয়ে প্রায়ই বেহুশ হয়ে থাকতো।

শ্রীপাদ তাদের দূর থেকে কয়েক দিন দেখেছেন। তাদের সুন্দর চেহারা। বড় বড় চোখ নিত্যানন্দকে আকর্ষণ করতো তিনি একদিন সঙ্গী হরিদাসকে তার মনের কথা বললেন।

হরিদাস বললেন — শ্রীপাদ, তোমার যখন কৃপা হয়েছে তা হলে ধরে নেওয়া যায় ঐ দু পাপী উদ্ধার হলো।

নিত্যানন্দ বললেন — চলুন আমরা দুজনে তাদের কাছে গিয়ে নাম কীর্তন করি।

হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রত্যেক দিন ভোর বেলা নগর কীর্ত্তন করেন একথা জগাই মাধাই শুনেছেন। জগাই মাধাই দু-ভাই প্রতিদিন নগর ভ্রমনে বের হন। একদিন হরিদাস ও নিত্যানন্দের সঙ্গে সামনা সামনি হয়ে গেলো। নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে অনুচ্চ স্বরে বললেন -- ঠাকুর, আমাদের সুযোগ এসে গেছে।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস জগাই মাধাই এর সামনে গিয়ে বললেন ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ...। জগাই মাধাই দু ভাই নিজেদের

মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর মাধাই বললেন এই দু ব্যাটাকে ধরতে কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছি। আমাদের ভাগ্য ভালো আজ একেবারে হাতের মুঠোয় এসে গেলো। দুব্যাটাকে ধরে কয়েক ঘা বেত লাগালে হরিনাম চিরকালের জন্য ভুলে যাবে।

মাধাই একথা বলে যখন নিত্যানন্দ এবং হরিদাসের দিকে এগিয়ে এলেন তখন প্রেমময় নিত্যানন্দের মনে হলো ঐ দু পাষণ্ডকে উদ্ধার করতে হলে প্রভুকে দিয়েই করাতে হবে। প্রভুর কৃপা দৃষ্টিতে এদের অবশ্যই সদ্ গতি লাভ হবে। এই মনে করে তিনি স্থুলকায় হরি দাসকে নিয়ে দ্রুত পদে চলে গেলেন। জগাই মাধাই এবং গ্রামবাসী মনে করলেন নিত্যানন্দ ভয় পেয়েছে। নিত্যানন্দ ভাবলেন প্রভুর কৃপা জগৎ বাসীকে দেখাতে হবে।

হরিদাস প্রভুর কাছে সব বললেন। নিত্যানন্দ বললেন প্রভু, তুমি যদি ওদের কৃপা না করো তা হলে কাল থেকে আর নাম প্রচারে বের হবনা

প্রভু জীব উদ্ধারের জন্য আবিভুর্ত হয়েছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা সহচর। প্রভু নিত্যানন্দের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ভক্ত পরিবৃত হয়ে জগাই মাধাই উদ্ধারের কথা ঘোষণা করলেন।

ভক্তগণ এবং শ্রীবাস মুরারী, মুকুন্দ, গদাধর, নারায়ণ প্রভৃতি সবাইকে নিয়ে প্রভু চললেন। নিত্যানন্দকে বললেন শ্রীপাদ, তুমি সকলের আগে থাকো। তোমার দর্শনে পাপীদের ক্রোধ দূর হয়ে ভক্তির উদয় হবে।

নিত্যানন্দের মন জগাই মাধাই এর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেদনায় ভারাক্রান্ত প্রভু তাদের উদ্ধার করতে চলেছেন এই আনন্দে নিতাই আনন্দিত হয়ে সকলের আগে আগে চললেন। জগাই মাধাই দুভাই হাসছেন। মদ খেলেও একে বারে বেহুঁস হয়নি। নিতাই যখন তাদের সামনে গিয়ে উচ্চ স্বরে গাইতে লাগলেন— ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ তখন মাধাই রাস্তার কাছে পড়ে

থাকা একটা ভাঙ্গা মাটির কলসির 'কানা দিয়ে নিত্যানন্দকে আঘাত করলেন।

নিত্যানন্দের মাথা ফোটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। নিতাই তখন দয়ার অবতার, ক্ষমার অবতার। তিনি মাধাইএর আঘাতে বিন্দুমাত্র ব্যথিত হলেন না। বললেন— ভাই, তুমি আমার আঘাত করেছো। তাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। তুমি আমায় আরো মারো। প্রয়োজনে মেরে ফেলো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো আমাকে হত্যা'র পর অন্তত তুমি একবার হরিনাম উচ্চারণ করবে।

নিত্যানন্দের করুণ আর্তি শুনে শ্রীবাস, মুরারী প্রভৃতি ভক্ত গণের হৃদয় বিদির্ণ হয়ে যেতে লাগলো। এমন কি জগন্নাথ (জগাই) পর্যন্ত নিতাই এর দুঃখে অবিভুত হয়ে পড়লেন। মাধাই যখন দ্বিতীয় বার কলসির কান্না দিয়ে নিতাইর মাথায় আঘাত করতে প্রস্তুত তখন জগন্নাথ ছোট ভাই এর হাত থেকে কলসির কানা কেড়ে বললেন— নরাধম, তুই সন্ন্যাসীর গায়ে আঘাত করেছিস! তোর কি পরকালের ভয় নেই?

নিত্যানন্দ দেখলেন জগন্নাথের মনে দয়ার উদয় হয়েছে। এবার মাধাই ও উদ্ধার হবে। এই আনন্দে নিত্যানন্দ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

গৌর সুন্দর ভক্তদের সঙ্গে ইচ্ছে করেই একটু পশ্চাতে নাম কীর্ত্তন করছিলেন। অভি প্রায় নিত্যানন্দের মহিমা জগতে প্রচার হউক। মুরারী গিয়ে প্রভূকে সংবাদ দিলেন— প্রভু শ্রীপাদের মাথায় মাধাই আঘাত করেছে। শ্রীপাদের মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তুমি অনুমতি দাও ঐ দুটোকে আমি যমালয়ে পাঠাই।

মুরারীর কথা শুনে গৌর সুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ ভাব হলো। তিনি সুদর্শন সুদর্শন বলে-চিৎকার করে উঠলেন। সকলে সভয়ে

দেখতে পেলেন প্রজ্জলিত আগুনের এক গোলাকার বস্তু তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

নিত্যানন্দ হাত জোর করে প্রভুর রুদ্রভাব সম্বরণ করার প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। প্রভু তবু শান্ত হচ্ছেন না দেখে নিত্যানন্দের আকুতি আরো বৃদ্ধি পেলো। তিনি বলতে লাগলেন— প্রভু জগন্নাথ আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। তুমি অন্তত তাকে ক্ষমা করো।

জগন্নাথ ছোট ভাই মাধবের আক্রমণের হাত থেকে শ্রীপাদকে রক্ষা করেছেন শুনেই গৌর সুন্দরের রুদ্র ভাব অন্তর্হিত হলো। তিনি আবার করুণার সাগর হয়ে গেলেন। জগন্নাথকে আনন্দে আলিঙ্গন দিলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে জগন্নাথের দেহে অষ্ট সাত্বিক ভাবের বিকার হওয়ায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

দাদার এই অবস্থায় মাধবের পরিবর্তন ঘটলো। তিনি গোরা চাঁদের পায়ে পড়ে বললেন— প্রভু, আমি শ্রীপাদের মাথায় আঘাত করে মহাপাপ করেছি আপনি আমার ক্ষমা করুন আমায় উদ্ধার করুন।

গৌর সুন্দর নিজেকে মাধবের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন - তুমি যার কাছে অপরাধ করেছো তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমার শ্রীপাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো!

মাধব নিত্যানন্দের কাছে এগিয়ে গেলেন। জগন্নাথকে প্রভু উদ্ধার করেছেন দেখে নিত্যানন্দ আনন্দে নৃত্য করছিলেন। মাধব নিত্যানন্দের পা জড়িয়ে ধরলেন।

নিত্যানন্দ মাধবকে বুকে টেনে তুলে আলিঙ্গন করে বললেন— মাধব, হরিনাম করো।

শ্রীপাদের স্পর্শে মাধবও জ্ঞান হারালেন। গৌর সুন্দর তার আয়ত চোখে এই ভ্রাতার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন— শ্রীপাদ, তুমি এই দু ভাইকে উদ্ধার করো। দুজন-

কে স্নান করিয়ে কানে হরিনাম প্রদান করো।

নদীয়া নগরে নিত্যানন্দ ও হরিদাস নিত্য হরিনাম প্রচারের যে শুভ কাজ শুরু করেছিলেন তাতে নদীয়ার রমনীগণ কিছুটা সাড়া দিলেও পণ্ডিত মণ্ডলীর অনেকেই এ কাজকে ভণ্ডামি বলে মনে করছিলেন। মূলতঃ সাত সকালে হরিনাম করে অনেকেই ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য বিরক্ত হতেন। নগরের দুই কোতোয়াল — জগন্নাথ ও মাধবকে তারাই নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে জব্দ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

দুই দুর্দণ্ড প্রতাপ কোতোয়াল গোরাচাঁদের আনন্দের হাটে যোগ দিয়েছে দেখতে পেয়ে বিস্মিত নগরবাসী। গৌর পার্ষদ মুরারী জগন্নাথ এবং মাধাইকে একাই মাটি থেকে টেনে তুললেন। গৌর ভক্তগণ দুভাই এর অচেতন দেহ গঙ্গায় নিয়ে গেলেন।

গঙ্গার স্পর্শে দুভাই এর চেতনা ফিরে এলো। স্নান সেরে পাড়ে বসে কর জোরে শ্রীপাদের কৃপা প্রার্থনা করলেন। শ্রীপাদ সহস্র নগরবাসীর সামনে চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে কানে মহামন্ত্র দান করলেন।

জগন্নাথ ও মাধব সম্মান জনক সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তফা দিলেন। ঘরেও আর ফিরে গেলেন না। ভক্তগণের বাড়ী বাড়ী হরিনাম করে ঘুরতে লাগলেন। প্রতিদিন দুলক্ষ করে নাম জপতে লাগলেন। ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

মাধাই প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে বসে আবাল বৃদ্ধ বনিতার পায়ের ধুলি মাথায় নিতে লাগলেন। নগরবাসীগণ মাধবের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। গঙ্গার ধারেই মাধবের জন্য একটি পূর্ণ কুটির তারা তৈরী করে দিলেন মাধব সেই কুটিরে থেকেই হরিনাম জপ্ করতে লাগলেন। মাধব নিজেকে পাপী ভাবলেন। শ্রীপাদ অনেক করে বুঝালেন যে মাধবের আর

কোন পাপ নেই। মাধব নিজের মনকে তবুও শান্ত করতে পারলেন না। প্রতিদিন মানুষের পদধুলি নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। নিজে পরিশ্রম করে একটি ঘাট তৈরী করলেন। এই ঘাট মাধাইয়ের ঘাট বলে পরিচিত হলো।

গৌর তার পার্ষদদের নিয়ে রোজ গঙ্গায় জল কেলী করতেন। কোন কোন দিন শ্রীপাদের সংগে অদ্বৈত্যের জল খেলা বিষম আকার ধারণ করতো। বত্রিশ বয়সের শ্রীপাদ দুহাত দিয়ে জল নিয়ে সজোরে ছুরে মারতেন অদ্বৈত্যর চোখে। অদ্বৈত্য ও নিত্যানন্দকে হারাতে চাইতেন। কিন্তু, পচাত্তর বয়সের বৃদ্ধের পক্ষে নিত্যানন্দকে হারানো সম্ভব হতো না। অদ্বৈত্য হার মানতেন।

শ্রীবাস অঙ্গনে মধুর নৃত্য চলছে। রাত এক প্রহর গত হয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রী অদ্বৈত্যের মধ্যে কিছু বাক্য বিনিময় হলো। গৌর সুন্দর সহসা কীর্ত্তন ছেড়ে বের হয়ে গেলেন। কীর্ত্তনে রসভংগ হলো। সকলে অবাক হলেন।

শচীমাতার নিকট শ্রীপাদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি নিমাইকে চোখে চোখে রাখবেন। শ্রীপাদ নৃত্যে বিভোর হলেও তার চোখ দুটো নিবদ্ধ থাকতো গৌর সুন্দরের প্রতি। গৌর সুন্দর বের হয়ে যাবার পর শ্রীপাদ এবং হরিদাসও পিছু ছুটলেন। দেখলেন গৌর সুন্দর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছেন। নিত্যানন্দ এবং হরিদাসও গৌরাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপ দিলেন। শ্রীপাদ মাথার দিকে এবং হরিদাস পায়ের দিকে ধরে গৌর সুন্দরকে জল থেকে টেনে তুললেন। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বিরক্তির সঙ্গে বললেন— আমাকে বাঁচালে কেন? নিত্যানন্দ বললেন— প্রভু, তুমি যে অদ্বৈতকে প্রাণে মারতে চাইছো, এ তোমার কেমন বিচার। চলো আমরা তোমায় নন্দন আচার্য্যের বাড়ী নিয়ে যাই।

একদিন গৌর সুন্দর নিত্যানন্দকে বললেন শ্রীপাদ চলো শান্তিপুর যাই। শান্তিপুর গিয়ে নাড়াকে কিছু শিক্ষা দিই।

প্রভু ইচ্ছে করেছেন। নিত্যানন্দ প্রস্তুত। দুজনে যাত্রা করলেন। পথে এক সন্ন্যাসীর বাড়ী। প্রভু সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলেন। শ্রীপাদ নমস্কার জানালেন। সন্ন্যাসী প্রভুকে ধনী হতে ও সুন্দরী স্ত্রী এবং গুণবান পুত্র লাভের আশীর্বাদ জানালেন। শেষে আনন্দ আনবেন কিনা জিজ্ঞেস করলেন। প্রভু নিত্যানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন আনন্দ কি? শ্রীপাদ উত্তর করলেন— মদ।

মদের নাম শোনা মাত্র প্রভু দৌড়ে জলে ঝাঁপ দিলেন। নিতাই ও জলে ঝাঁপ দিলেন। গৌরাঙ্গ বললেন শ্রীপাদ, চলো, সাঁতার কেটেই শান্তিপুর গিয়ে হাজির হই।

তাই হলো। সাঁতার কেটে দুজনে শান্তিপুর পৌঁছলেন। শ্রী অদ্বৈতের বাড়ি যখন গেলেন তখন অদ্বৈত কয়েকজন শিষ্যকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। হরিদাসও ছিলেন সেখানে।

গৌরাঙ্গের ভগবান ভাব হয়েছে। তিনি শ্রী অদ্বৈতের অন্তর থেকে জ্ঞানরূপী অহংকারকে দূর করতে তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন। অন্যেরা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। অদ্বৈত-পত্নী সীতা দেবী চিৎকার করতে লাগলেন। শ্রীপাদ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

প্রভুর কর প্রহারে বুড়ো শ্রী অদ্বৈতের দেহে প্রেমের সঞ্চার হলো। তিনিও শ্রীপাদের সঙ্গে উন্মত্ত নৃত্য শুরু করলেন। সীতা দেবী বিস্মিতা হলেন। শ্রী অদ্বৈত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। শূচিতা বোধ তার খুব বেশী। নিত্যানন্দ অদ্বৈতের এই ভাব দূর করতে ভোজনের শেষে অদ্বৈতের গায়ে এবং ঘরে উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে দিলেন। অদ্বৈত রাগে আত্মহারা হলেন। শ্রীপাদ বললেন— গোঁসাই, প্রসাদ কি কখনো উচ্ছিষ্ট হয়? অদ্বৈত নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন দিলেন।

একদিন জাহান্নগরের পাশে প্রভু নৌকা ভ্রমনের সময়

বৃদ্ধ সারঙ্গ দেবও ছিলেন। তিনি গোপী নাথের সেবা করতেন। বয়স হওয়ায় সেবা করতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো।

বৃদ্ধের সাত্তিক ভাব দয়াল শ্রীপাদের মনকে আকৃষ্ট করলো। তিনি ভক্তের কষ্ট বুঝতে পেরে মনে মনে ব্যথিত হলেন। প্রভুকে বললেন প্রভু, আপনি দয়ার সাগর। আপনি একটু কৃপা করলেই বৃদ্ধের কষ্টের লাঘব হতে পারে। শ্রীপাদের কথা শুনে প্রভু বললেন শ্রীপাদ, তুমি আর আমি অভিন্ন কলেবর। তোমার যখন কৃপা হয়েছে তখন তার কষ্টও দূর হলো।

প্রভু সারঙ্গদেবকে বললেন গোঁসাই, আপনি একজন শিষ্য গ্রহণ করুন তা হলেই গোপী নাথের সেবার কাজে সাহায্য হতে পারে.

সারঙ্গদেব বললেন প্রভু সৎশিষ্য পাওয়া বড়ই কঠিন। আপনার আদেশে কাল ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখবো তাকেই শিষ্য করবো। গোপী নাথের সেবার ব্যবস্থা আপনাকেই করে দিতে হবে।

সারঙ্গদেবের কথা শুনে প্রভু মৃদু হাসলেন। পরদিন গঙ্গার তীরে সারঙ্গদেব স্নান করে যখন সন্ধ্যা করছেন তখন তার কোলে এক মৃত বালকের দেহ এসে ঠেকলো।

বালকটির বয়স প্রায় এগার। মাথার চুল মুণ্ডিত। গলায় পৈতা। সারঙ্গ দেব নিজ প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে শিহরিত হলেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করে তিনি বালকের কানে মন্ত্র দিলেন।

মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হলো। গঙ্গার তীরে শত শত লোকের ভীড় হলো। প্রভু শ্রীপাদ সহ ভক্ত বৃন্দকে নিয়ে সারঙ্গ দেবের কাছে আসলেন। বালকটিকে দুই প্রভু আশীর্বাদ করলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর শক্তিতে শক্তি মান হয়ে নবদ্বীপে হরি নামের তরঙ্গ তুলেছেন। এতে হিন্দু ও মুসলমানের একটা অংশ গৌর সম্প্রদায়ের প্রতিবিরক্ত হলেন। তারা কাজীর কাছে নালিশ জানালেন। কাজী গৌরেশ্বরের নাতী। তাছাড়া তিনি

নিলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রথমে গ্রাহ্য করলেন না। এক দল লোক গৌড়েশ্বরের কাছে নালিশ জানাবার উদ্যোগ করলেন। কাজী এবার কিছুটা সচেতন হলেন। তিনি কীর্ত্তন বন্ধের আদেশ দিলেন। সৈন্যরা কয়েকজন কীর্ত্তনীয়ার বাড়িতে হামলাও করলো। নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধ পক্ষ হাসলেন।

গৌর সুন্দর যখন শুনলেন কাজীর লোকেরা কীর্ত্তনীয়াদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করেছে তখন তিনি স্বয়ং কীর্ত্তনে বের হবার কথা ঘোষণা করলেন। শ্রীপাদ ও হরিদাসকে বললেন নগরময় প্রচার করতে যে আজ সন্ধ্যায় প্রভু কীর্ত্তনে বের হবেন। যারা কীর্ত্তনে যোগদান করতে চান তারা যেন তাদের বাদ্য যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে আসেন। যাদের বাদ্য যন্ত্র নেই তারা যেন প্রদীপ ও মশাল নিয়ে হাজির হন।

গৌর হরির আহ্বানে হাজার হাজার লোক প্রভুর বাড়ীর কাছে হাজির হলেন। তিনি কীর্ত্তনিয়াদের চার ভাগে ভাগ করে নগরের চারদিক থেকে কীর্ত্তন করতে করতে কাজীর বাড়ী আসার কথা ঘোষণা করলেন।

এক দলের নেতৃত্বে রইলেন শ্রী অদ্বৈত, এক দলে শ্রীবাস এক দলে শ্রী হরিদাস এবং শেষ দলে প্রভু, শ্রীপাদ এবং গদাধর।

প্রভুর যেমন নাগর বেশ তেমনি শ্রীপাদেরও নাগর বেশ। উভয়ের গলাতেই সুগন্ধি ফুলের মালা। সর্বাঙ্গে তিলক কাটা। শ্রীপাদকে সন্ন্যাসী বলে আর চেনার উপায় নেই

চারদিক থেকে হাজার হাজার লোক শত খোল করতাল সহযোগে কীর্ত্তন করতে করতে যখন কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন তখন পুরুষেরা গৃহ প্রাঙ্গনে শংখধ্বনি করতে লাগলেন। মহিলাগণ খৈ, ফুলও বাতাসা কীর্ত্তনিয়াদের মধ্যে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন।

প্রভুর বামে গদাধর এবং দক্ষিণে নিত্যানন্দ। বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলেছেন আর লক্ষাধিক মানুষ এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত ও আনন্দিন হতে লাগলেন দুষ্ট লোকেরা ভাবতে লাগলো নিশ্চয়ই আজ নিমাই পণ্ডিত কাজীর সৈন্যদের দ্বারা অপদস্থ হবেন।

হাজারো কণ্ঠের সমবেত কীর্ত্তনে এমন ভীষণ শব্দ হতে লাগলো যে ভয়ে কাজী প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভেতরে লুকালেন। নিত্যানন্দ এবং গদাধরের অপূর্ব নৃত্যে কাজীর প্রাঙ্গন পরম পবিত্র হলো। গৌরহরি কীর্ত্তন থামিয়ে কাজীকে ডেকে পাঠালেন। কাজী ভয়ে ভয়ে প্রভুর সামনে এলেন।

গৌরহরিকে এত কাছে থেকে তিনি কখনো দেখেন নি। গৌরের আকর্ষণে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। তিনি গোরা চাঁদের শরণ নিলেন।

গৌরহরি শ্রীপাদকে বললেন শ্রীপাদ, এই অসম্ভব তোমার কৃপাতেই সম্ভব হলো। তুমি যদি নবদ্বীপ বাসীর মনে হরি নামের প্রেমরস বিতরণ না করতে থাকলে আজ কাজী মামার সঙ্গে দেখাই হতো না। কাজী মামা, আমার কীর্ত্তন আর কখনো বন্ধ করা হবেনা তো?

কাজী গৌরহরির কথায় লজ্জা পেলেন। রাজশক্তি ঐশী শক্তির কাছে কত নগন্য তা তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন-- না, গৌরহরি তোমাদের কীর্ত্তনে এখন থেকে কেউ বাধার সৃষ্টি করবে না।

নবদ্বীপে কেশব ভারতী এসেছেন। তিনি সন্ন্যাসী। শৃঙ্গেরী মঠের অন্তর্ভুক্ত। গৌরহরি পূর্বে শ্রীপাদের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। কেশব ভারতীকে পেয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছে মনে মনে দ্বিগুণ হলো। শ্রীপাদ প্রভুর ইচ্ছে বুঝতে পারলেন।

কেশব ভারতীকে প্রভুর বাড়ীতে ভিক্ষা নেবার আমন্ত্রণ

জানালেন। শ্রীপাদও এলেন। কেশব ভারতীও শ্রীপাদের মধ্যে সন্ন্যাস বিষয়ক অনেক আলোচনা হলো। প্রভু মন দিয়ে শুনছেন আর মাঝে মাঝে বালকের মতো হেসে বলছেন— মহারাজ, আপনাদের খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আগে তৃপ্তি মতো প্রসাদ গ্রহণ করুন পরে আলোচনা করা যাবে।

শচীদেবী কেশব ভারতীর আগমনে চঞ্চলা হয়ে উঠেছেন। তিনি দু-তিনবার গোপনে শ্রীপাদকে ডেকে নিয়ে বলেছেন বাবা, তোমার উপর আমার ভরসা অনেক। আমার নিমাই যেন সন্ন্যাসী না হয়। তুমি বাবা ওকে সে কথা বুঝিয়ে বলো।

শ্রীপাদ জানেন গৌরহরির নবদ্বীপ লীলা সাঙ্গ হয়েছে। অচিরেই তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করবেন। তবুও শচীদেবীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললেন— মা, গৌরহরি নবদ্বীপে যে সাধুসঙ্গ লাভ করেছেন এমনটা আর কোথায় পাবেন? ভক্ত ছাড়া কি ভগবানের লীলা হয়? আপনি ভাববেন না। নিমাই নদীয়া ছেড়ে কোথাও যাবে না। মনে মনে বললেন - মা, তোমাকে মিথ্যে কথা বললাম। আমায় ক্ষমা করো।

নন্দন আচার্যের বাড়ীতে প্রভু ও শ্রীপাদ একান্তে আলোচনা করছেন। মুরারীকে দ্বারে দ্বার করিয়ে রাখা হয়েছে যাতে কেউ রস ভঙ্গ করতে না পারে।

প্রভু বলছেন — শ্রীপাদ তুমি আমার অন্তরের কথা জানো। আমি শীঘ্রই গৃহ ত্যাগ করে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবো। সন্ন্যাস জ্ঞান মার্গের পথ। কলিতে জ্ঞান দ্বারা ভগবানকে পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আমি সন্ন্যাস নিয়ে সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম পালন করবো। অন্তরে জ্ঞান নয় ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবো। ভক্তি ছাড়া কলির জীবের গতি নেই। আমার অনুরোধ তুমি জীবে প্রেম ভক্তি বিতরণ করবে।

প্রভু গৃহ ছেড়েছেন। নদীয়া বাসী নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে শোকার্ত আত্মীয়ের মতোই জমায়েত রয়েছেন। শচী

দেবী ঈশানের কাঁধে মাথা রেখে শোক বিহবল হয়ে আছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন। মহিলাগণ বিষ্ণুপ্রিয়ার চেতনা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছেন।

গৌর হরির নামা করনের পর গৌর সুন্দর বৃন্দাবন দর্শনের এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবন মনে মনে কল্পনা করে ছুটে চললেন। গৌর সুন্দরের সঙ্গে যেতে সকলকে বারণ করলেন। প্রভুর নিষেধ সত্বেও শ্রীপাদ, চন্দ্র শেখর, মুকুন্দ এবং গোবিন্দ প্রভুর পিছু ছুটলেন।

কাটোয়ার পশ্চিমে গভীর বন ছিলো। প্রভু বন পথে দৌড়াতে লাগলেন। চন্দ্র শেখর, গোবিন্দ প্রভৃতিগণ প্রভুর সঙ্গে দৌড়াতে পারছেন না। চন্দ্র শেখরদের জন্য শ্রীপাদও ভাল ভাবে দৌড়াতে পারছেন না। প্রভুর সঙ্গে তাদের দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় শ্রীপাদ ডাকলেন—প্রভু আস্তে চলুন, ওরা দৌড়াতে পারছেন না। প্রভু তবুও থামছেন না।

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে পাগল। রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে তিনি ক্ষণে ক্ষণে মুর্ছা যাচ্ছেন। মুর্ছা ভঙ্গ হলে আবার দৌড়াচ্ছেন। সন্ধ্যার পুর্বে প্রভু এমন জোড়ে দৌড় দিলেন যে এবার শ্রীপাদের দৃষ্টির আড়াল হলেন। শ্রীপাদ বিষন্ন মনে পেছনের ভক্তগণের সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। একটু পরে পশ্চিম দিক থেকে করুণ ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে আসায় শ্রীপাদ ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে গেলেন। গিয়ে দেখেন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে বিষন্ন বিলাপ করছেন।

তিন দিন তিন রাত্রি অতি বাহিত হলো। প্রভু মুখে কিছু দিলেন না। ভক্তগণও অভুক্ত থাকলেন। তিন দিন পথ চলার পর প্রভু শান্তি পুরের কাছাকাছি আসলেন। প্রভাতে রাখালগণকে গরুর পাল নিয়ে যেতে দেখে ভাবলেন হয়তো তিনি বৃন্দাবনের কাছে এসেছেন। তার মন কৃষ্ণানন্দে পরিপুর্ণ হয়ে

উঠলো। পেছনে শ্রীপাদ সহ অন্য ভক্তরা যে রয়েছেন প্রভুর সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। তিনি রাখালদের জিজ্ঞেস করলেন— বাবা, বৃন্দাবন কোন দিকে ?

শ্রীপাদের নির্দেশ মতো রাখাল বালকগণ শান্তি পুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। প্রভু মহা আনন্দে এগিয়ে চললেন। শ্রীপাদ চন্দ্রশেখরকে বললেন— পণ্ডিত, আপনি শান্তিপুর গিয়ে অদ্বৈত গোঁসাইকে একটা নৌকা নিয়ে ঘাটে আসতে বলবেন। প্রভুকে শান্তিপুর নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

প্রভুকে শ্রীপাদ ডাকলেন। প্রভু প্রথমে শুনতে পান নি,। তিনি কৃষ্ণ ভাবনায় বিভোর। কয়েকবার ডাকার পর প্রভু পেছনে ফিরে অবাক্ হলেন। শ্রীপাদকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন — শ্রীপাদ তুমি কেমন করে এলে !

শ্রীপাদ বললেন, শুনলাম আপনি বৃন্দাবনে যাচ্ছেন তাই দৌড়ে এলাম। বৃন্দাবন দর্শনের জন্য আমিও যে পাগল।

শ্রীপাদের কথা শুনে প্রভু আনন্দিত হলেন। বললেন, ভালোই হলো। দুজনে বৃন্দাবনের অপার্থিব লীলা দর্শন করতে পারবো।

সামনেই নদী। পতিত পাবনি গঙ্গা। গঙ্গা দেবীও যেন দুই প্রভুর স্পর্শে ধন্য হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। প্রভু গঙ্গাকে যমুনা ভেবে দৌড়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। শ্রীপাদও নদীতে ঝাঁপ দিলেন।

শ্রীপাদ দেখলেন নৌকা নিয়ে অদ্বৈত গোঁসাই আসছেন। প্রভুকে শান্তিপুর নিয়ে যেতে পারবেন এই ভরসা শ্রীপাদের মনে দেখা দিলো। তিনি আনন্দিত হলেন।

প্রভু শ্রী অদ্বৈতকে সামনে দেখে বিস্মিত হলেন,। তাঁর চোখে বেদনার অশ্রু দেখা দিলো। তিনি বিষন্ন কণ্ঠে বললেন— শ্রীপাদ, তুমি আমার দাদা হয়ে এমন কাজ করতে পারলে !

বৃন্দাবনে নিয়ে যাবার ছল করে শান্তিপুর নিয়ে এলে! আমার সন্ন্যাস গ্রহণ কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

শ্রীপাদ প্রভুর মনের কথা বুঝতে পেরে সর্বদা শংকিত ছিলেন। প্রভুর কথা তার মনে ব্যাথা দিলেও তিনি সকলের নয়নের মণিকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন এই আনন্দেই আনন্দিত হলেন।

অদ্বৈত গোঁসাই বললেন প্রভু, গঙ্গার পশ্চিমে যমুনা প্রবাহিত বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; সুতরাং শ্রীপাদ মিথ্যে বলেন নি। আমি আপনার জন্য ডোর কপিন নিয়ে এসেছি। এগুলো পরিধান করে অধমের বাড়ীতে ভিক্ষা নিতে প্রভুর আজ্ঞা হউক।

তিন দিন পর অদ্বৈত গোঁসাইর বাড়ীতে প্রভু প্রসাদ পেলেন। শ্রীপাদ সহ গৌর সঙ্গীরাও তিন দিনের উপবাস ভঙ্গ করলেন।

পরদিন শ্রীপাদ বললেন— প্রভু, তুমি সন্ন্যাস নিয়েছো এ সংবাদ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর মারফৎ নদীয়া বাসী পেয়েছে। তুমি এখানে আছো এ সংবাদ কেউ পায় নি। সন্ন্যাসীর নিয়ম অনুসারে সন্ন্যাসীর জন্ম স্থান বার বছরের আগে দর্শন করতে নেই। নদীয়া বাসীকেই প্রভুর দর্শনের অনুমতি দেওয়া হউক। প্রভু শ্রীপাদের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন— শ্রীপাদ, তুমি তো আমার মনের কথা জানো। একজন ছাড়া সকলকেই আসতে বলো। শ্রীপাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বুঝতে পারলেন প্রভুর ঐ একজন হলেন সতী বিষ্ণুপ্রিয়া।

শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপাদের মুখে প্রভুর কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন। শচীদেবী বললেন বৌমা যদি না যায় তাহলে আমিও যাবো না। পতিপ্রাণা সাধবী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর অবস্থা বুঝতে পারলেন। তাই তিনি প্রথমে দুঃখিত হলেও পরে অন্তরে স্বামীকে দর্শন করে আনন্দিত হয়ে শ্বাশুরীকে শান্তিপুর পাঠালেন।

মা ছেলে দেখা হলো। শচীদেবী শ্রীপাদের মাথায় চুম্বন করে বললেন বাবা তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পালন করেছো। আমি আশীর্বাদ করি তোমার কৃষ্ণে মতি হউক। কৃষ্ণ দর্শন হউক। তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হউক। শচীদেবী প্রভুকে বললেন— বাবা বৃন্দাবন এখান থেকে বহুদূর,। তুমি বৃন্দাবন না গিয়ে পুরীতে অবস্থান করো, এই আমার প্রার্থনা। পুরীতে থাকলে আমরা তোমার খবর প্রায় প্রতিদিনই পেতে পারবো।

মায়ের অনুরোধেই প্রভু সন্ন্যাস জীবনের সময়টুকু পুরীতেই কাটিয়েছেন। পাঁচ বৎসর পর প্রভু একদিনের জন্য জন্ম ভূমি দেখতে এলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দূর থেকে স্বামীকে দেখলেন। প্রণাম জানালেন শ্রীপাদ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বললেন — দেবী, যিনি বিশ্বের পতি, যিনি বিশ্বের কল্যাণের জন্য ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন আপনি অনুমতি করুন ভগবানের সে লীলা যেন পূর্ণ হয়। আপনি আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ অংশ। আপনি প্রসন্ন হউন আপনি প্রসন্ন না হলে আমাদের কাজ অপূর্ণ থেকে যাবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া চোখের জল মুছে বললেন— শ্রীপাদ, তিনি লীলাময়। লীলা করতেই এসেছেন। আমরা তাঁর লীলার সঙ্গী মাত্র। প্রভুর লীলা পূর্ণ হউক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

গৌরাঙ্গ চিরকালের জন্য নদীয়া ছেড়ে যাচ্ছেন। নদীয়ার অগণিত লোক গৌরাঙ্গের পশ্চাত পশ্চাত চললেন গৌরাঙ্গ দেখলেন মহাবিপদ। তিনি থামলেন। বললেন — তোমরা যদি আমায় সত্যিই ভালো বাসো, আমার কথা শোন, ঘরে বসে হরিনাম করো শ্রী অদ্বৈতকে নদীয়ার সকলকে শান্ত করার ভার দিলেন গৌরাঙ্গের সঙ্গে চললেন - শ্রীপাদ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ও গোবিন্দ।

শান্তিপুর এসে প্রভু সন্ন্যাসের নিয়ম কিছুটা লংঘন করেছিলেন। পথে সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করে চললেন। সঙ্গীরাও আচার আচরণে প্রভুকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

প্রভু সঙ্গী সহ আটিসারা গ্রাম হয়ে ছত্র ভোগ আসলেন। ছত্র ভোগের শাসক রামচন্দ্র খান পরম ভক্ত। এক অপরূপ সন্ন্যাসী এসেছেন শুনে রাম চন্দ্র খান প্রভুকে দর্শন করতে এলেন। প্রভু এবং শ্রীপাদ যেন একে অপরের পরিপুরক, বিনয়ের অবতার। ভক্তির অবতার।

রাম চন্দ্র খান প্রভু ও সঙ্গীদের ভিক্ষা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সহস্র ভক্তের সমাগমে দুই প্রভু প্রসাদ পেলেন। সন্ধ্যায় শুরু হলো নৃত্য ও কীর্ত্তন। দুই প্রভু নাচতে লাগলেন আর মুকুন্দ ও অন্যরা গান ধরলেন — হরি হরয়ে নমোঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমোঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। গিরিধারি গোপীনাথ মদনমোহন।

তখন উৎকল ও গৌরের মধ্যে ভয়ানক শত্রুতা চলছে। গৌরের সুলতান উৎকল রাজ্য আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রামচন্দ্র খান গৌরের সুলতানের অধীনস্ত শাসক। তিনি রাতের অন্ধকারে বিশ্বস্থ নাবিকদের দিয়ে প্রভু ও সঙ্গীদের নদী পার করে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

দুই প্রভু ও সঙ্গীরা ক্রমে জয়েশ্বর, বাসদহা, তমলুক পার হয়ে রেমুনাতে আসলেন। রেমুনা রাজপথের ধারে গোপীনাথ মন্দির। দ্বিভুজ মুরলিধর শ্রীকৃষ্ণের মুর্তি দেখে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ ভাব দেখা দিলো। তিনি আনন্দে নাচতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীপাদও যোগ দিলেন। মুকুন্দ সেই প্রিয় গান গাইতে শুরু করলেন হরি হরয়ে নমো ...... ।

ক্ষির চোরা গোপীনাথ দর্শন করে প্রভুগণ সাক্ষী গোপাল দর্শনের জন্য কটকে আসলেন। কটক উৎকলের রাজধানী। প্রচণ্ড কোলাহল সব সময় লেগেই আছে। প্রভু কোলাহল

পেছনে ফেলে ভুবনেশ্বর শিব দর্শন করতে এলেন।

ভুবনেশ্বর শিব দর্শন করে প্রভুগণ এলেন কপোতেশ্বর শিব দর্শণ করতে। বিন্দু সরোবরে স্নান করলেন। তারপর প্রভু কপোতেশ্বর শিব দর্শন করতে চললেন। শ্রীপাদ বললেন — প্রভু আপনারা দর্শণ করে আসুন আমি এখানে একটু বিশ্রাম নেব।

জগদানন্দ বললেন শ্রীপাদ, আপনি কিছুক্ষণ প্রভুর দণ্ড বহন করুন। আমি ভিক্ষা করে আসি।

জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড শ্রীপাদের হাতে দিয়ে ভিক্ষায় চলেছেন। শ্রীপাদ ভাবলেন যে ঠাকুরকে ভক্তগণ হৃদয়ে বহন করেন সেই ঠাকুর দণ্ডের বোঝা বহন করবেন! এ হতে পারে না।

দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহন বাঁশিতে বৃন্দাবন মুগ্ধ করেছিলেন। ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করেছিলেন। কলির শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার অবতার দণ্ড নিয়ে ঘুরবেন, এ হতে পারে না। তিনি প্রভুর দণ্ড ভেঙ্গে ভার্গী নদীতে বিসর্জন দিলেন। মনে মনে ভাবলেন প্রভুর সেবকরূপে একটি বিরাট কাজ শেষ করেছেন। কপোতেশ্বর দর্শণ করে কপোতেশ্বর শিব মন্দির হতে সামান্য এগিয়ে গিয়েই জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলেন। শ্রীপাদকে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন শ্রীপাদ ওটা কোন মন্দিরের চূড়া?

শ্রীপাদ উত্তর করলেন শ্রী মন্দিরের।

শ্রী মন্দিরের নাম শুনেই প্রভুর মনে বৃন্দাবন বিহারীজীর স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত হলো। তিনি অপলক নয়নে মন্দিরের চূড়ায় দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরক্ষণেই দেখতে পেলেন শ্যামল কিশোর ভুবন মোহনরূপ নিয়ে মৃদু হাসিতে প্রভুদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। বাঁ হাত নেড়ে বলছেন আয়, আয়:

প্রভু পাশে দাঁড়ানো শ্রীপাদকে বললেন— শ্রীপাদ, দেখো

দেখো আমার শ্যাম নটবর কেমন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রভুর কথায় শ্রীপাদের বলরাম ভাব হলো, তিনিও দেখতে পেলেন বনফুলের মালা গলে বনমালী দাঁড়িয়ে আছেন। আর পাশেই বলরাম। তার গলাতেও বনফুলের মালা। মালার সুগন্ধে চারিদিক পরিপূর্ণ। দু-ভাই হাত তুলে তাদের যেন বলছেন এসো এসো।

নিজগণকে পেয়ে প্রভুর আনন্দ ধরে না। তিনি শ্রীপাদ, শ্রী অদ্বৈত শ্রীবাস ও শ্রী বক্রেশ্বরের নেতৃত্বে চার সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন শুনতে বাসনা করলেন। শুরু হলো কীর্ত্তন। রাজা প্রতাপ রুদ্রও এলেন। প্রভুকে দেখলেন। নিজের প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন।

শ্রীশ্রী জগন্নাথ বলভদ্রে ও সুভদ্রা রথে চড়ে নিলাচল থেকে সুন্দরাচল যাচ্ছেন। উৎকলের রাজা প্রতাপ রুদ্র স্বর্ণের ঝাঁটা হাতে পথ পরিস্কার করে যাচ্ছেন। পাণ্ডাগণ পেছনে পেছনে চন্দনের জল দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করে দিচ্ছেন।

প্রভু নিজ ভক্তগণকে নিয়ে সাতটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেন প্রতি সম্প্রদায়েই দুটি করে মৃদঙ্গ, প্রতি সম্প্রদায়ে নয় জন করে ভক্ত রয়েছেন। দুজন মৃদঙ্গ বাজাবেন, দুজন গান গাইবেন আর একজন নাচবেন

সাতটি সম্প্রদায়ের চারটি সম্প্রদায়কে রাখলেন রথের আগে। রথের দুকিকে দুটি সম্প্রদায় আর পেছনে একটি সম্প্রদায়।

প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান স্বরূপ দামোদর। নৃত্য করবেন স্বয়ং শ্রী অদ্বৈত। সঙ্গে রয়েছেন— দামোদর, পণ্ডিত, রাঘব গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দ নারায়ণ।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীনিবাস; সঙ্গে রয়েছেন ছোট হরিদাস, গঙ্গাদাস, শুভানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত। নৃত্য করবেন স্বয়ং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। তৃতীয়

সম্প্রদায়ের প্রধান হলেন— মুকুন্দ। সঙ্গে আছেন বাসুদেব দত্ত, মুরারী, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন ও গোপীনাথ। নৃত্য করবেন বড় হরিদাস।

চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান— গোবিন্দ ঘোষ। সঙ্গে আছেন বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ, অন্য হরিদাস, বিষ্ণুদাস এবং রাঘব, নৃত্যকারী বক্রেশ্বর।

পঞ্চম সম্প্রদায়ের প্রধান এবং নৃত্যকারী রামানন্দ বসু. ষষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রধান ও নৃত্যকারী অচ্যুতানন্দ। সপ্তম সম্প্রদায়ের প্রধান ও নৃত্যকারী নরহরি ঠাকুর।

শ্রীপাদও প্রভুর মতোই উন্মত্ত নৃত্য করছেন। জগন্নাথ বলভদ্র, সুভদ্রাও যেন রথ হতে নেমে প্রভুগণের পাশে এসে নৃত্য করতে শুরু করেছেন।

চার দলের চার প্রধান ক্ষণে ক্ষণেই দুই প্রভুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রভুর হাত ধরে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। শ্রীপাদের হুঁস না থাকায় অদ্বৈত গোঁসাই যত্ন সহকারে শ্রীপাদকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছেন পুরীর মানুষ এমন নৃত্য কখনো দেখেনি। পরন্তু স্বয়ং ভগবানও এই অপার্থিব নৃত্যে যোগদান করায় উপস্থিত সমস্ত মানুষের মনেই আনন্দের ঢেউ দেখা দিলো। সকলেই আনন্দে নৃত্য করতে করতে সুন্দরাচলের দিকে এগিয়ে চললেন।

প্রভুগণের নৃত্য দেখে রাজা প্রতাপ রুদ্রও এত আনন্দিত হলেন যে সে আনন্দ হৃদয়ে ধরে রাখতে না পারার ফলে মাঝে মাঝেই শরীর টলমল করছে

প্রভু সাত সম্প্রদায়কে এবার একত্র করে কীর্ত্তন করতে বললেন। সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ দত্ত হরিদাস. মাধব, প্রভৃতিগণকে কীর্ত্তনিয়া নিযুক্ত করলেন। স্বরূপ দামোদরকে এই কীর্ত্তনিয়া দলের প্রধান নিযুক্ত করলেন। প্রভুর নৃত্য শুরু হলো। প্রভুকে

ঘিরে শ্রীপাদ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর নৃত্য করতে শুরু করলেন।

উপস্থিত হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ প্রভুগণের উপর পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। আর জোরে জোরে জয় জগন্নাথ ধ্বনি দিতে লাগলেন।

মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের প্রভুর চরণ সেবায় বাসনা হয়েছে। কিভাবে মহারাজের ঐ সাধ পূর্ণ হয় গোপীনাথ আচার্য শ্রীপাদকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীপাদ এখন প্রকৃতস্থ প্রভুর সেবার প্রতিই তার মন নিবিষ্ট রয়েছে। তিনি বললেন প্রভু যখন বলগুণ্ডিতে বিশ্রাম নেবেন তখন যেন মহারাজ বৈষ্ণবের বেশে প্রভুর দর্শন করতে আসেন। প্রভু কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত। রাস লীলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম মধুর লীলা রাসলীলার শ্লোক মহারাজ পাঠ করলেও প্রভু অত্যন্ত খুশী হয়ে মহারাজকে হয়তো আলিঙ্গন দান করবেন।

শ্রীপাদের পরামর্শ মতো গোপীনাথ ও সার্বভৌম মহারাজ প্রতাপ রুদ্রকে সে ভাবেই প্রস্তুত করালেন। রথ বলগুণ্ডিতে এলে মহারাজ এবং মহারাণী উৎকৃষ্ট দ্রব্য জগন্নাথের সেবায় নিবেদন করলেন পাণ্ডারাও সকলে সকলের সাধ্য মতো দ্রব্য জগন্নাথের সেবায় নিবেদন করলেন প্রচণ্ড কোলাহল এবং হুড়াহুড়ি চলতে থাকায় শ্রীপাদের পরামর্শে প্রভুকে উপবনের এক উত্তম গৃহে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো।

রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ও গোপীনাথকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুর চরণের কাছে বসলেন। মহারাজ রাসলীলার শ্লোক গুলো একে একে প্রভুকে শোনাতে লাগলেন। প্রভু কৃষ্ণ রসে ভরপুর হয়ে রাজা প্রতাপ রুদ্রকে আলিঙ্গন দান করলেন।

মহারাজ শ্রীপাদকেও প্রণাম জানালেন। শ্রীপাদ রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন আপনার কৃষ্ণে মতি হউক। রথ-যাত্রা উপলক্ষে গৌর দেশ হতে প্রচুর ভক্ত এসেছিলেন। তারা

সকলেই গৌরহরির প্রিয়জন। গৌরহরির সঙ্গে চার মাস লীলা করে তারা প্রভুর অনুরোধে যার যার বাড়ী ফিরে এলেন।

শ্রীপাদ প্রত্যহ নীলাচল ঘুরে বেড়াচ্ছেন কৃষ্ণকে পেয়েছেন তাই তার মনে আর কোন চাহিদা নেই। মনের সুখে মুক্ত বিহঙ্গের মতোই তিনি ঘুরছেন। যে যা দিচ্ছেন তাই প্রভুর নাম স্মরণ করে মুখে পুরছেন।

প্রভু একে একে সকলকেই বিদায় দিয়েছেন। শ্রীপাদকে প্রভুর সঙ্গ ছাড়া করবেন এই ভয়ে শ্রীপাদ কয়েকদিন যাবত প্রভুকে যথা সম্ভব এড়িয়ে চলছেন।

প্রভু একদিন শ্রীপাদকে ডেকে তার দুটি হাত ধরে বললেন—শ্রীপাদ, তুমি আমি অভিন্ন বস্তু। আমি জীব উদ্ধারের জন্য সংসার ত্যাগ করেছিলাম। এখন কৃষ্ণ নামে আমি এমনি বিভোর হয়ে আছি যে অন্যের উদ্ধার আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। তুমি গৌরে গিয়ে জীব উদ্ধার কর।

শ্রীপাদের চোখে জল। শ্রীপাদ বললেন - প্রভু, তুমি আমায় যত কঠিন দণ্ড দাও না কেন আমি হাসি মুখে সহ্য করবো। তুমি আমার প্রাণ, আমি তোমার দেহ। প্রাণ ছাড়া দেহের যেমন মূল্য নেই তুমি ছাড়া আমারও কোন অস্তিত্ব নেই। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

প্রভুর চোখে জলের ধারা। প্রভু শ্রীপাদের দুটি হাত বুকে তুলে নিয়ে বললেন — শ্রীপাদ, তুমি আমি এক সে কথা আগেও বলেছি। আমার ব্যাথা তুমি ছাড়া কেউ বুঝবে না। তুমি ছাড়া আমার কাজও সম্পন্ন হবে না। গৌর দেশে ইসলাম ধর্ম যেমন প্রাধান্য লাভ করেছে তেমনি পাণ্ডিত্যের অহংকারে হিন্দুদের মন ভক্তি থেকে দূরে সরে গেছে। ভক্তি ছাড়া, শরণাগতি ছাড়া কলিতে কোন তপস্যা নেই। তুমি জীব উদ্ধারের জন্যই আবির্ভূত হয়েছো। জীবকে কৃপা করো। যাকে সম্মুখে পাও তাকেই কৃপা করো। উচু নীচু, পাপী, পুণ্যবান এ

কথা বিচার করো না। শ্রীপাদ তুমি জীবকে উদ্ধার না করে নীলাচলেও ঘন ঘন এসো না। অভিরাম, রামদাস, গদাধর দাস এবং বাসু ঘোষ তোমার আজ্ঞা পালন করবে এবং নাম প্রচারে তোমাকে সহায়তা করবে।

প্রভু কৃষ্ণ নাম প্রচারের জন্য ভক্তগণকে আদেশ দিয়েছিলেন। ভক্তগণের কাছে গৌর হরি স্বয়ং ভগবান। তাই শ্রীপাদও পায়ে ধূপুর বেঁধে গান গেয়ে গেয়ে চলতে লাগলেন। বলতে লাগলেন ভজ গোরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, যে জন আমার গৌবাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।

১৫১৬ খৃঃ। শ্রীপাদ গৌর নাম কীর্ত্তন করতে করতে নদীয়ায় এলেন। শচী মাতাকে প্রণাম করলেন। শচী মাতা শ্রীপাদকে কোলে বসিয়ে বার বার মস্তক চুম্বক করে বিশ্বম্ভর ও নিমাই এর শোক প্রশমিত করলেন।

শ্রীপাদ পায়ে নূপুর বেঁধে গলায় ফুলের মালা পরে দামী অলংকার পরে কখনো গৌরগরি, কখনো শ্রীহরি বলে উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করতে করতে নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে যাচ্ছেন। যিনি কখনো ভগবান মানেন না তিনিও শ্রীপাদের সম্মুখে একবার হরিনাম উচ্চারণ না করে পারছেন না। হরিনাম উর্চ্চারণ না করা পর্যন্ত শ্রীপাদ নয়ন জলে ভাসছেন। ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। কৃষ্ণ নাম প্রচারের এই অভিনব পদ্ধতিই শ্রীপাদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে লাগলো। এক মাত্র পণ্ডিতেরা শ্রীপাদের নিন্দা করছেন। গোপীগণের যেমন কৃষ্ণ সুখেই আনন্দ হতো তেমনি শ্রীপাদেরও জীব সুখেই আনন্দ। জীব গৌরহরির নাম নেবে; কলির হাত থেকে পরিত্রান পেতে আর কোন পথ নেই। তাই শ্রীপাদ জীবের কল্যাণে নিজে চোখে জলে ভেসে, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে জীবকে মুক্তির পথ দেখালেন।

শ্রীপাদের কাছে প্রভুর কথা শুনতে প্রতিদিন অভিরাম রামদাস বাসু ঘোষ মুকুন্দ এবং রামাই পণ্ডিত সহ সকল গৌর

ভক্ত মিলিত হতেন। ক্রমে একটি বৎসর ঘুরে এলো। সামনেই রথোৎসব। গৌর ভক্তগণ যারা রথযাত্রায় নীলাচলে গিয়েছিলেন তারা সকলেই তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে লাগলেন।

প্রভু শ্রীপাদকে নীলাচলে ঘন ঘন যেতে নিষেধ করেছিলেন। শ্রীপাদ, প্রভুর নিষেধ মানতে পারলেন না। তিনিও নীলাচলে চললেন।

এবারও গতবারের ন্যায় অপার্থিব আনন্দ সাগরে ডুবলেন সবাই। প্রভুকে উপলক্ষ্য করে নিত্য উৎসব লেগেই আছে।

শ্রীপাদ প্রভুকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও পারলেন না। প্রভু শ্রীপাদকে ডেকে কাছে বসালেন। বললেন— শ্রীপাদ, তুমি আসায় আমি মনে ব্যাথা পেয়েছি। জীব উদ্ধার না করে ঘুরে বেড়ালে আমার ইচ্ছে পূর্ণ হবেনা। তুমি এসেছো ভাল হয়েছে। তোমাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ হয়তো এজন্যই এবার তোমাকে এনেছেন। শ্রীপাদ, মানুষ ভাবে বৈষ্ণব হতে গেলে সন্ন্যাসী হতে হয়। যারা নিষ্ঠার সঙ্গে সংসার ধর্ম ও ভাগবত ধর্ম পালন করছে মানুষ তাদেরও সাধু বলে মানতে চাইছেন না। তুমি জীবকে শিক্ষা দাও যে কৃষ্ণ লাভ করতে হলে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয় না। সংসারে বসেও সাধন ভজন হয় এবং কৃষ্ণলাভ হয়। জীবকে এই শিক্ষা দিতে হলে তোমাকেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আমার অনুরোধ জীব শিক্ষার জন্য তুমি সংসার ধর্ম পালন করো।

প্রভুর আজ্ঞা পালন করতে শ্রীপাদ সন্ন্যাসীর আহার বিহার ও পরিধান সবই বিসর্জন দিলেন। তিনি পট্টবস্ত্র পরিধান করলেন। পায়ে নূপুর বাঁধলেন। মুখে কখনো হরি নাম, কখনো গৌরহরি উচ্চারণ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নবদ্বীপের মানুষ শ্রীপাদকে পাগল মনে করলেন।

সন্ন্যাস ত্যাগ করে যে সংসারে প্রবেশ করে তার এবং তার

পূর্ব পুরুষদের নরক গমন হয় এই কথাই কিছু লোক প্রচার করতে লাগলেন। লোক শ্রীপাদকে ত্যাগ করলেও লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীপাদের চরণে শরণ নিতে লাগলেন।

শ্রীপাদ উচু নীচু মানতেন না। সম্ভ্রান্ত স্বর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত সব কিছু ছেড়ে শ্রীপাদের অনুগামী হলেন।

প্রভু তাকে সংসারী হতে বলেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর সকল আচার আচরণ বিসর্জন দিয়েছেন। লোকে তাই তাকে উপহাস করছে। বলছে প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

শ্রীপাদ কয়েকজন অনুগতকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে এলেন। প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাচ্ছেন প্রভু যদি তিরস্কার করেন! তিনি একটি ফুল বাগানে বসে গৌরহরি গৌরহরি বলে কাঁদছেন।

গৌরহরি সত্যিই সেখানে এসে হাজির হলেন। শ্রীপাদকে কিছু না বলে তাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করলেন। তার পর সঙ্গীদের বললেন— শ্রীপাদ যদি অতি কুকর্মও করেন তবুও তার পদ ব্রহ্মার পুজনীয়। তার লীলা সাধারণেরা বুঝতে পারছে না।

শ্রীপাদ প্রভুর অদ্ভুত কাণ্ড দেখে উঠতে চাইলেন। পারলেন না, পড়ে গেলেন। প্রভু শ্রীপাদকে তুলে বুকে নিলেন। নিত্যানন্দ বললেন প্রভু ছিলাম সন্ন্যাসী বানালে গৃহী। সকলে করে উপহাস।

প্রভু শ্রীপাদকে শান্তনা দিয়ে বললেন তুমি যে অলংকার পরেছ তা শ্রবন কীর্ত্তনাদী নববিধ ভক্তির প্রকাশ। তুমি স্বর্ণ বণিকগণকে যে ভক্তি দিয়েছ তা স্বয়ং মহাদেবও বাঞ্ছা করেন। শ্রীপাদ, তোমার সঙ্গীরা সকলেই গোপ বালক। জপ, জপের তাদের কোন প্রয়োজন নেই। তারা জন্ম সিদ্ধ। তুমি মনে কোন সংশয় না রেখে গৃহী হয়ে গৃহীর উপকার কর। জীব উদ্ধার করো। কৃষ্ণ নাম প্রচার করো।

প্রভু শ্রীখণ্ডে এসেছেন। সঙ্গে লক্ষ লোক। গৌরের

সুলতান ভাবলেন হয় তো কেউ গৌর আক্রমণ করতে এসেছে। কিন্তু, মন্ত্রীর মুখে শুনলেন— একজন সন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্য লক্ষ লোকের আগমন ঘটেছে।

দবির খাস ও সাকর মল্লিক রাত্রিতে দরিদ্র বেশে প্রভুর দর্শনে চললেন। প্রভু তখনো ঘুমোননি বাইরে ভক্তগণ রয়েছেন। অতিকষ্টে তারা শ্রীপাদের দর্শন পেলেন। শ্রীপাদের কাছে প্রভুর দর্শনের জন্য প্রার্থনা জানালেন। বললেন প্রভুর এখানে অবস্থান করা ঠিক নয়। শ্রীপাদকে অনুরোধ জানালেন যেন প্রভু শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ করেন প্রভুকে একথা জানাতে এবং প্রভুকে দর্শন করতে ছদ্মবেশে তারা এসেছেন।

প্রভু নবদ্বীপ না গিয়ে শান্তিপুর এলেন। শচীমাতাও এলেন। নিজের মনের মত রান্না করলেন। গৌর-নিতাই দু ভাইকে বসিয়ে তৃপ্তি ভরে খাইয়ে আনন্দ পেলেন।

শান্তিপুর থেকে প্রভু ভক্ত সহ কালনায় গেলেন। কালনার গৌরী দাস নতুন মন্দির নির্মাণ করেছেন। তার ইচ্ছে মন্দিরে শ্রীগৌর নিতাই বিরাজ করুন।

গৌরী দাসীর কথায় মন্দিরের ভিতরে গিয়ে গৌরনিতাই দাঁড়ালেন। গৌরী দাসী দুই প্রভুর আরতি করে বাইরের দ্বারে শেকল দিলেন পাছে গৌর-নিতাই পালিয়ে যেতে না পারেন।

গৌরী দাসী বাইরে এসে দেখেন দুভাই হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। তখন বিস্ময়ে গৌরী দাসী মন্দিরের শেকল খুলে দেখেন যে জীবন্ত ঠাকুরদ্বয় বিগ্রহ রূপে তার মন্দিরে বিরাজ করছেন। গৌরীদাসী ভাবে বিভোর হয়ে প্রভুদ্বয়ের চরণে পড়ে চেতনা হারালেন

শ্রীপাদ দেখছেন কলিতে জীব উদ্ধার করতে হলে নিজেকেই দীন হতে দীনতর হতে হবে। জগাই মাধাইকে যে ভাবে শ্রীহরির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা হয়েছে এভাবেই করতে হবে।

শ্রীপাদ তাই পায়ে নূপুর পরলেন। গলায় অলংকার পরলেন। হাতে অলংকার পরলেন। তারপর— "হরি হরয়ে নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন গিরিধারি গোপীনাথ মদন মোহন॥" এই কীর্ত্তন করে ঘরের মানুষকে বের করতে লাগলেন।

কেউ সঙ বলে শ্রীপাদকে তিরস্কার করছেন। কেউ শ্রীপাদের নাগর বেশ দেখে মুখ টিপে হাসছেন। কেউ শ্রীপাদকে ভণ্ড বলে তিরস্কার করছেন।

কারো উপহাসের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই শ্রীপাদের। কৃষ্ণ প্রীতিতে যেমন গোপীদের আনন্দ তেমনি জীবের কৃষ্ণনাম স্মরণেই শ্রীপাদের আনন্দ।

শ্রীপাদ রাস্তায় রাস্তায় কীর্ত্তন করতে যাবার সময় কোন শ্রমিককে চোখে পড়লে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন ভাই তোমার কাজ আমায় দাও আমি করি। তুমি এই অবসরে একটু কৃষ্ণ নাম স্মরণ করো। আমার গোরা চাঁদের নাম স্মরণ করো।

মুচি, মেথর, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি নিম্ন বর্ণের লোকেরা শ্রীপাদের এই অহৈতুক করুণায়— শ্রীপাদের চরণে শরণ নিতে লাগলেন।

শ্রীপাদ জীবকে কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট করার যে পথ গ্রহণ করেছিলেন প্রভু তা সমর্থন করেছেন। শ্রীপাদের এতেই বড় আনন্দ। প্রভু যখন সমর্থন জানিয়েছেন তখন আর ভাবনা নেই।

শ্রীপাদের এই আচার আচরণে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিবাস প্রভৃতি প্রভুগণ অখুশী ছিলেন। নাম প্রচারের বহু পথ আছে। নাম প্রচার করতে গিয়ে জীবের হাতে পায়ে ধরতে হবে কেন?

গৌর সুন্দর মুসলমানের ঘরে পালিত বড় হরিদাসকে এবং

নবাগত শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে হরিনাম প্রচারের ভার দেওয়ায় শ্রীনিবাস, মুরারী, মুকুন্দ মনে ব্যাথা পেয়েছিলেন। গৌর হরি তাদের প্রতি এমন অহৈতুকী কৃপা না করায় নিজেদের বড়ই দীন হীন মনে হতে হাগলো।

শ্রীনিবাস একদিন সাহস করে গৌর সুন্দরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন —প্রভু, নবদ্বীপে আপনার এত ভক্ত থাকতে নবদ্বীপের বাইরের লোকদের কেন নাম প্রচারের ভার দিলেন।

প্রভু শ্রীনিবাসের কথায় মৃদু হেসে বললেন— শ্রীনিবাস, তোমাদের মতো ভক্ত পাওয়া সুদূর্লভ ব্যাপার। তোমরা এক একজন ভগবানের অংশরূপে মর্ত্তে আবির্ভূত হয়েছো।

গ্রামের লোক গ্রামে সম্মান পায় না একথা তো তোমাদের জানা। তোমরা নাম প্রচারে গেলে নিজেদের যেমন সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সঁপে দিতে পারতে না তেমনি নবদ্বীপের মানুষও তোমাদের নাম শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করতো না। শ্রীপাদ যে বলরামের অবতার, লক্ষণের অবতার একথা তো তোমাদের আগেও বলেছি। বড় হরিদাসকে অনেক মুসলমান বলে। আমি বলি হরিদাস এবং আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। অমৃতের সন্তান।

হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান মানুষের সৃষ্টি। ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে, রাধারাণীর কৃপা পেতে হলে সব মানুষকেই ভালো বাসতে হবে। কোল দিতে হবে।

শ্রীপাদ গৌর হরির মনের কথা জানেন। যিনি গৌর হরিকে চিনতে পেরেছেন। তাই মনে মনে সর্বদা জয় গৌর, জয় শ্রীহরি নাম স্মরণ করে নাম প্রচারে বের হতেন। পণ্ডিতদের উপহাসকে গৌর হরির আশীর্বাদ বলে মনে করতেন। বড় হরিদাস মাঝে মাঝে বিচলিত হলেও শ্রীপাদ তাঁকে শান্তনা দিতেন। এ সবই প্রভুর পরীক্ষা বলে উল্লেখ করতেন।

প্রভুর কানে একবার শ্রীপাদের কথা অন্য ভক্তগণ তুলেছিলেন। প্রভুর কাছে শ্রীপাদও তার কথা নিবেদন করেছিলেন। কলির জীবকে উদ্ধার করতে ভগবান যেখানে জীবের কল্যাণে মর্ত্তে এসেছেন সেখানে প্রভুর বাণী প্রচার করতে গিয়ে জীবের পায়ে ধরাকেও শ্রীপাদ অন্যায় বলে মনে করেন নি। তাই তো মাধাই এর কলসির কানার আঘাত পেয়েও শ্রীপাদ বলেছিলেন — মাধব, ভাই তুমি আমায় আরো মারো। প্রয়োজনে আমায় মেরে ফেলো। তবুও হরিনাম বলো। তাইতো শ্রীপাদকে প্রভু দয়ার অবতার বলে থাকেন।

প্রভুর অনুমতি সত্ত্বেও শ্রীপাদের নাগর বেশে হরিনাম প্রচার শ্রীনিবাস এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মনে প্রাণে নিতে পারেন নি। শ্রীপাদের তাতে কোন মনঃকষ্ট নেই। প্রভু যখন শ্রীনিবাসের বাড়ীতে অবস্থান করতেন তখন শ্রীনিবাসের বাড়ী ছিল বৈকুণ্ঠ। প্রভু নেই, শ্রীনিবাসের বাড়ী এখন পাখী ছাড়া শূন্য খাঁচার মতোই।

প্রভু আদেশ দিয়েছেন ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করতে। প্রভুর আদেশ যে কোন মূল্যেই হউক পালন করতেই হবে। শ্রীপাদ তাই অনেকটা একা হয়ে গেছেন। প্রভুর ঘনিষ্ঠ জনদের অনেকেই শ্রীপাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। শ্রীনিবাসের অঙ্গনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরতি হয় ভাগবত পাঠ হয়। কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন হয় শ্রীপাদ শ্রীনিবাসের বাড়ি আর যান না। মাঝে মাঝে প্রভুর বাড়ি আসেন ঈশান মর্য্যাদার সঙ্গে শ্রীপাদকে আসন প্রদান করেন। মা শচীদেবী শ্রীপাদের কাছে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা কীর্ত্তন করেন।

শচীমাতার কাছে প্রভুর বাল্যলীলা শুনে শ্রীপাদ যেমন স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেন তেমনটা যেন ভাগবত শ্রবনেও পান না। তাই ফাকে ফাকে মায়ের চরণতলে বসেন। মা কখনো শ্রীপাদের মাথা নিজের জানুর মধ্যে টেনে নিয়ে স্নেহের পরশ দান করেন। শ্রীপাদের শরীর আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠে।

শ্রীপাদ নাম বিতরণে কোন উচু নিচু বিচার করছেন না। প্রভুর চরণে যারা আশ্রয় নিয়েছেন তাদের মধ্যে যেন জাতি এবং বর্ণের অহঙ্কার না থাকে সেজন্য শ্রীপাদ প্রতি সপ্তাহে এক একজনের বাড়ীতে ইষ্টগোষ্ঠীর আয়োজন করতেন।

একই থালায় রাখা প্রসাদ সকলেই ভাগ করে নিতেন। শ্রীপাদের বিরুদ্ধে তাই ব্রাহ্মণেরা বহু অভিযোগ আনতে লাগলেন। ব্রাহ্মণেরা নিজেরা সভায় বসে শ্রীপাদের এই গর্হিত কাজ থেকে সমাজকে কেমন করে রক্ষা করা যায় সে উপায় খোঁজে বের করতে সচেষ্ট হলেন। শ্রীপাদের অনুগত ভক্তগণ শ্রীপাদের যাতে কোন অসম্মান না হয় সে জন্য পালা করে ছায়ার মতো শ্রীপাদকে অনুসরণ করতে লাগলেন। শ্রীপাদ ভোর হবার আগেই নেচে গেয়ে নবদ্বীপ বাসীর ঘুম ভাঙাতেন। শ্রীপাদের সঙ্গীগণ খোল করতাল নিয়ে শ্রীপাদের পিছু পিছু আসতেন। সুমধুর সঙ্গীত শুনতে প্রতি ঘরের দরজায় হাজারো মানুষ উঁকি দিতেন। শ্রীপাদের নাগর বেশ দেখে কোন রসিক নাগর কিংবা রসিক নাগরী টিপ্‌পনি কাটতেন। শ্রীপাদের তখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা। রসিক নাগর, নাগরীর টিপ্‌পনি তার কানে পৌছতো না।

শ্রীপাদ গলায় সোনার হার পরেন। তাতে আবার হীরের দুল। হাতে বাজু বন্ধ। পায়ে সোনার নুপুর। কোমরে কটি বন্ধ। কানে দুল। পরনে নীল কাপড়। গায়ে নীল চাঁদর। দেবদাসীরা যেমন বেশ ভূষা করে দেবতা ও মানুষকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করেন শ্রীপাদও তেমনি মানুষকে কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট করতে রসিক নাগরের বেশ ধরেছেন।

শ্রীপাদ বাসুদেব ঘোষের বাড়ীতে রাত্রিতে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন। সারাদিন কীর্ত্তনানন্দ এবং ভক্তের সেবায় মত্ত থেকে গৃহস্বামী ক্লান্ত। শ্রীপাদও এক সুসজ্জিত পালঙ্কে ঘুমোচ্ছেন।

মধ্যরাতে উৎসবের বাড়ী ক্লান্তিতে ঘুমে অচেতন। শ্রীপাদের

হীরের লকেটটি কীর্ত্তনের সময় সূর্যের আলোতে আলো ছড়াতো কিছু দুষ্ট লোকের লোভ ছিলো ঐ হীরের লকেটটার উপর। তারা পালা করে শ্রীপাদের ভণ্ড ভক্ত সেজে কীর্ত্তনে যোগ দিতেন সুযোগ খুঁজতেন হারটি হাতিয়ে নেবার।

বাসুদেব ঘোষের বাড়ীতেও তারা দল বেঁধে এসেছেন দিনের বেলা কীর্ত্তন করেছেন। দুপুর এবং রাত্রে প্রসাদ পেয়েছেন। নাটমঞ্চের মেঝেতে বিছানো শতরঞ্চের উপরই অনেক ভক্তের সঙ্গে শুয়ে পড়েছেন।

কালীয়া মণ্ডল এবং তার পাঁচ সঙ্গী সজাগ। তারা অন্যদের ঘুমের অপেক্ষায় ছিলেন। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে কালীয়া মণ্ডল সঙ্গীদের মৃদু স্বরে ডাকলেন তারা উঠে বসলো।

শ্রীপাদ যে পালঙ্কে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন সেই পালঙ্কে সুগন্ধি ফুলগুলো শ্রীপাদের স্পর্শে যেন পরিপূর্ণ, তৃপ্ত। চাঁপা ফুলের গন্ধে ঘর ভরপুর।

কালীয়া মণ্ডল ও তার পাঁচ সঙ্গী শ্রীপাদের শয়ন ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দরজা খোলা। শ্রীপাদের আয়ত চোখ দুটো মুদ্রিত। মুখে প্রশান্তির ছাপ। ঘি এর প্রদীপ পালঙ্কের পাশেই জ্বলছে। কালীয়া মণ্ডলের মনে হলো শ্রীপাদ যেন চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ঘুমোন নি। বাড়ীর কুকুর দুটো ঘেউ, ঘেউ করে উঠলো। শ্রীপাদ দরজার দিকে পাশ ফিরলেন কালীয়া মণ্ডলের বুকটা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। মনে হলো শ্রীপাদের কাছে তারা ধরা পড়ে গেছেন।

শ্রীপাদ গলা থেকে হারটি খুললেন হীরেটা প্রদীপের আলোয় জ্বলে উঠলো। ডান হাত তুলে কালীয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন। কালীয়ার শরীর অবশ। সঙ্গীদের অবস্থাও একই রকম। তারা শ্রীপাদের পায়ে মাথা রাখলেন চোখের জলে পা ধুয়ে দিলেন। শ্রীপাদ বললেন তোমাদের কৃষ্ণ ভক্তি

হউক।

“শ্রীপাদ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আঠারো ঘন্টা নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নদীয়াবাসীর তাতেও চৈতন্য হচ্ছে না। শ্রীপাদ যখন নাগর বেশে কীর্ত্তন করেন তখন অনেকেই কৌতুক ভরে রাস্তার পাশে দাঁড়ান। অনেকের মনের ইচ্ছে থাকলেও নবদ্বীপের পণ্ডিতদের ভয়ে শ্রীপাদের সঙ্গী হবার সাহস করেন না।

শ্রীপাদ শুধু নবদ্বীপেই তাঁর কীর্ত্তন প্রচার আবদ্ধ রাখেন নি। তিনি পালা করে গৌরও রাঢ় দেশের বহু স্থানেই গৌর নাম প্রচার করছেন। বহু ঘরে স্থাপিত হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গের কাষ্ঠ বিগ্রহ।

শ্রীপাদের কীর্ত্তনের দল ক্রমে বড় হচ্ছে। শ্রীপাদের শরণে এসেছেন রামদাস, মুরারী, চৈতন্য দাস, গৌরীদাস, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, পুরন্দর পণ্ডিত, সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, কালীয়া, কমলা কর, পিপলাই কৃষ্ণ দাস, পুরুষোত্তম দাস, শ্রীআচার্য চন্দ্র, বাসুদেব ঘোষ, মাধবানন্দ, রঘুনন্দন, পরমানন্দ, নরহরি দাস, পরমানন্দ গুপ্ত, বংশীবদন, পরমানন্দ উপাধ্যায়, নন্দন আচার্য্য, উদ্ধারণ দত্ত, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, নারায়ণ, জগদীশ, হিরণ্য, পুরুষোত্তম দত্ত, মকরধবজ, শ্রীজীব প্রমুখ।

শ্রীনিবাসের অঙ্গনে শ্রীপাদ কালে ভদ্রে পদার্পণ করেন। শ্রীপাদের নাগরবেশ শুধু শ্রীনিবাসই নন নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজও মানতে পারেন নি।

শ্রীপাদের এতে দুঃখ নেই। তিনি গৌর সুন্দরের আদেশ পালন করছেন মাত্র। মানুষকে আকৃষ্ট করতেই তিনি নাগরবেশ গ্রহণ করেছেন। জীবের কল্যাণে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন।

শ্রীপাদ শচীদেবীর কোলে মাথা রেখে সজল চোখে বললেন—মা, গৌর সুন্দরের হয় তো ইচ্ছে নয় আমি নদীয়ায়

আর বেশী দিন থাকি। আমি পানিহাটী থেকেই আমার প্রচার কাজ শুরু করেছিলাম পানিহাটীতেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি আশীর্বাদ করো গৌর সুন্দরের আশা যেন পূর্ণ করতে পারি।

শচী দেবীর চোখেও জল। আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখেও জল। শ্রীপাদ নদীয়া ছেড়ে পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী এলেন। সঙ্গে এলেন শ্রীপাদের একনিষ্ঠ ভক্তগণ।

রাঘব পণ্ডিত বললেন—শ্রীপাদ, নদীয়ার ঘরে ঘরে গৌরহরির নাম বিতরণ করেছেন। নদীয়ায় আপনাকে কেউ চিনতে পারেনি। আপনার শ্রীদেহ ধুলায় ধুসরিত হয়েছে। নদীয়াবাসীর মনে দুঃখ জাগেনি। আমরা আপনার অভিষেক উৎসব পালন করবো।

শ্রীপাদের কানে সোনার কুণ্ডল। গলায় মতির মালা। পায়ে সোনার নূপুর। হাতে বাজু বন্ধ। শ্রীপাদের জন্য নির্দিষ্ট হলো একটি সুন্দর সিংহাসন।

১০৮ কলস গঙ্গা জল দিয়ে স্নান করিয়ে মাঘ মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে ১৫১৮ খৃঃ পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হলো।

পানিহাটী থেকে শ্রীপাদ সপার্ষদ গৌর নামের প্রচারে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরতে লাগলেন। আকৃনা, মাহেশ, সপ্তগ্রাম, আগড় পাড়া, কুমার হট্ট, চৌহাটা, খরদা কোটাল, তাম্বলি, পাথর কাটা, হাতিয়াগড় ছত্রভোগ বরাহনগর, কোঠরঙ, বাণীদীঘি, চাতরা, হাতিয়া কান্দা, পাঁচপাড়া, বেতর, বুঢ়ন আন্দুয়া, কাঁচরাপাড়া, সুপত্তন, কাশী পঞ্চ, আন্দারী, আদম, কালীয়া চৌরা ফুলিয়া, দোগাছিয়া নিমতা, চৌয়ারিছরা, উদ্ধ্রনপুর, নৈহাটী, বসই, বেতড়াখণ্ড, হাঁটাই চড়খি প্রভৃতি গ্রামে গৌর নাম প্রচার

করতে লাগলেন। লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীপাদের চরণে শরণ নিলেন।

শ্রীপাদ অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে পরামর্শ করতে বসেছেন। শ্রীপাদ মুচি, মেথর, হাড়ি, চাঁড়াল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শুদ্র সকল জাতের মানুষকেই মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে তবুও জাতপাতের অহংকার রয়ে গেছে।

তাই তিনি ঠিক করলেন সকল জাতের, সকল বর্ণের মানুষদের এক সূত্রে বাঁধতে এক মহোৎসবের আয়োজন করবেন। সেখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এক সঙ্গে ভোজনে বসবেন। মানুষ মানুষকে ভালোবাসার এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর হবে না।

শ্রীপাদ রঘুনাথের দিকে তাকালেন। রঘুনাথ দাস সমাজে বিশেষ পরিচিত এবং ধনী ব্যক্তি। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসের উপর চিড়া মহোৎসব করার ভার দিলেন।

বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রীপাদের চিড়া মহোৎসব দেখতে লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটলো। রঘুনাথ নিজের সাধ্যমতো চিড়া, দুধ প্রভৃতি উপকরণ যোগার করলেন।

চিড়া উৎসবে যারা যোগ দিতে আসছিলেন তাদের কেউ চিড়া, কেউ চিনি, কেউ কলা, কেউ দুধ, কেউ ঘি নিয়ে আসতে লাগলেন।

ছত্রিশ সম্প্রদায়ের ছত্রিশ কীর্ত্তনের দল হরিনাম কীর্ত্তন করতে লাগলেন। শ্রীপাদ স্বয়ং কীর্ত্তন ও নাচে অংশ নিলেন। মুহুর্মুহু শ্রীহরি ও গৌরহরি ধ্বনিতে পানিহাটীর আকাশ বাতাস মুখরিত হতে লাগলো। স্থলে জলে অন্তরীক্ষে যত জীব ছিলো সকলেই কৃষ্ণনাম মাধুর্যে বিহ্বল হয়ে পড়লো।

গরম দুধের মধ্যে চিড়া ভিজানো হলো। তারপর দধি, ঘি, কর্পূর, চিনি, গুড় এবং চিড়া দিয়ে মহাপ্রসাদ তৈরী হলো। হাজারো লোক পরিবেশনের দায়িত্ব নিলেন। ছত্রিশ সম্প্রদায়ের

মানুষ জাত পাত ভুলে এক পঙক্তিতে মহাপ্রসাদ নিতে বসলেন। শ্রীপাদের জন্য একটি সুন্দর আসন পাতা হলো। শ্রীপাদ বললেন, রঘুনাথ আর একটা আসন পেতে দাও।

রঘুনাথ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু, আপনার সঙ্গে আর কোন প্রভু বসবেন ?

শ্রীপাদ গৌরভাবে বিভোর। বললেন গৌরহরি বসবেন। তোমরা প্রভুর ভোগের আয়োজন দাও।

রঘুনাথ বিস্মিত হয়ে বললেন প্রভু, গৌর সুন্দর তো নীলাচলে। শ্রীপাদ বললেন –কে বলে একথা! তিনি তো আমাদের সঙ্গে নৃত্য করছেন।

শ্রীপাদ আসনে বসে গৌরহরিকে আহ্বান করলেন। গৌরহরি তখন নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে কৃষ্ণ ভাবে বিভোর ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দেহে তরঙ্গের সৃষ্টি হলো। ভক্তগণ দেখলেন গৌর হরির বিগ্রহ থেকে অপূর্ব জ্যোতি বের হয়ে গেছে।

পানিহাটীতে ভক্তগণ দেখলেন প্রভুর আসনের সামনে যে ভোগ নিবেদন করা হয়েছে তার অর্দ্ধেকটা শেষ হয়ে গেছে। শ্রীপাদের আদেশে ভোজনে বসা ভাগ্যবানের দল ঘন ঘন গৌরহরি ধ্বনি দিতে লাগলেন শ্রীপাদ গৌরহরির ভোক্তাবশেষ নিজে একটু মুখে দিলেন বাকিটা প্রসাদের সঙ্গে মিশিয়ে লক্ষ লোকের মধ্যে বিলি করলেন।

শ্রীপাদ নাম বিতরণ করতে গিয়ে জাতি, ধর্ম, উচু নীচু বিচার করেননি। তিনি যাকে পেয়েছেন তাকেই শ্রীকৃষ্ণ নাম বিতরণ করেছেন। যিনি গৌরহরি বলেছেন শ্রীপাদ তাকেই আলিঙ্গন দিয়েছেন। গৌরসুন্দর শ্রীপাদের সার্থক নাম রেখেছেন—দয়ার অবতার, প্রেমের অবতার।

এক সময় সমগ্র ভারতবর্ষে ভগবান বুদ্ধের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। মুসলমান আগমনের পর থেকেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমতে থাকে।

ভগবান শঙ্করাচার্য বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে বেড়িয়েছেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু বৌদ্ধ ভগবান শঙ্করাচার্যের চরণতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

শ্রীপাদও বার বছর বয়স থেকে প্রায় কুড়ি বছর আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করেছেন। ভগবান শংকরাচার্য যেমন তাঁর গতি পথে চরণ চিহ্ন রেখে গেছেন শ্রীপাদ তেমন রাখেন নি। তিনি কে, কেন তিনি আবির্ভুক্ত হয়েছেন গৌর সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে সে ভাব শ্রীপাদের মনে জাগেনি।

রাঢ় এবং গৌর দেশে মুসলমানদের রাজত্ব চলছে। বৌদ্ধরা ক্রমেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে যেতে শুরু করেছেন। ব্রাহ্মণরা যেমন জাতি, ধর্ম নিয়ে চুল চেরা বিচার করেন শ্রীপাদ তেমনটা করেন না। ভগবানের কথাই তিনি মানুষের কাছে সরল ভাবে প্রচার করছেন। মানুষ যে অমৃতের সন্তান, মানুষের মাঝেই যে নারায়ণের বাস ব্রাহ্মণরা তা স্বীকার করলেও কাজে তারা সে পথে অগ্রসর হন না।

রাঢ় ও গৌরে যত বৌদ্ধ ছিলো তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলেন শ্রীপাদের চরণে তারা শরণ নেবেন। যিনি অমৃত লোকের সন্ধান জানেন তিনিই মানুষকে অমৃত লোকে পৌঁছে দিতে পারেন।

ষাট হাজার বৌদ্ধ নরনারী এক দিনে শ্রীপাদের শরণ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করতে লাগলেন। খরদহে লক্ষ লোকের সমাবেশে এক বিশাল মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হলো। লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো — জয় গৌর-নিতাই।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ আষাঢ় মাস। সপ্তমি তিথি। নদীয়ায় যে চাঁদ ১৪০৭ শকে আবির্ভুক্ত হয়েছিলেন সে চাঁদ অস্তাচলে গেছেন। প্রভাতের সোনালী সূর্য মেঘের ফাঁকে মুখ লুকিয়েছেন।

শ্রীপাদ নগর কীর্ত্তন শেষে বাড়ী ফিরছিলেন। একটি

উজ্জ্বল নক্ষত্র তার দিকে এগিয়ে আসছে। উজ্জ্বল নক্ষত্রটি শ্রীপাদের সামনে এসে প্রভুর বিগ্রহ ধারণ করলো। শ্রীপাদ প্রভুকে প্রণাম জানালেন। প্রভু বললেন—শ্রীপাদ, আমার লীলা শেষ। আমি চললাম। তুমিও তোমার লীলা শেষ করে যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো।

শ্রীপাদ হা গৌর হা গৌর বলে উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন আর রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। খরদহের মানুষ ভাবলেন এও শ্রীপাদের কোন এক লীলাই হবে। ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে শ্রীপাদ মানুষকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করছেন।

শ্রীপাদের মুখে প্রভুর লীলা সম্বরণের কথা অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না। শ্রীপাদ দুজন ভক্তকে নদীয়ায় পাঠালেন প্রভুর লীলা সম্বরণের সংবাদ দেবার জন্য।

শ্রীপাদ খরদহে হাজার হাজার ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে কীর্তন শুরু করলেন—'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নামরে। যে জন আমার গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় মোর প্রাণ রে"।

শালি গ্রামের সূর্যদাস আচার্য শ্রীপাদের একনিষ্ঠ অনুগামী। মাঝে মাঝেই শ্রীপাদকে ভিক্ষা গ্রহণের আমন্ত্রন জানান। শ্রীপাদ বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন বর্ণের ভক্তদের নিয়ে সূর্যদাস আচার্যের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীপাদের আগমনে সূযদাসের বাড়ীতে গোরা চাঁদের হাট বসে।

সূর্যদাসের দু-কন্যা বসুধা ও জাহ্নবি শ্রীপাদের সেবার ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীপাদ একদিন স্বপ্ন দেখলেন একচক্রা গ্রামের শৈশবের খেলার সাথী কমলা পূর্বদেহ ত্যাগ করে সূর্যদাসের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবি রূপে জন্ম গ্রহণ করেছে। শ্রীপাদ জানেন প্রকৃতির কৃপা ছাড়া পরম পুরুষকে কখনো লাভ করা যায় না। তিনি তো সংসারী জীবকে সংসারে থেকেই সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন।

শালিগ্রামের গোবর্ধন গোঁসাই একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। তার দেহেও সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়। গোবর্ধন গোঁসাই শ্রীপাদের বিশেষ অন্তরঙ্গ। সূর্যদাসের বাড়ীতে উৎসবে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরসুন্দরের ভোগ নিবেদন করেন। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন গৌরহরিকে। গৌরহরি বলছেন - গোবর্ধন, আমি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম। লোকশিক্ষার জন্যই নীলাচলে বাস করছি।

শ্রীপাদ সূর্যদাসের দু মেয়েকে বিয়ে করুক এই আমার অভিপ্রায়। সংসারে থেকেও যে ভগবানকে লাভ করা যায় মানুষ শ্রীপাদের কাছ থেকে এই শিক্ষা লাভ করুক।

স্বপ্ন দেখে গোবর্দ্ধন গোঁসাই কাঁপতে লাগলেন। তিনি কোনভাবেই শ্রীপাদকে যেমন একথা বলতে পারবেন না তেমনি সূর্যদাসকেও না।

প্রভু শুধু গোবর্দ্ধন গোঁসাইকেই নয় সূর্যদাস এবং শ্রীপাদকেও স্বপ্নে একই কথা বললেন। তিন জনে স্বপ্ন দেখলেও কেউ কারো মনের কথা কারো কাছে বলতে সাহসী হলেন না।

বসুধার অসুখ করেছে। দিনদিন অসুখ বেড়েই চলেছে। বসুধা কোন বৈদ্যের ঔষধ খেতে রাজী নয়। সে শুধু দিনে তিন বার গৌর পূজার চরণামৃত পান করছে।

বসুধা মৃত্যু শয্যায়। গায়ে শক্তি নেই। জাহ্নবীকে অতি কষ্টে বলছেন — জাহ্নবি, শ্রীপাদকে বলে আমার শেষ সময়ে একটু কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করতে বলো।

গ্রামের বহু লোক এসেছেন বসুধাকে শেষ বিদায় জানাতে। অনেকের চোখেই জল। বসুধা ও জাহ্নবি যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। গ্রামের সকলেরই প্রিয়। সকলের চোখেই তাই জল।

শ্রীপাদ জাহ্নবির অনুরোধ শুনলেন। ভাবলেন ভালোই হলো। প্রভু সংসারী হবার জন্য যে আদেশ দিয়েছিলেন তা পালনের আর প্রয়োজন হলো না। দু কন্যার এক কন্যা মৃত্যু-

পথযাত্রী। প্রভু দুকন্যাকে বিয়ে করতে স্বপ্‌নে আদেশ করেছেন। শ্রীপাদ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই — দল নিয়ে কীর্ত্তন করতে গেলেন।

সূর্যদাস শ্রীপাদের চরণতলে আছড়ে পড়ে মেয়ের জীবন ভিক্ষা করছেন। শ্রীপাদ বলছেন—গোঁসাই, প্রভুর যা ইচ্ছে তা ব্যর্থ হবার নয়। আপনি মৃত্যু পথযাত্রী মেয়েকে আমাকে দান করুন

সূর্যদাস পণ্ডিত চম্‌কে উঠলেন। এতো স্বয়ং প্রভুর আদেশ ! কিন্তু, যে মৃত্যুশয্যায় তাকে কেমন করে দান করবেন ? তবুও সূর্যদাস বললেন—শ্রীপাদ আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হউক। আমার দু-মেয়েকেই আপনাকে দান করলাম।

বসুধাকে ঘিরে সবাই নৃত্য করছেন। বসুধা জাহ্নবিকে বললেন—বোন, তুই আমায় ধর। আমিও একটু নাচতে চাই। বসুধার কথায় চম্‌কে উঠলেন সবাই। বসুধা জাহ্নবীর হাত ধরে নাচলেন, জয় গৌর, জয় শ্রীহরি ধ্বনি দিলেন। উপস্থিত সকলে নাম মাহাত্ম্য দেখে অবাক্ হলেন।

শ্রীপাদ সূর্য্য দাস পণ্ডিতের দু মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবিকে বিয়ে করার পর শ্রীনিবাস এবং শ্রী অদ্বৈতের সঙ্গে মনের পার্থক্য আরো বেড়ে যায়। শ্রীনিবাসের বাড়ীতে প্রভুর সময় থেকে যে কীর্ত্তনের সুচনা হয় তা এখনো চলছে। শ্রীপাদ মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন। বিয়ের পর আর শ্রীনিবাসের বাড়ী যাওয়া হয়নি।

শ্রী চৈতন্যের জন্ম দিবস পালনে এখন আর শ্রীপাদ ও শ্রীনিবাসকে এক সঙ্গে পাওয়া যায়না। শ্রীপাদ উদ্ধারণ দত্তের বাড়ীতে বিরাট করে প্রভুর জন্ম তিথি পালনের আয়োজন করেন। মা শচী দেবী এবং দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপাদের ধর্ম প্রচারের পদ্ধতিকে সমর্থন করেন। যুগে যুগে ভগবান বিভিন্ন ভাবেই জীব উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

কলিতে মানুষ ভোগবিলাসী। ভোগ বিলাস ছেড়ে কেউ ধর্ম কার্য করতে চান না। শ্রীপাদ তাই জীবকে বলছেন তোমাদের আত্মা যখন যা খেতে চায় খাবে। যখন সুযোগ পাবে তখন অন্তত মুখে হরি নাম নেবে। ঘরে বসেই হরি নাম করো। গৌর গৌর বলো।

কলিতে সন্ন্যাস ধর্ম সঠিক ভাবে পালন করা অত্যন্ত কঠিন। কলির প্রভাবে জীব ভোগ বিলাসে মত্ত। জীবকে হরি নামে আকৃষ্ট করতে তাই শ্রীপাদ জীবের প্রতি অহৈতুকি কৃপা প্রদর্শন করেছেন।

হরিনাম স্মরণ করতে করতে জীবের যখন চৈতন্য উদয় হবে তখন আপনা থেকেই ভোগ বিলাস দূর হয়ে যাবে। কঠোর নিয়ম, আচার অনুষ্ঠান, পালন করলেও মনের পরিবর্তন না ঘটলে ঈশ্বর দর্শন হয় না।

শচী দেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপাদকে ভালো ভাবেই জানেন। শ্রীপাদ ব্রহ্মচর্য ছেড়ে সংসারী হওয়ায় তারা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হন নি। নবদ্বীপের অনেকেই যখন শ্রীপাদের এই কাজের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন তখন শচী দেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া পরিচিতদের কাছে বলছেন শ্রীপাদ জীবের উদ্ধারে মর্ত্তে এসেছেন। শ্রীপাদ আমাদের আপন না হলেও আপনজনের চেয়েও বেশী আপন। নদীয়াবাসী ভাগ্যবান শ্রীপাদের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। শ্রীপাদের প্রতিটি কাজই ঈশ্বরের প্রীতির জন্য। জীবের শিক্ষার জন্য। শ্রীপাদের প্রতি নদীয়ার পণ্ডিত সমাজ অবিচার করছেন। নদীয়ার মানুষ চিনলো না বলেই আমার গৌর-নিতাই নবদ্বীপ ত্যাগ করছেন।

শ্রীপাদ জীবের শিক্ষার জন্যই সংসারী হয়েছেন। বিয়ে না করলে সংসার হয় না। প্রভু শ্রীপাদকে সংসারী হতে বলেছিলেন। স্বপ্নে শ্রীপাদকে বসুধা ও জাহ্নবিকে বিয়ে করার আদেশও দিয়েছেন। জাগতিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্তই

প্রভুর আদেশ শ্রীপাদ প্রভুর আদেশ পালন করেছেন মাত্র।

ঘৃনা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়। শ্রীপাদ তাই লোক লজ্জা, লোকের ঘৃনা এবং লোকের দ্বারা অপমানিত হবার ভয় ত্যাগ করেছেন।

শ্রীপাদ বিয়ে করলেও আনন্দের হাঁট এক দিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি। একদিন বরানগরের এক পণ্ডিত নৃত্য রত শ্রীপাদকে বললেন বাপু, এভাবে নর্ত্তন কুর্দন করে সময় নষ্ট না করে বরং কাজ করো তাতে তোমার ও দেশের মঙ্গল হবে। শাস্ত্রে গো সেবাকে বড় পূণ্য কাজ বলে বর্ণনা করেছে। একটা গাভীর সেবা করলেও তুমি তার কাছ থেকে দুধ পাবে। একবার হরিনাম নিলেই যদি জীবের উদ্ধার হয় তাহলে নরক নামক জগতকে চিরকালের জন্য তুলে দিতে হবে। মুখে তো বড় বড় কথা বলো আমার একটু কাজ করে দাও। আমি হরিনাম করি।

শ্রীপাদ পণ্ডিতের কথা কথা শুনে আনন্দিত হলেন। বললেন প্রভু সত্যিই আপনি হরিনাম করবেন। বলুন আমায় কি করতে হবে?

পণ্ডিত বললেন—আমার দুটি গাভী আছে। চাকরটা কাল থেকে জ্বরে ভুগছে। তুমি যদি একবেলা আমার গাভী দুটোর পরিচর্য্যা করো তাহলে তোমার কীর্ত্তনীয়াদের সঙ্গে আমিও কীর্ত্তন করবো। আমার ঠাকুর ঘরের মাট মন্দিরে কীর্তনের আসর বসবে। রাজী?

শ্রীপাদ পণ্ডিতকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—রাজী। আপনি যতক্ষণ কীর্তন করবেন আমি ততক্ষণ আপনার দাস হয়ে থাকবো।

শ্রীপাদের সঙ্গীগণ পণ্ডিতের উপর মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন। শ্রীপাদ সরল মানুষ। পণ্ডিতের এটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হচ্ছে। শ্রীপাদের বিন্দু মাত্র বিকার নেই। তিনি সঙ্গীদের কীর্তন করার

আদেশ দিয়ে গো-শালার দিকে এগিয়ে গেলেন

পণ্ডিতের বাড়ীর চাকরের নাম বংশী বংশী গো-শালার সংগেই একটা ঘরে থাকে। শ্রীপাদ প্রথমে তার ঘরে গেলেন। বংশী কাঁথা গায় দিয়ে শুয়ে আছে, শ্রীপাদ ঘরে ঢুকে তার কপালে হাত রাখলেন। বংশী চমকে উঠলো। মনে হলো তার শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা এই কোমল স্পর্শেই সঙ্গে সঙ্গেই দূর হয়ে গেছে।

বংশী শ্রীপাদকে চেনে। শ্রীপাদ স্বয়ং তার ঘরে তাকে কৃপা করতে এসেছেন এযেন স্বপ্নের মতো মনে হলো। সে উঠে শ্রীপাদের পায়ে পড়লো। বললো— প্রভু, আজ আমি উদ্ধার হলাম। কতদিন আপনাকে দেখেছি। একবার চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করার ইচ্ছে ছিলো। আপনি কৃপাময়। তাই কৃপা করলেন। আমি ছোট জাত বলে কখনো সামনে গিয়ে প্রণাম করার সাহস হয়নি।

পণ্ডিতের বাড়ীতে কীর্ত্তন জমে উঠেছে। পণ্ডিত স্বয়ং নেচে নেচে হেলে দুলে গান করছেন। বাড়ীর মানুষ অবাক। প্রতিবেশি অবাক। শ্রীপাদের সংগীগণ অবাক

বংশী বললো— প্রভু আপনি যখন কৃপা করে এসেছেন তখন আমায় উদ্ধার করুন।

শ্রীপাদ বললেন— বংশী দাস; তুমি তোমার মনিবের কাজ সেরে স্নান করে এসো। আমি তোমার জন্য নাটমন্দিরে অপেক্ষা করবো।

শ্রীপাদ নাট মন্দিরে গিয়ে কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। পণ্ডিতের তখন কোন কিছু বলার ক্ষমতা নেই। তিনি দু হাত তুলে নেচে চলেছেন। শ্রীপাদের যোগদানে কীর্ত্তনের আনন্দ শত গুণ বৃদ্ধি পেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বংশী এসে কীর্ত্তনে যোগ দিলো। সেও দুহাত তুলে নাচতে লাগলো।

পণ্ডিতের বাড়ীতে মহা উৎসব হলো। শ্রীপাদের চরণে

শরণ নিয়ে পণ্ডিতের অভিমান দূর হয়ে গেল।

শ্রীপাদ পণ্ডিতকে বললেন -- পণ্ডিত, সংসার শ্রীকৃষ্ণের সংসার। আমার নয়। এই মনোভাব থাকলে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। তোমার আমার কারো কিছুই করার ক্ষমতা নেই। গুরুর কৃপাতেই আমরা চলি। গুরুর কৃপাতেই কথা বলি। গুরু ভিন্ন ত্রিভুবনে আপন আর কেউ নেই।

শ্রীপাদ ভোর হবার আগে ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান সেরে নগর কীর্ত্তনে বেরিয়ে পড়েন। ফিরেন কখনো দুপুরে, কখনো রাতে। বসুধা সংসারের যাবতীয় কাজ দেখা শুনা করেন। জাহ্নবী রান্না করেন। শ্রীপাদ যেদিন দুপুরে ফিরে আসেন সেদিন শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ এবং গৌরসুন্দরের কাছে নিজেই ভোগ নিবেদন করেন। তিনি গৌর গৌর আহ্বান জানালে পরিস্কার দেখতে পান একটি ছায়া মূর্তি এসে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন। গৌর সুন্দরের দেওয়া ভোগের থালা থেকে প্রিয় বস্তুর কিছুটা অংশ তুলে নেন। প্রসাদ তখন মহাপ্রসাদে পরিণত হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীপাদ কখনো নিজ বাড়ীতে কখনো ভক্তের বাড়ীতে ইষ্টগোষ্ঠী করেন। কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হয়ে প্রায় দিনই ধূলায় গড়াগড়ি দেন। শ্রীঅঙ্গ এবং অঙ্গবাস ধূলায় ধূসরিত হয়ে পড়ে।

বসুধাদেবী স্বামীর শ্রীঅঙ্গ মার্জনের দায়িত্ব প্রতিদিন পালন করেন। রাতে শ্রীপাদ শয্যা নিলে দু-বোন শ্রীপাদের দু-চরণ সেবা করেন। শ্রীপাদ এই অবসরে দুই স্ত্রীকে জীব সংসারে থেকেও কি ভাবে মুক্ত জীব হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে তার উপায় বলেন।

বিয়ের পর স্ত্রীদের শ্রীপাদ বলে দিয়েছিলেন সেবাই স্ত্রী জাতির পরম ধর্ম। স্বামীকে গুরু জ্ঞানে, শ্বশুর শাশুড়িকে দেবতা জ্ঞানে, দেবরকে লক্ষ্মণ জ্ঞানে এবং সন্তানদের গোপাল জ্ঞানে সেবা করলে ভগবান স্বয়ং তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীপাদ বলেন— তোমরা মা হতে মনে মনে বাসনা করছো।

প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাও প্রভুই তোমাদের সন্তান উপহার দেবেন। তোমরা আমার কাছে মন্ত্র নিয়েছো। স্বামী দেব তুল্য ও গুরুতুল্য। স্বামীর সেবাও স্ত্রী লোকের পরম ধর্ম। আমাদের শাস্ত্রে অযোনি সম্ভূত বহু মুনি ঋষি যেমন রয়েছেন তেমনি স্বামী সহবাস ছাড়াও অলৌকিক ভাবে বহু রমনী গর্ভ ধারণ করেছেন। গৌর সুন্দরের ইচ্ছে হলে তোমরাও আমার সহবাস ছাড়াই মা হতে পারবে। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি অগস্ত্য, মহামতি শুকদেব, মহারাজ মান্ধাতা দ্রৌপদী, সকলেই অযোনি সম্ভূত। কুমারী কুন্তি সুর্যের বরে অলৌকিক ভাবে গর্ভবতী হয়ে ছিলেন। কুন্তির কান দিয়ে বের হয়েছিল কর্ণ। নারায়ণ ঋষি উরু থেকে জন্ম দিয়েছিলেন স্বর্গের অপসরা উর্বশীকে। খ্রীষ্টানদের ধর্ম গুরু যিশু খ্রীষ্টের মা মেরী কুমারী অবস্থায় অলৌকিক ভাবে গর্ভবতী হয়েছিলেন। দৈবকীর সপ্তম গর্ভের সন্তান দৈববলে রোহিনীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। সেই গর্ভ থেকেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলরাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবই সম্ভব। ঈশ্বরের ইচ্ছে হলে তোমরাও মা হবে।

শ্রীপাদের আশীর্বাদ ব্যর্থ হতে পারে না। বসুধা ও জাহ্নবি দেবীও মা হলেন।

শ্রীপাদ খরদহেই প্রধান পাট স্থাপন করেছেন। প্রভু তিরোধান করেছেন বার বৎসর হলো। খরদহে ঘটা করেই প্রতি বছর প্রভুর আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি পালিত হয়। শ্রীপাদ আগের চেয়ে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েছেন। কীর্ত্তনে সব সময় যোগ দান করেন না। কীর্ত্তনে গেলেও সামান্য পরেই চলে আসেন।

বসুধা ও জাহ্নবি দেবী একনিষ্ঠ ভক্তদের অনুরোধ করলেন তারা যেন শ্রীপাদকে চোখে চোখে রাখেন। শ্রীপাদ মাঝে মাঝেই মাঝ রাতে চুপি চুপি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।

শ্রীপাদের শয়ন মন্দিরে ভক্তগণ প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন, তবুও তাদের ভুল হয়ে যায়। তাদের চোখে ঘুম দিয়ে শ্রীপাদ বেরিয়ে পড়েন।

১৫৪৫ খ্রীষ্টাবদ্। মাঘ মাস। শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমা তিথি। শ্রীপাদ শয়ন মন্দির থেকে বের হলেন। ভক্তগণ ঘুমে অচেতন। সামনে গুরুজী দাঁড়িয়ে। একটু পরেই গৌর সুন্দর এলেন। বললেন শ্রীপাদ তোমার কাজ শেষ। এবার চলো।

শ্রীপাদ গৌর সুন্দরকে আলিঙ্গন করলেন। গুরুজীর পায়ে প্রণাম জানালেন। তার পর তাদের পেছন চলতে লাগলেন।

শ্রীপাদ সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এক করে জীবকে ভালো বাসার মন্ত্র না শোনালে সনাতন ধর্ম বাংলায় অস্তাচলে চলে যেতো।

শ্রীপাদের প্রদর্শিত পথে মানুষ এগিয়ে গেলেই পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে। জয় শ্রীহরি, জয় গৌর, জয় নিতাই।

হরি হরয়ে নমো: যাদবায়, মাধবায় কেশবায় নমো:। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন, গিরিধারি গোপীনাথ, মদন মোহন।

সমাপ্ত